১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরের 'ক্যাথে' হলে নেতাজী বরণ করছেন রাসবিহারী বসু

সেনানে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন নেতাজী
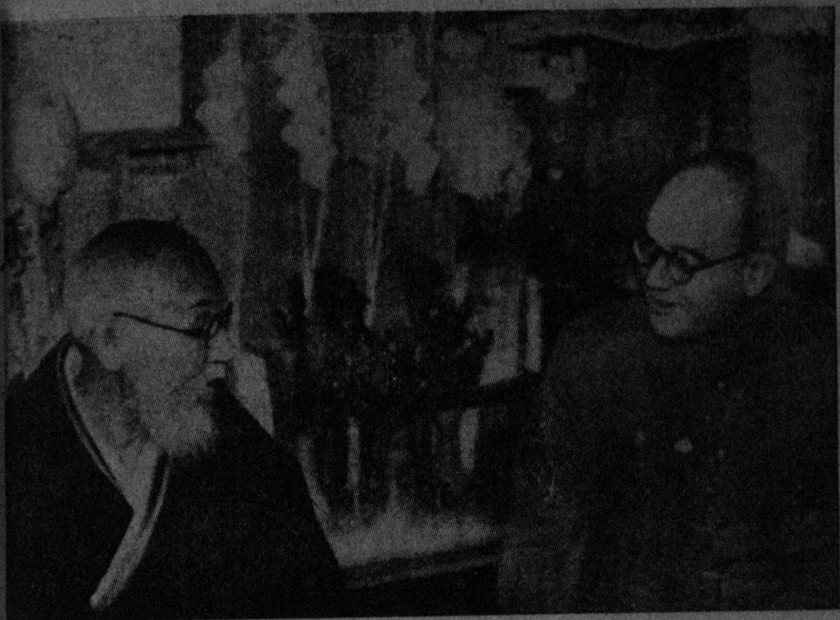
ব্ল্যাক ড্রাগন সংস্থার প্রধান তোয়ামার সঙ্গে আলোচনারত নেতাজী

জাপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগোমিৎসুর সঙ্গে করমর্দনরত নেতাজী

সিঙ্গাপুরে
সামরিক
বাহিনীর
অভিনন্দন
গ্রহণরত নেতাজী

আজাদহিন্দ
বাহিনীর
ক্রীড়ানুষ্ঠানে
দর্শকের আসনে
নেতাজী

সুভাষ ঘরে ফেরে নাই

শ্যামল বসু

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
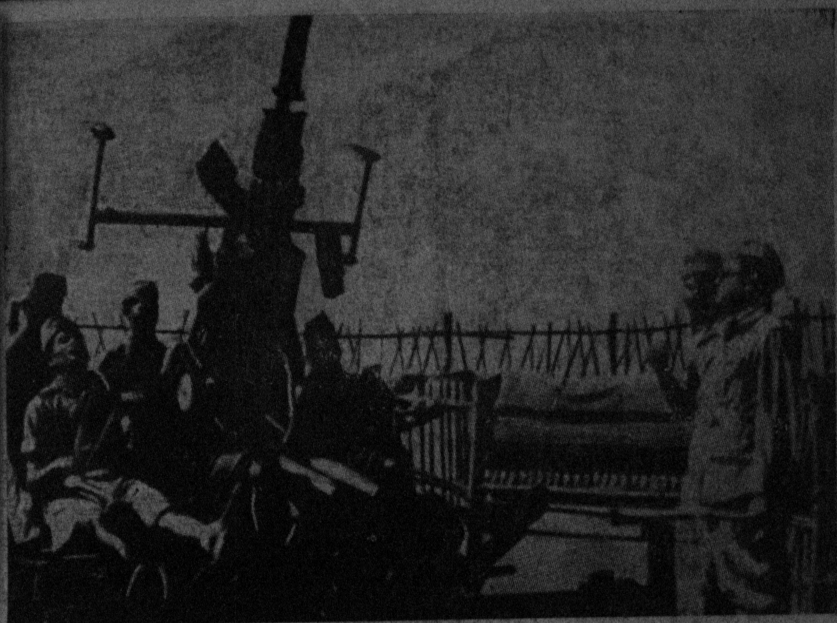
কলিকাতা-৯

এন্টি এয়ারক্রাফট্ কেন্দ্র পরিদর্শনরত নেতাজী

সাজোয়া বাহিনী পরিদর্শনরত নেতাজী ; সঙ্গে কিয়ানী, রাসবিহারী বসু, শাহনওয়াজ, ভোঁসলে ও সাইগল
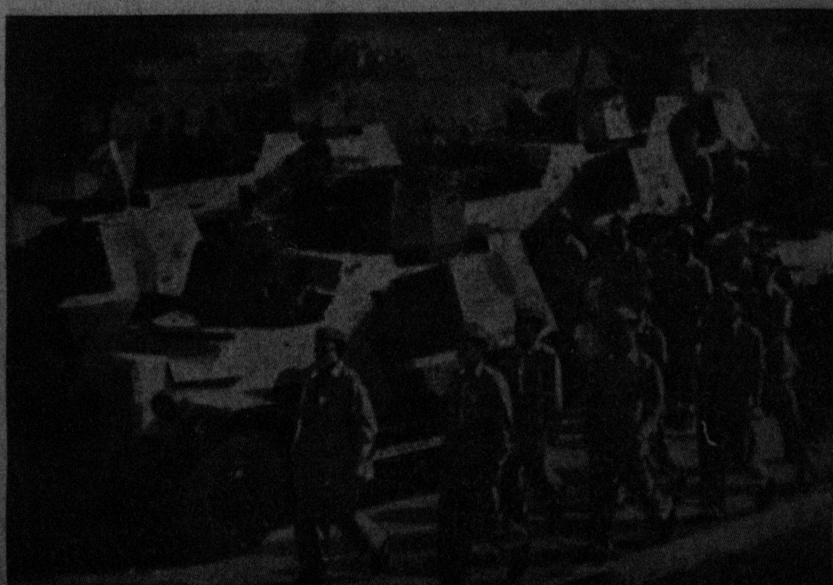
প্রথম প্রকাশ :
১লা মে, ১৯৫৯

প্রকাশক :
সোমেন পাল,
রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন,
৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রনে :
স্বপন বসু,
বাসু প্রিন্টার্স,
৫১, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
অরুণ গুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রনে :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন :
আনন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
৩৬, সূর্য সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

আন্দামানের
সেলুলার জেল
পরিদর্শন করে
বেরিয়ে আসছেন
নেতাজী

চ্যাটার্জী, কিয়ানী
ও
রহমানের সঙ্গে
নেতাজী

যাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া এ বই
কখনো লেখা সম্ভব হতো না সেই
দিদি ও জামাইবাবুকে
দিলাম
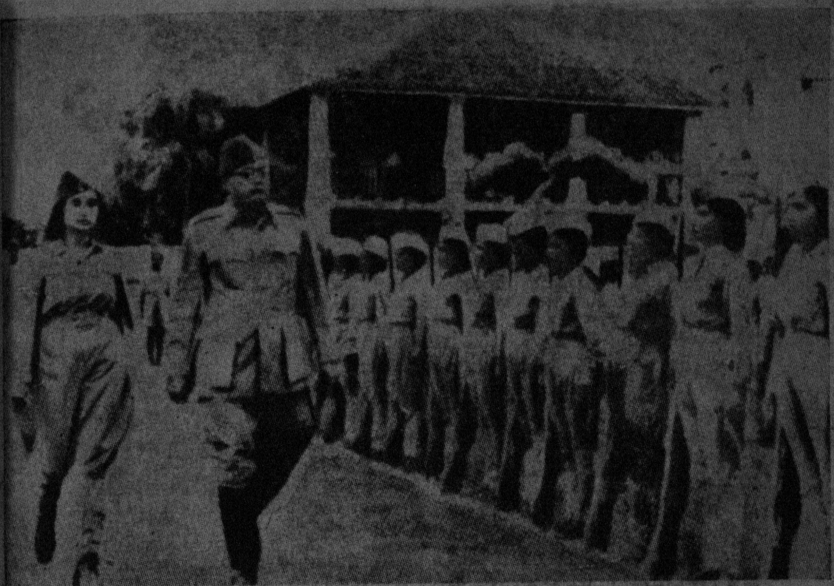
ঝাঁসির রাণী বাহিনীর অভিবাদন গ্রহন করছেন নেতাজী

১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে সাঁজোয়াবাহিনীর অভিনন্দন গ্রহনরত নেতাজী

১৯৪৩ সালের নভেম্বরে
গৃহীত নেতাজীর
সাক্ষরিত ছবি

রণাঙ্গণে নেতাজী
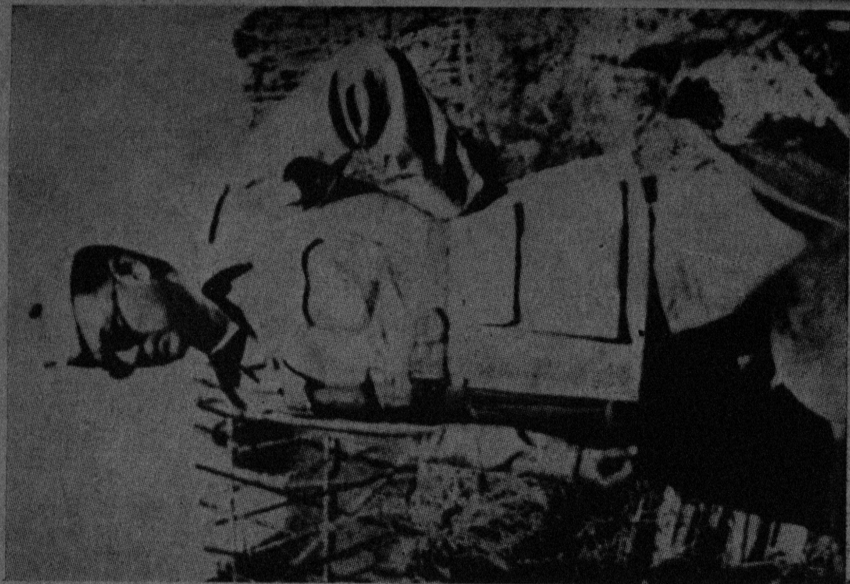
পরিবারের সকলের সঙ্গে পিতা জানকীনাথের কোলে শিশু সুভাষ

১৯১৭ সালে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর-এর সভ্য সুভাষচন্দ্র

১৯৪৩ সালের জুন মাসে টোকিও রেডিওতে ভাষণরত নেতাজী

জাপ সেনাপতির অভিনন্দন গ্রহনরত সুভাষচন্দ্র
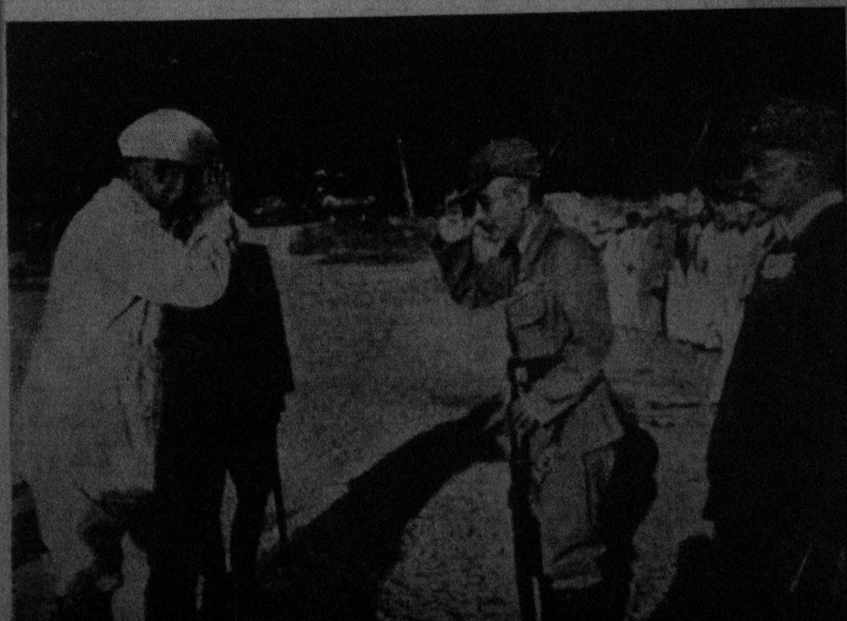
ছাত্রজীবনে
সুভাষচন্দ্র

১৯১৯ সালে
কেমব্রিজে
সুভাষচন্দ্র
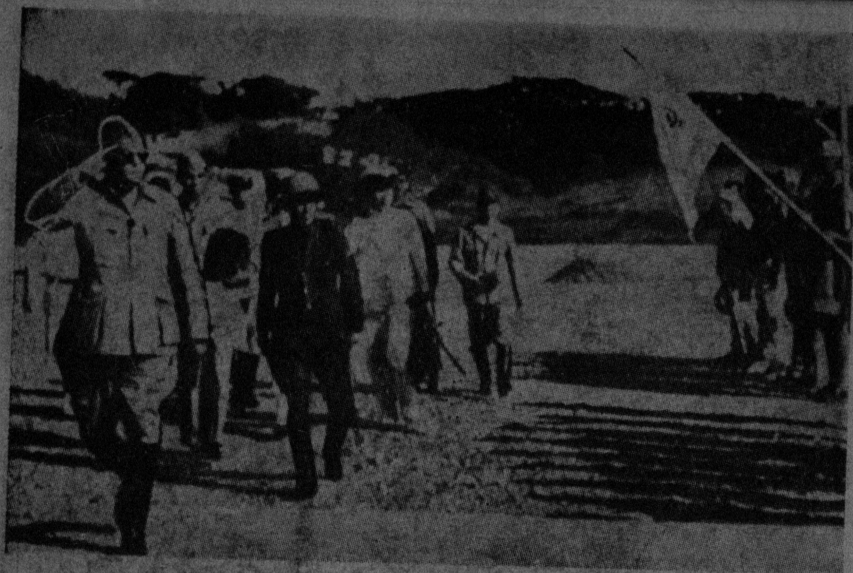
১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে শহীদ দ্বীপে আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন নেতাজী

কর্ণেল নোনোগাকি, এস. এ. আয়ার, কর্ণেল টি ও ক্যাপ্টেন আরাই
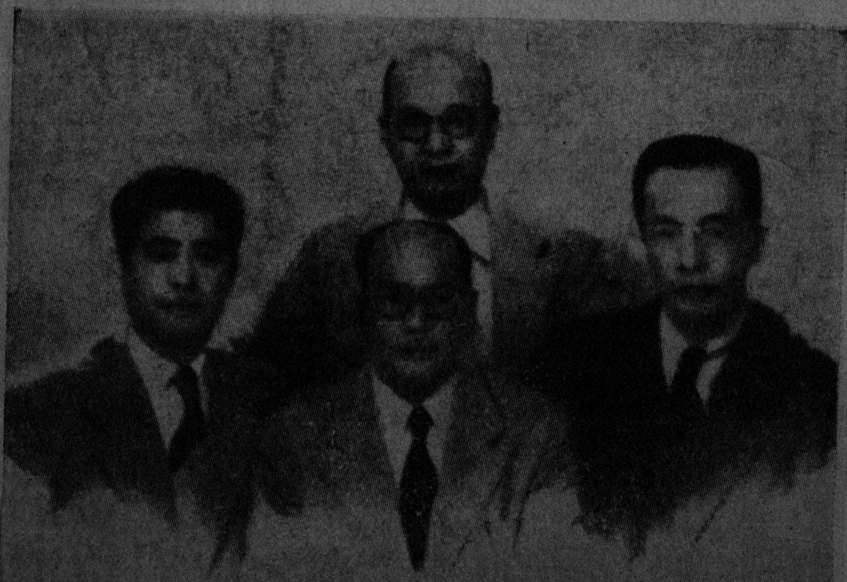
১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে জি. ও. সি সুভাষচন্দ্র

১৯৩৭ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণরত সুভাষচন্দ্র

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে টোকিওতে জেনারেল তোজোর সঙ্গে আলোচনারত নেতাজী

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে সায়গনে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে
আলোচনারত নেতাজী

১৯৩১ সালে
বরিশালের
উজিরপুরে বিশ্রামরত
সুভাষচন্দ্র
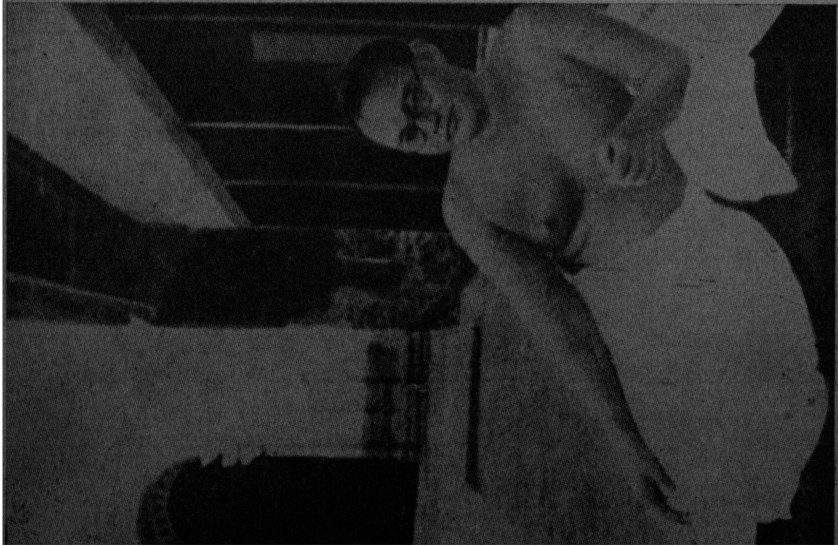
১৯৩৩ সালে প্রাগে
সুভাষচন্দ্র
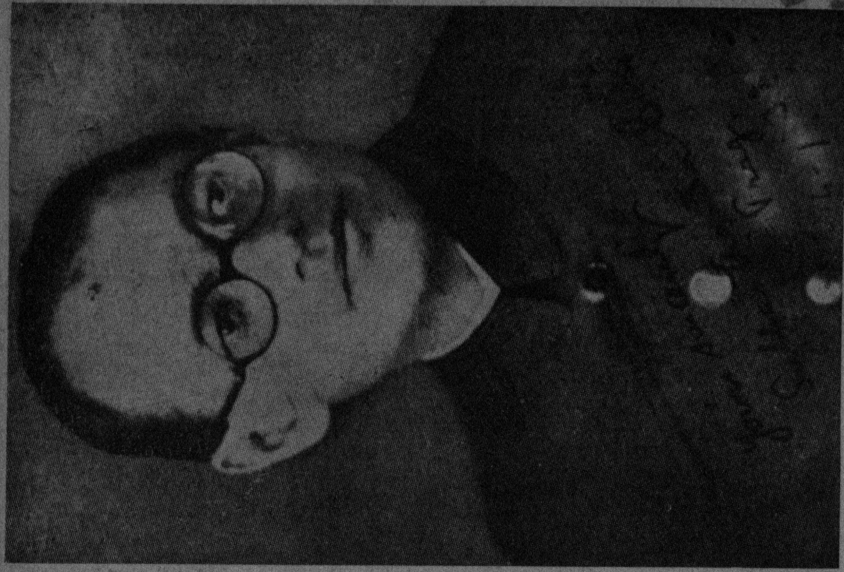
১৯৪৫ সালের
জুন মাসে
সিঙ্গাপুর
বিমান ঘাটীতে
অবতরণরত
নেতাজী
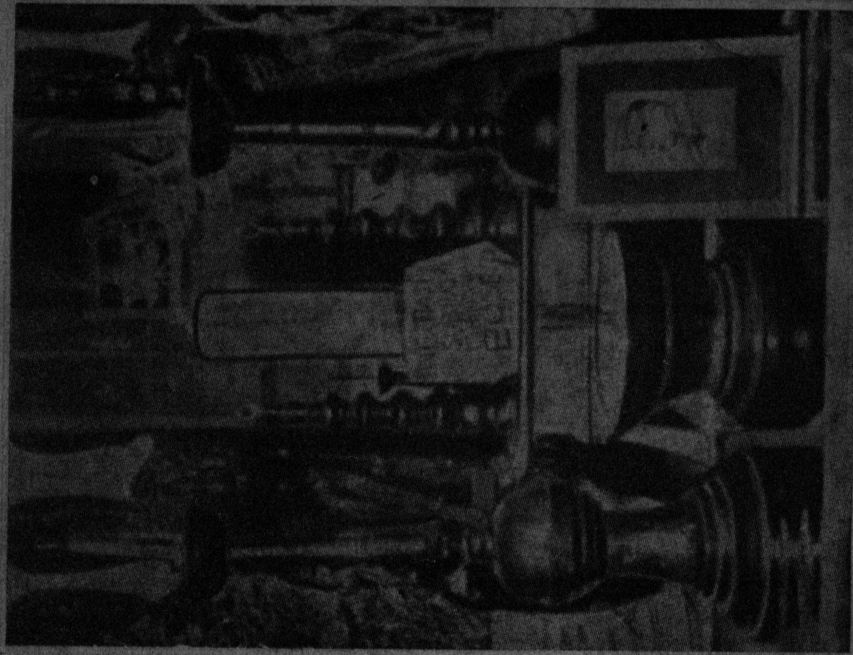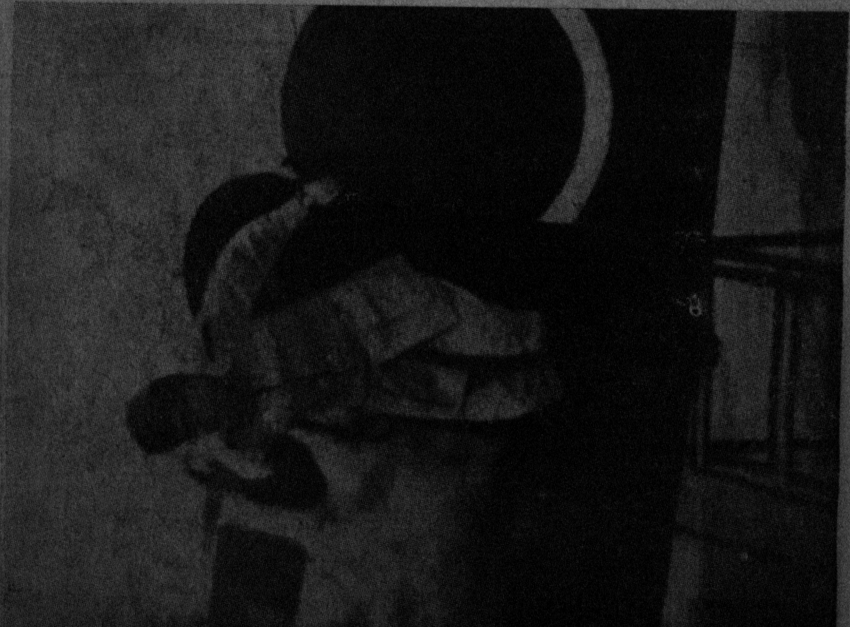
টোকিওর
রেনকোজি
মন্দিরে রাখা
নেতাজীর
তথাকথিত
চিতাভস্ম

১৯৩৪ সালে
কার্লোভি ভারীতে
সুভাষচন্দ্র
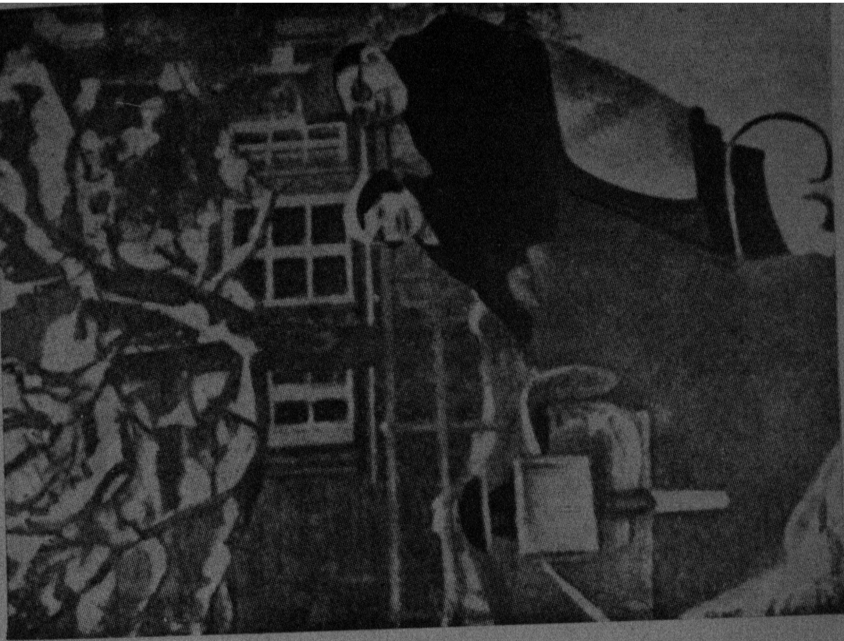
১৯৩৫ সালে
ভিয়েনায়
শ্রীমতী মুলার-এর
সঙ্গে সুভাষচন্দ্র
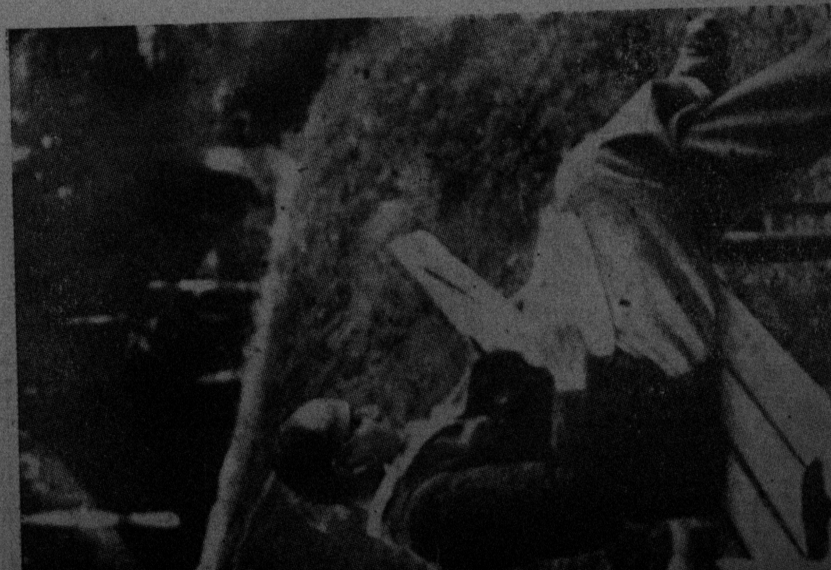
তাইহকু বিমানঘাটিতে তথাকথিত বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ।
অনেক দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

বিধ্বস্ত বিমানের ছবি। মনে হচ্ছে পাহাড়ের উপরেই দুর্ঘটনা ঘটেছে

ভুলাভাই
দেশাইয়ের সঙ্গে
সুভাষচন্দ্র
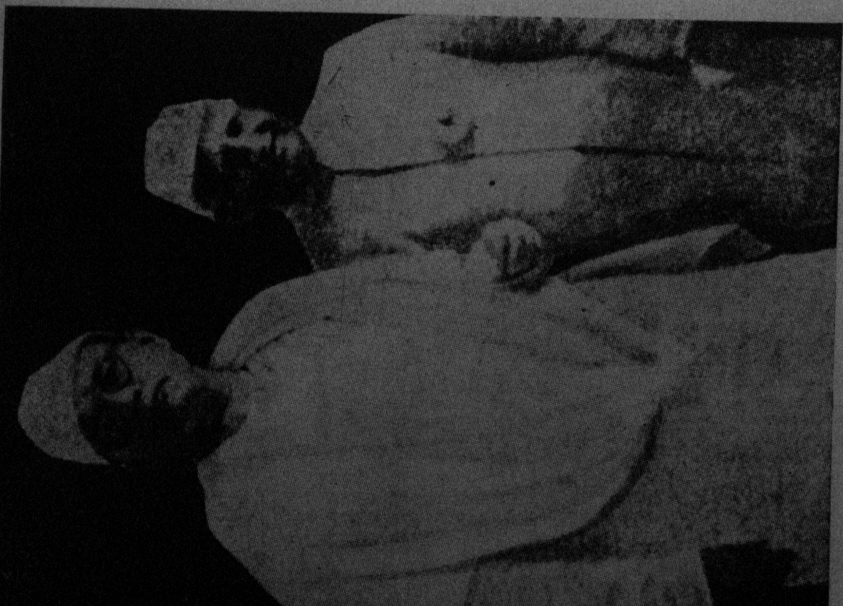
পিতৃ বিয়োগের
পর সুভাষচন্দ্র
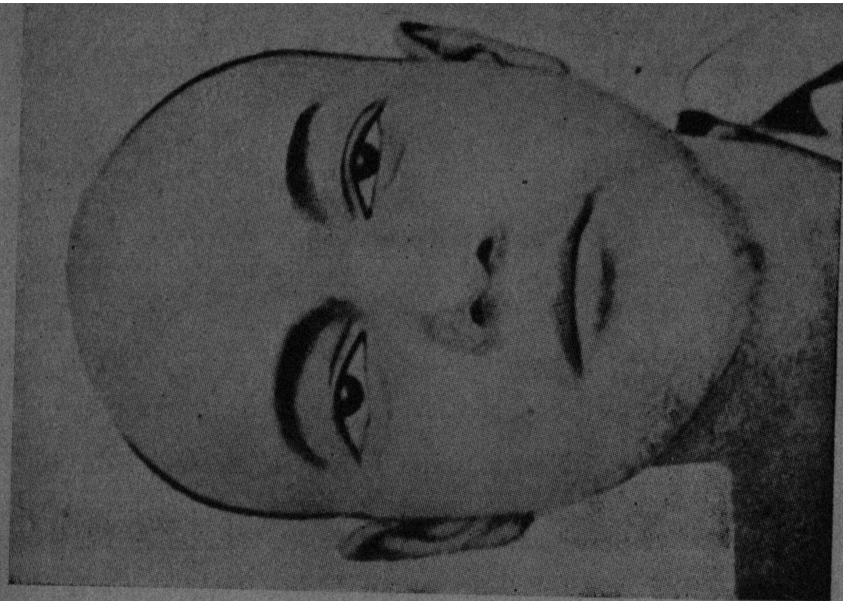
১৯৪৯ সালে পিকিং পরিদর্শনরত মঙ্গোলিয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দল। ডানদিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তি কে ?
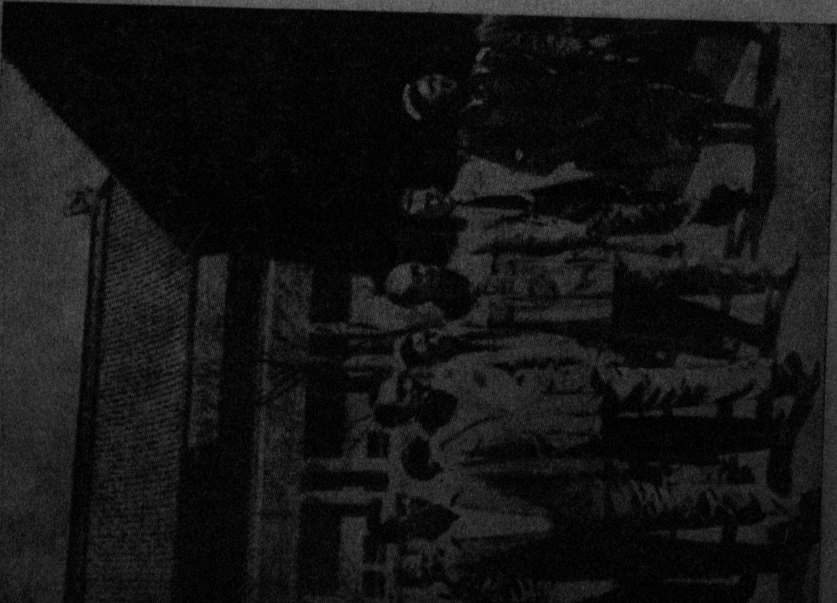
তথাকথিত নেতাজীর চিতাভস্ম-সহ রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিত মবিজুকি

১৯৩৭ সালে কলকাতার
উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে
সুভাষচন্দ্র
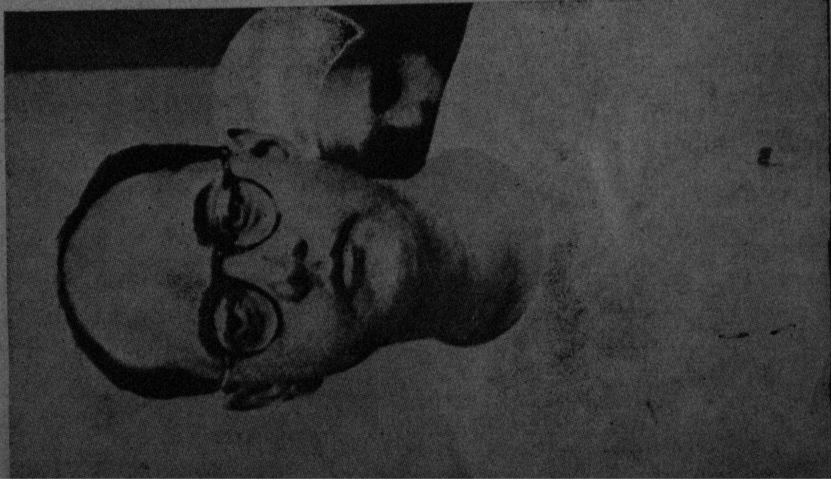
১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের
সভাপতি সুভাষচন্দ্র
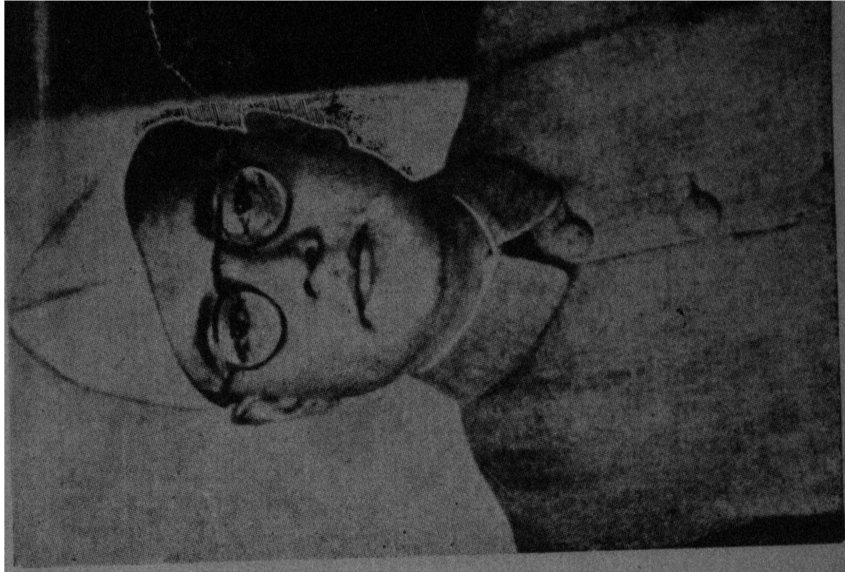
বিধ্বস্ত বিমানের ছবি। পাহাড় অনেকটা নিকটে

তথাকথিত ভস্মাধারের সামনে উপবিষ্ট কর্ণেল হবিবুর রহমান
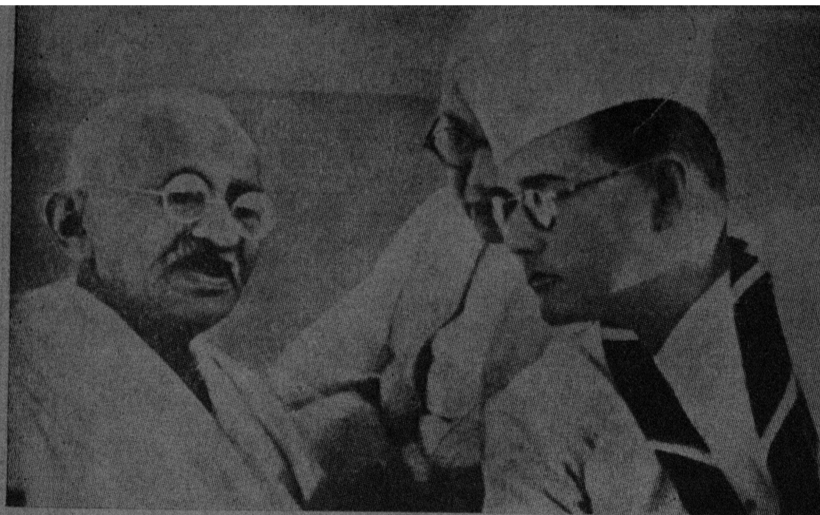
১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনারত সুভাষচন্দ্র

১৯৩৯ সালে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুভাষচন্দ্র

১৯৫২ সালে পিকিং-এ তোলা চীনা জেনারেলদের ছবি।
বাম থেকে ষষ্ঠ ব্যক্তি কে ?

ব্রহ্মদেশ সীমান্তে সফররত চীনা প্রতিনিধিবৃন্দ। বাম থেকে প্রথম ব্যক্তি কে ?
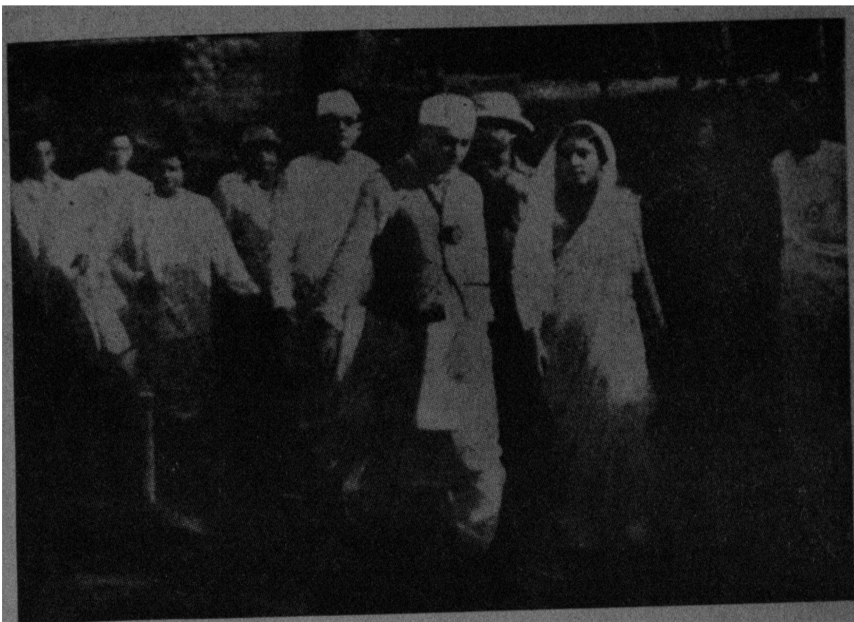
১৯৩৯ সালে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র

১৯৪০ সালে গৃহত্যাগের পূর্বে মাতা প্রভাবতী দেবী ও অগ্রজ শরৎ বসুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র
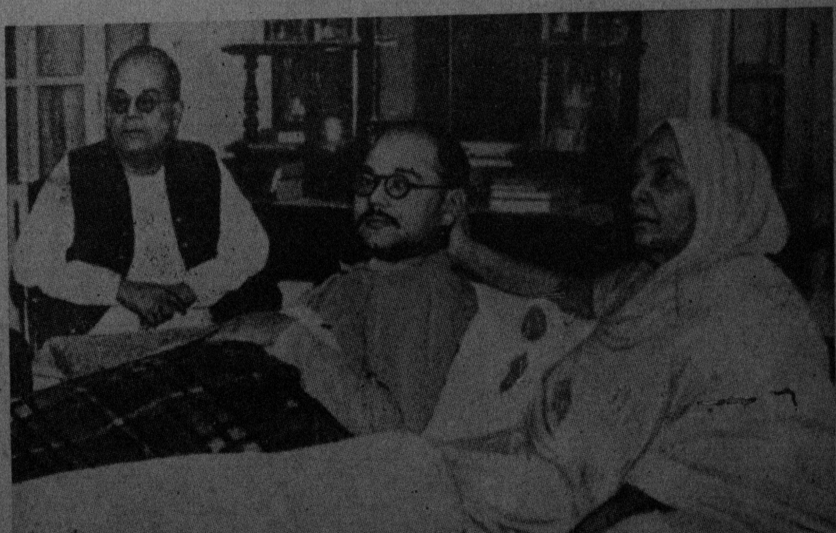
১৯৩৯ সালের
মে মাসে কলকাতার
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে
ভাষণরত সুভাষচন্দ্র
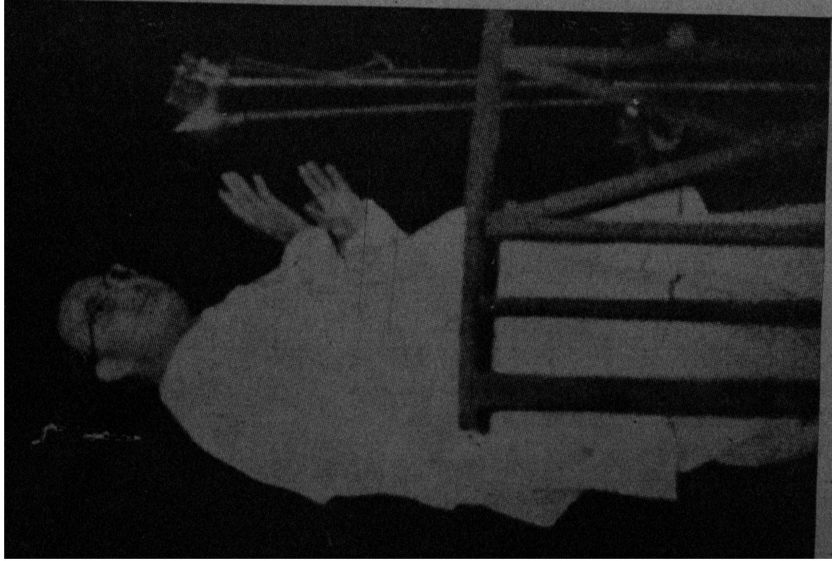
ইউরোপে
সুভাষচন্দ্র
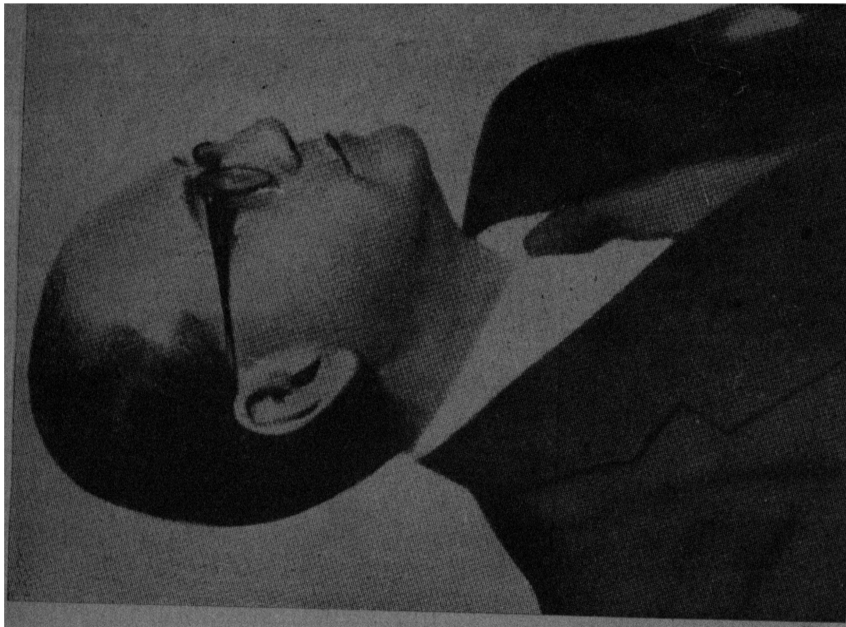
১৯৪২ সালে বার্লিনে
সোফিয়েন ষ্ট্রাসের
বাসভবনে
সুভাষচন্দ্র
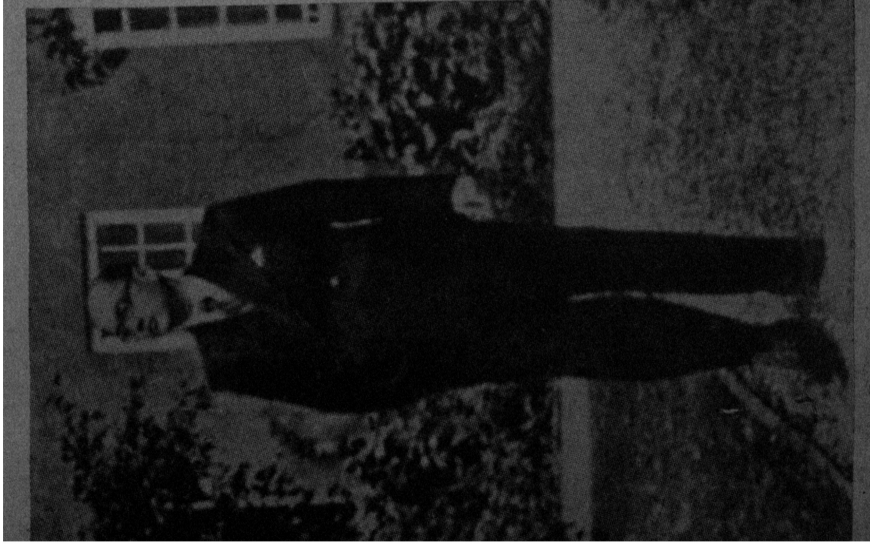
সিগারেটে অগ্নি সংযোগরত
নেতাজী

১৯৪২ সালে মেসেরিৎস-এ হাউপ্টম্যান হারবিগের সঙ্গে নেতাজী

১৯৪২ সালে জার্মানীর ফ্রাঙ্কেনবার্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের সঙ্গে নেতাজী
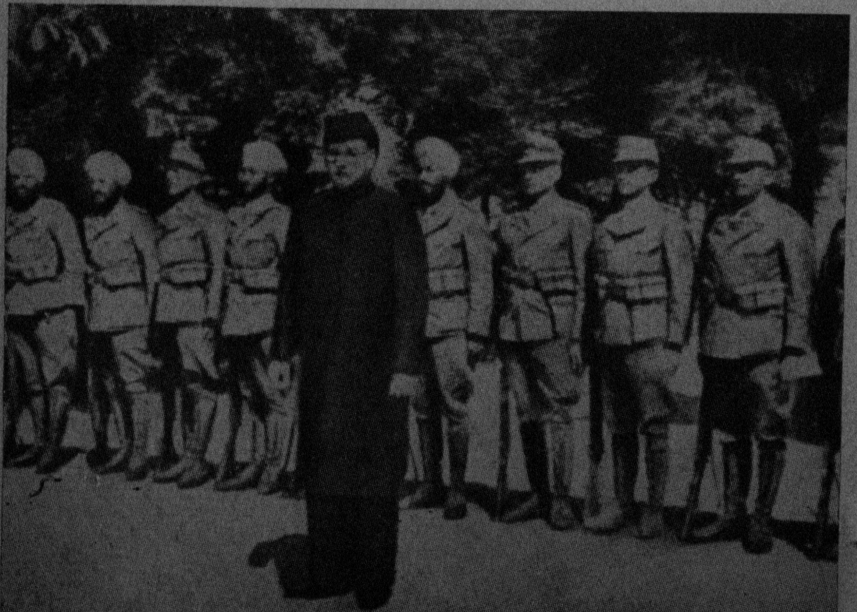
এন. জি. গানপুলের সঙ্গে নেতাজী

ইউরোপ ছেড়ে চলে যাবার সময় সাবমেরিনে
উপবিষ্ট নেতাজী ও আবিদ হাসান
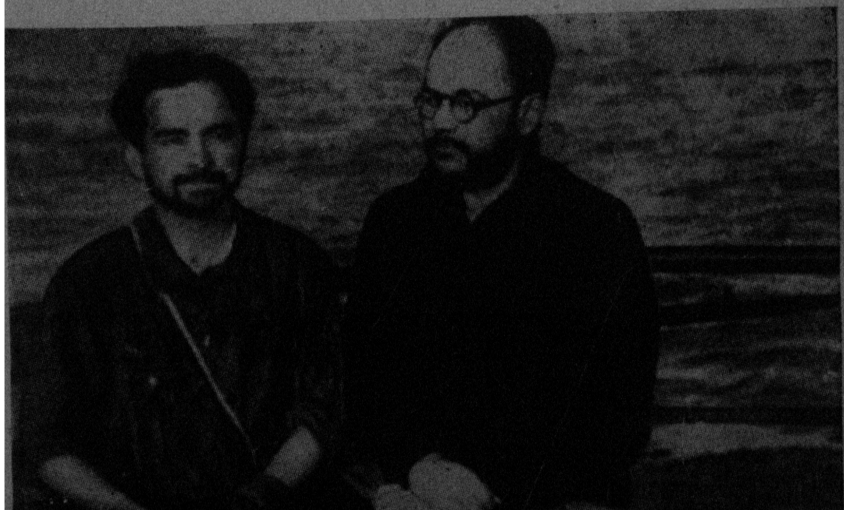
সাবমেরিনের ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে নেতাজী

সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নেতাজী

১৯৪২ সালের
ফেব্রুয়ারী
মাসে বার্লিন
রেডিয়োতে
ভাষণরত
নেতাজী
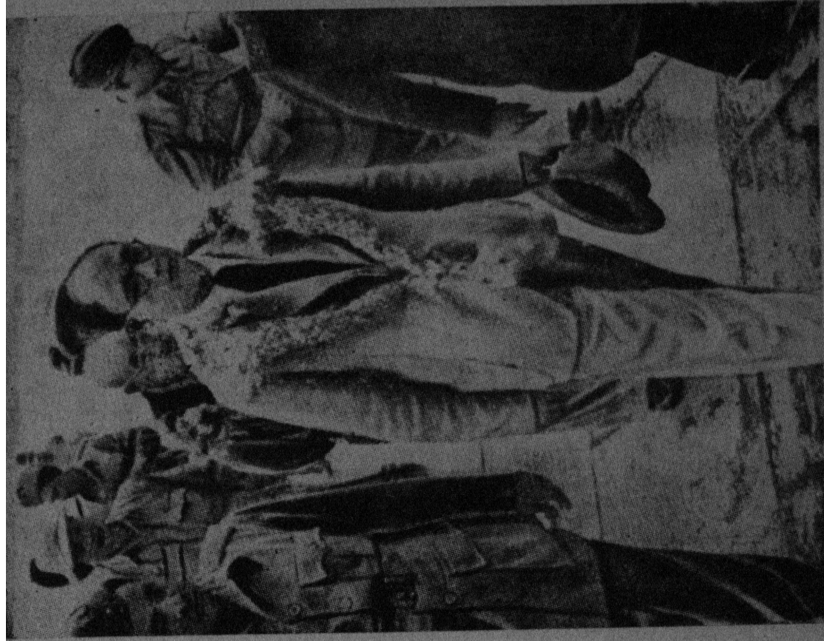
১৯৪৩ সালের
জুলাই মাসে
নেতাজীর
সিঙ্গাপুরে
আগমন
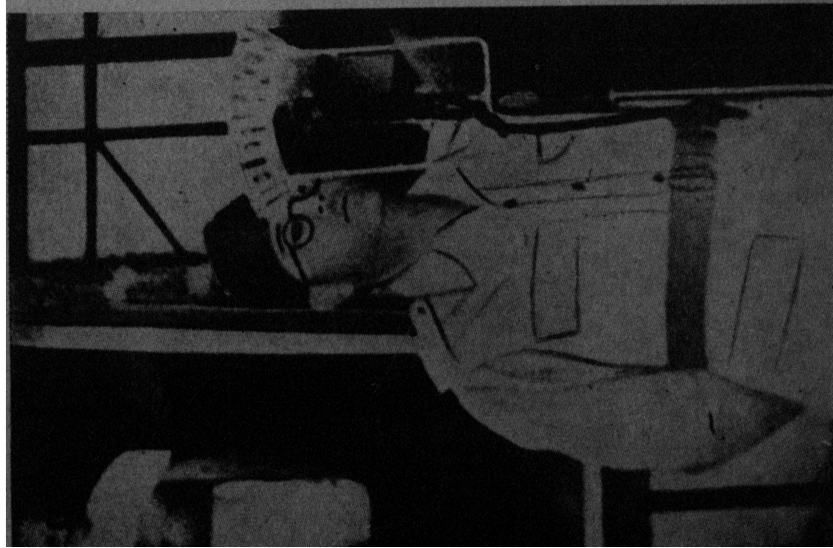
কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট দিয়েমের সমর্থনে বহির্বিশ্বে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে গেছেন।

খবরটা সকলকেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে; সকলের চোখে মুখেই এক প্রশ্ন: এরপর কি?

আমরা ত্রি-রত্ন রিপোর্টিং রুমের এক কোণায় বসে গবেষণা শুরু করে দিলাম: এরপর কি হতে পারে?

যা-যা হতে পারে এবং যা-যা হতে পারে না তার এমন এক বিরাট ফিরিস্তি তৈরী করে ফেললাম যে, যা হয়ে যাচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য করার আর কারো অবকাশই হল না।

আমাদের গবেষণা যখন পুর্ণদ্যোমে এগিয়ে চলেছে তখন কিন্তু ওদিকে এডিটোরিয়াল রুমে কর্তা ব্যক্তিদের এক বিরাট বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। এতবড় সংবাদটাকে যতদুর সম্ভব তথ্যপুর্ণ করে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সে নিয়ে নানান সলাপরামর্শ চলেছে।

কর্তাদের বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেটা আমাদের জানার কথা নয়। তবে এই বৈঠকে দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহের যে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেটা জানতে পারলাম আমাদের সব থেকে নিকটবর্তী ওপরওয়ালা মিঃ কুলকার্ণির কাছ থেকে।

তখন ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘরে। বেশ একটু হন্তদন্ত হয়েই মিঃ কুলকার্ণি আমাদের কাছে একরকম ছুটে এলেন। আমাকে এবং শশীভূষণকে বললেন, 'বাসু, শশী, হ্যারী অন; এখন তোমরা সোজা জওহরলাল ইউনিভারসিটিতে চলে যাও। ওখানে সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ষ্টাডিজ ডিপার্টমেণ্টে ডক্টর অশোক ভারমাকে পাবে। ভদ্রলোক দুরপ্রাচ্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তার সঙ্গে দেখা করে বর্তমান সিচ্যুয়েশন সম্পর্কে তার মতামত এবং ভিয়েৎনামের একটা হিষ্টরিক্যাল ও পলিটিক্যাল এ্যানালিসিস যোগাড় করে আন।'

'অল রাইট স্যার।' বলে বের হতে যাব এমন সময় হঠাৎ

রাকেশের দিকে চোখ পড়ে গেল। দেখি ওর চোখ ছুটো কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

রাকেশ আমাদের শুধু সহকর্মী নয়; আমরা ছোটবেলা থেকে এক স্কুলে, এক ক্লাসে পড়েছি। তাই ওর মুখের দিকে তাকালেই আমি বুঝেতে পারি কখন ও খুশী, কখন দুঃখী।

আমরা দু'জন যাচ্ছি অথচ ও একা একা এখানে বসে থাকবে সেটা ওর নিশ্চয় ভাল লাগছে না। ওর অবস্থায় পড়লে আমারও ভাল লাগত না। আমি, শশী, রাকেশ—স্কুলের সেই প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন এক সঙ্গে কাটিয়েছি। এমনকি রবিবার কিংবা ছুটির দিনগুলোও বাদ যায়নি। সবাই আমাদের সেই ছোটবেলাতেই ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'। মাঝখানে শুধু চার বছরের জন্য আমি ওদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম—কলকাতায় কলেজে পড়তে গিয়ে। এছাড়া আজ পর্যন্ত আমাদের বন্ধন অবিচ্ছেদ্যই রয়েছে।

সেই রাকেশের এমন পাংশু মুখ দেখে ওকে একা রেখে যেতে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

হঠাৎ মথায় একটা বুদ্ধি এল।

রাকেশ, আমি এবং শশী এখানে যেমন সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেছি, তা করেনি। এখানে ওর নিয়োগ ফটোগ্রাফার হিসেবে। সুতরাং বুদ্ধি যোগাতে দেরী হল না। কুলকার্ণিকে বললাম, 'স্যার, রাকেশও আমাদের সঙ্গে চলুক না—সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যান থাকলে সুবিধে হয়।'

মুচকি হেসে কুলকার্ণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইজ ইট দ্যা রিয়েল কজ ?'

জবাব দিলাম, 'ইয়েস স্যার।'

কুলকার্ণি বললেন, 'ইউ আর টু চাইল্ড মাই বয়।' তারপর অনুমতি দিলেন, 'অল রাইট, গো-অন।'

আমার আবেদন মঞ্জুর হল।

সাড়ে এগারটা নাগাদ তিনজন এসে হাজির হলাম জওহরলাল ইউনিভারসিটিতে। বেয়ারা আমাদের সঙ্গে করে ডঃ ভারমার ঘরে পৌঁছে দিল।

ডঃ ভারমা তখন ঘরে ছিলেন না। পাশের ঘরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, উনি ক্লাস নিতে গেছেন। বারটা নাগাদ ফিরবেন।

অগত্যা অপেক্ষা করতে হল।

ঠিক বারটার সময় ডঃ ভারমা ঘরে ফিরলেন। তাকে দেখে আমরা তিনজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নমস্কার বিনিময় হল।

শশীভূষণ আমাদের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার কারণ বলল। শশীভূষণের কথা শুনে ভদ্রলোক সোৎসাহে সবাইকে বসতে বললেন।

আমরা ভিয়েৎনামের সাম্প্রতিক মিলিটারী ক্যু'র রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য জানতে চাইলাম।

ডঃ ভারমা বললেন, 'দেখুন, ভিয়েৎনামের মিলিটারী ক্যু'র কারণ জানার আগে সে দেশের রাজনৈতিক পশ্চাৎপটটা খুব সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে। আপনারা জানেন, কিছুকাল যাবৎ-ই ভিয়েৎনামে একটা অস্বস্তিকর অস্থির অবস্থা চলেছে। যদিও সেখানে নামে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন নগো দিন দিয়েম কিন্তু আসলে সব ক্ষমতা ছিল প্রেসিডেণ্টের ভাই নগো দিন হ্যু এবং মাদাম হ্যুর হাতে। এই দুজনের নির্দেশে সে দেশের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার মাত্রাতিরিক্ত পর্য্যায়ে পেঁাছে গিয়েছিল। অবশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ দেখা দিল বৌদ্ধ উৎসবকে উপলক্ষ্য করে।

বৌদ্ধ ধর্মযাজকরা প্রথমে প্রস্তাব দিলেন যে, তারা পয়লা মে বৌদ্ধ উৎসব পালন করবেন। কিন্তু মে দিবস সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্থ দিয়েম প্রশাসন উদ্যোক্তাদের ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে সাতই

মে উৎসব পালনের অনুমতি দিল। পরে সে অনুমতিও নাকচ করে দেওয়া হল এই যুক্তিতে যে, সাতই মে দিয়েন বিয়েন ফুতে কমিউনিষ্টদের হাতে ফরাসীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। অতএব ঐ দিনে বৌদ্ধ উৎসব করতে দেওয়ার তাৎপয হবে অন্য।

দিয়েম প্রশাসন যে কি সাংঘাতিক নির্বোধদের সমন্বয়ে গঠিত তা ঐ একটা দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরের ঘটনা সকলের জানা। বৌদ্ধ জনতার দ্বারা হুয়ের গভর্ণরের প্রাসাদ ঘেরাও থেকে আরম্ভ করে রেডিওতে সারমন প্রচারের অনুমতি প্রত্যাহারের ফলে টু ডাম প্যাগোডায় সমবেত বিশ হাজার জনতার বিক্ষোভ, তাদের উপর সৈন্যবাহিনীর গুলি চালনায় অসম্মতি প্রকাশ, অসামরিক ব্যক্তিদের উপর কামান নিয়ে আক্রমণ থেকে বৌদ্ধ-পুরোহিতের আগুনে আত্মাহুতি দান, প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের প্রশাসনের একটার পর একটা নিবুদ্ধিতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন,' ডঃ ভারমা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বলেছিলের, 'হুয়েতে বৌদ্ধ ভিক্ষু যখন সরকারী অন্যায়ের প্রাতবাদে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিলেন তখন মাদাম নু্য তাঁর পারিপার্শ্বিকদের শুনিয়ে বলেছিলেন, 'ইফ দে ওয়েণ্ট অন বানিং দেমসেলভস্, আই উড ক্ল্যাপ মাই হ্যাণ্ড।' আর আজ? আজ সেই মাদাম নু্যর ঘর পুড়ছে। এখন যদি সারা দুনিয়া একতালে তাঁর কানের কাছে হাততালি দিতে থাকে তবে তিনি কি করবেন?'

এরপর আরো অনেক কথা হয়েছিল। মিলিটারী ক্যু'র নায়ক জেনারেল মিনের পূর্ব ইতিহাস, জেনারেল দিনের ষড়যন্ত্র, এবং সেই ষড়যন্ত্রের পিছনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ ও মার্কিন প্রশাসনের পরোক্ষ সমর্থন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যই আমরা সেদিন ডঃ ভারমার মুখ থেকে শুনেছিলাম।

ডঃ ভারমার ইণ্টারভিউ নিয়ে অফিসে ফিরে আমরা পরের

দিনের কাগজের জন্য যখন ফিচার তৈরী প্রায় শেষ করে এনেছি তখন টেলিপ্রিন্টারে এসোসিয়েটেড প্রেসেব একটা নিউজ এল। ভিয়েৎনামে সামরিক অভ্যুত্থানে দিয়েমেব ক্ষমতাচ্যুতির খবব শোনার পর মাদাম হ্যু এ. পির সাংবাদিককে নাকি বলেছেন, 'ইফ রিয়েলি মাই ফ্যামিলি হ্যাজ বিন ট্রেচাবাসলি কিল্ড উইথ আইদাব দ্যা অফিসিয়াল অব আনঅফিসিয়াল ব্লেসিং অব দ্যা অ্যামেবিকান গভর্ণমেণ্ট, আই ক্যান প্রেডিক্ট টু ইউ অল দ্যাট দ্যা ষ্টোরী ইন সাউথ ভিয়েৎনাম ইজ অনলি এট ইটস বিগিনিং।'

রিপোর্টের শেষে মাদাম হ্যুব এই মন্তব্যটা জুড়ে দিয়ে আমবা বলেছিলাম, 'এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড দিয়েই ভিয়েৎনামের নতুন ইতিহাসেব যবনিকা তোলা হল।'

এরপরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মাদাম হ্যুর অনুমানই ছিল সঠিক। শেষটাই ছিল আসলে শুরু।

সেদিন থেকেই ডঃ অশোক ভাবমাব সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের নিবিড়তা শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি একদিন আমাদের আপনি থেকে তুমি সম্বোধন শুরু করেন। আমরাও মনে মনে তাকে নিজের বড় ভাই হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। যখন তখন যে কোন ব্যাপার নিয়ে তার কাছে হাজির হই সমাধানেব সূত্র বের করে দেবার জন্য।

আজও একটা গোলমেলে ব্যাপারের সমাধান সূত্রের সন্ধানেই তার কাছে এসেছিলাম। হঠাৎ মস্কো যাত্রা শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের হুকুমে মেকং নদীর প্রবেশ মুখে মাইন পাতার রাজনীতিটা আমাদের কারো মাথাতেই ঢোকেনি। তাই শেষ পর্যন্ত ডঃ ভারমা সহায় ভেবে সোজা তার কাছে এসে হাজির হয়েছি।

আলোচনা শুরু হওয়ার পর কখন যে কথায় কথায় আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি তা সম্ভবতঃ কারোই খেয়াল হয়নি। ববং নতুন বিষয়টা আমাদেব কাছে যথেষ্ট উত্তেজনাকর হওয়াতে মেকং নদীর সমস্যাটা একেবারেই চাপা পড়ে গেল। দেখতে দেখতে আমবা সাইগন থেকে তাইহকু হয়ে দাইরেণ পৌঁছে গেলাম।

মুখের মধ্যের বন্দী ধোঁয়াব শেষটুকুকেও রিলিজ অর্ডাব দিয়ে ডঃ ভারমা তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর বন্ধ করা কপাট উন্মুক্ত করে ঠোঁটের কোণে বেশ মাপা হাসির রেখা টেনে বললেন, 'তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে নির্বোধ বললাম, আমার উপর নিশ্চয় খুব রেগে গেছ ?'

'মোটেই না।' শশীভূষণ বলল, 'বরং যথেষ্ট খুশী হয়েছি।'

'সে কি !'

ডঃ ভারমার গলার স্বরে বিস্ময়।

'কারণ,' বেশ গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে শশী বলল, 'আমরা সকলেই কেন একসঙ্গে ইডিযট হিসেবে বিভূষিত হলাম, সেটা এবার আপনাকে যুক্তি সহ প্রমাণ কবতে হবে।'

'ইটস এ সিম্পল জব।'

'হাউ ?'

'ডু ইউ থিঙ্ক দেম ফুল ?'

'হুম ?'

'দ্যা রাশিয়ানস।'

'মোটেই না।'

'তবে? তবে কোন ইণ্টারেষ্টে তারা নেতাজীকে ধরে সাইবেরিয়ার জেলে আটকে রাখবে ?'

ডঃ ভরমা শশীভূষণের সামনে বেশ একটা কঠিন মৌলিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

শশীভুষণ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর ডঃ ভারমাকেই উল্টে প্রশ্ন করল, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে হাজার হাজার বিদেশীকে রাশিয়া বন্দী করে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়েছে, এ তথ্য নিশ্চয় আপনার অজানা নয়?'

'সে কথা সবাই জানে।'

'তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন?'

'তারা সবাই যুদ্ধাপরাধী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তারা ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে ছিল।'

'আমি যদি বলি নেতাজীকে ঠিক সেই অপরাধেই বন্দী করা হয়েছে।'

'নেতাজী কোনদিনই ফ্যাসিষ্ট ছিলেন না।'

'কথাটা কি সত্যি? সকলেই কি তা বিশ্বাস করত?'

'বৃটিশরা ছাড়া আর সবাই তা বিশ্বাস করত।'

'ভারতীয় নেতারা?'

'যদিও দু একজন সুভাষ বোস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু সেটা গরিষ্টের মত বলে ধরে নেওয়া যায় না।'

'কমিউনিষ্ট পার্টির সরকারী মত আপনার মনে আছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তারাই একমাত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেতাজীকে কুইসলিং, ফ্যাসিষ্ট ইত্যাদি বলে গালাগাল করেছিল।'

শশীভূষণের যুক্তিগুলো ডঃ ভারমা স্বীকার করে নিচ্ছেন দেখে ও যেন একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ওর মুখের চাপা হাসিতে আমি স্পষ্ট তার আভাষ পেলাম।

'ডক্টর ভারমা,' শশীভূষণ বলল, 'যুদ্ধকালে এবং তৎপরবর্তী বছরগুলোতেও রুশ সরকারের কাছে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মতামতটা যত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত

হত সম্ভবত কে-জি-বি র গোয়েন্দাদের রিপোর্ট'ও ততটা গুরুত্ব পেত না।'

'তোমার বক্তব্যটাই যে সঠিক তার কোন প্রমাণ আছে কি?'

ডঃ ভারমার প্রশ্নের ভঙ্গীতে সন্দেহটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

'আমি ডঃ সত্যনারায়ন সিংহের 'নেতাজী মিসট্রি' বইটা থেকে আপনাকে কিছু অংশ পড়ে শোনাই, তারপরে আপনি আপনার মতামত দেবেন।'

'ঠিক আছে।'

ডঃ ভারমা শশীভূষণের প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

শশীভূষণ ওর কাঁধের ঝোলাটা থেকে একটা কাগজের মলাট-ওয়ালা বই বের করে তা থেকে পড়তে শুরু করল: 'পরিষ্কার বাংলায় ভেরা আমাকে বলল, 'আকিমভ্‌কে আপনার মনে পড়ে? লুবিয়াস্কায় আপনাকে সেই যে বদমাস লোকটা জেরা করেছিল? যুদ্ধের ক'বছর সে ভারতীয় সামরিক ইউনিটের অধ্যক্ষ হয়েছিল।'

'রুশ দেশে ভারতীয় সামরিক ইউনিট!'

'অবশ্য এ ইউনিটে কোন ভারতীয় ছিল না, রুশীদের এটা একটা গুপ্ত শিক্ষণকেন্দ্র। উদ্দেশ্য, ভারতীয় সিবিল সার্ভিস কর্মচারীদের অনুরূপ একদল ক্যাডার সৃষ্টি করা। প্রয়োজনবোধে এরা ভারত সম্পর্কে কাজকর্ম চালাতে পারবে।'

'মতলব?'

'উনিশ শ চল্লিশ সালের শেষে হিটলার ষ্ট্যালিন গোপন মোলাকাতে সাব্যস্ত হয় যে, বৃটিশদের তাড়িয়ে দেবার পর ভারত রুশ তাঁবে যাবে। তাই আমাদের ভারতীয় এলাকা শাসনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রশাসনযন্ত্র তৈরী রাখতে হয়েছিল। অবশ্য ষ্ট্যালিনের সঙ্গে হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ব্যবস্থা বানচাল হয়ে পড়ে।'

'এতে ভারত সম্পর্কে কি হল?'

'নাৎসীদের রাশিয়া আক্রমণের পর হিটলার ভারতকে নিজের তাঁবে রাখার আশা পোষণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের দালাল হিসেবে কাজ করার জন্য নাৎসীরা ফ্যাসীপন্থী ভারতীয় নেতা সুভাষ বসুকে গোপনে বার্লিনে আনার বন্দোবস্ত করে।'

আমি প্রতিবাদ করলাম, 'সুভাষ বসু কোন দিনই ফ্যাসীপন্থী ছিলেন না।'

কিন্তু আকিমভের মত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের তাই-ই ধারণা। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অনুচরদের দিয়ে সুভাষ বসু সম্পর্কে সে একরাশ রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে। লুবিয়াস্কার ভারতীয় ইউনিটের এক মিটিংয়ে আমি একদিন উপস্থিত ছিলাম। সেদিন আকিমভ বলে যে, তিরিশের দশকের গোড়াতে ইউরোপ সফরের সময় বোস ফ্যাসিষ্ট দলে যোগদান করেছেন।'

'এ খবর সম্পূর্ণ বাজে।'

'আকিমভ তাঁর যুক্তির সমর্থনে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার বিবৃতির উল্লেখ করে প্রমাণ করেছে যে সুভাষ বসু ফ্যাসীপন্থী।'

'তাদের বিবৃতির অপব্যাখ্যা করেছে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি।

'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বার্লিনে পৌঁছিয়ে সুভাষ বসু হিটলারের ফ্যাসীবাদী এশীয় মিত্রদের অন্যতম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। আমাদের সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের উদ্দেশ্যে চরম বিশ্বাসঘাতক জেনারেল ভলাসভের অনুগামীদের দিয়ে তাঁর লোকজনের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।'

'আপনি ভুল শুনেছেন। প্রাচ্য যাত্রার সময় সুভাষ বসু তাঁর ইউরোপের ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান যে, একমাত্র ভারত অথবা ভারত-প্রান্তের কোন রণক্ষেত্রে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে তারা মোকাবিলা করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথাই ওঠে না। বরং তার অভিমত ছিল যে,

বৃটিশের একমাত্র পরম শত্রু হল রাশিয়ানরা। সুতরাং তারা ভারতের মিত্র।'

'যাই হোক, সুভাষ বসুর কার্যকলাপ সম্পর্কে আকিমভের ধারণা অন্যরকম। আমাদের চীনা কমরেডরা যখন দাইরেনে সুভাষ বসুর উপস্থিতির সন্ধান দেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁকে জেরা করার জন্য আকিমভ মাঞ্চুরিয়ায় যান। আমাদের সকলের প্রত্যাশা মত আকিমভ তাঁকে জার্মান ফ্যাসিবাদীদের মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। বহু অনুগামীদের সঙ্গে তাঁকে ইয়াকুটস্কের কেন্দ্রীয় বন্দীশিবিরে পাঠান হয়।'

এবার ডঃ ভারমা মুখ খুললেন। আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ্য করেই বলতে শুরু করলেন, 'দেখ, শুধুমাত্র ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়ে তোমরা কখনই কোন সমস্যার কেন্দ্রে পেঁছতে পারবে না। ঠাণ্ডা মাথায় এক এক করে যুক্তিগুলোকে বিচার করার চেষ্টা কর। প্রথমেই ভেবে দেখ, ডক্টর সিংহের কথা সত্যই বিশ্বাসযোগ্য কিনা। ভদ্রলোক কোন যুক্তিসঙ্গত সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই হঠাৎ বলে দিলেন, রাশিয়ানরা নাকি দাইরেন থেকে নেতাজীকে ধরে এনে ইয়াকু বন্দীশালায় আটকে রেখেছে। যেই মনের মত কথাটা শুনলে, অম তোমরা তা বিশ্বাস করে বসলে। একবারও ভেবে দেখলে না ে কথাটা কে বলছেন।' তারপর আমাদের দিকে ঝুঁকে অত্যন্ত প্রত্যয় দৃঢ় স্বরে বললেন, 'ডু ইউ নো', হি ইজ এ ষ্ট্রনজ এ্যান্টি কমিউনিষ্ট ?'

শশী বলল, 'সেটা অবশ্য শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে এ ঘটনার যোগ কি ?'

'তিনি যে রাশিয়ানদের সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষকে উস্কে দেবার উদ্দেশ্যে বেশ প্রি-প্ল্যানড্ করে একথা বলেছেন না, তার-ই বা প্রমাণ কি ?'

ডঃ ভারমা শশীর প্রশ্নটার জবাব উল্টে শশীর কাছেই জানতে চাইলেন।

শশী সোজা উত্তর দিল, 'যদি তিনি সত্যি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একথা বলে থাকেন তবে গভর্ণমেণ্টের উচিত এ ব্যাপারে ষ্টেপ নেওয়া।'

ডঃ ভারমা বললেন, 'তাতে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠবে।'

'তা বলে সরকার জেনে শুনে কাউকে এমন ক্ষতিকর গুজব রটাতে দেবেন! আমার কাছে এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

শশী স্পষ্ট ভাবে তার অসম্মতি জানাল।

ডঃ ভারমা একটু মুচকি হাসলেন। তারপর আদালতের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আসামীকে জেরা করার ভঙ্গীতে বললেন, 'তুমিই বল, এটা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করার কোন স্কোপ কি এই রিপোর্টে আছে? কোথাকার কে ভেরা, কোথাকার কোন আকিমভ, তাদের কিভাবে আমাদের সরকার আদালতে এনে উপস্থিত করবে? এটা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই গভর্ণমেণ্টই একবার তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে ঘোষণা করেছে যে, নেতাজী তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তারপর তাঁর জীবিত থাকার গুজব নিয়ে তদন্ত করাটা একটা চূড়ান্ত মূর্খামী হবে না কি?'

শশী বলল, 'হয়তো হবে। তবে আপনি যে কথা বললেন, সেটা কি ঠিক?'

'কোনটা?'

'এই, নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুটা।'

'কেন ঠিক নয়?'

'আপনি কি নেতাজী ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়।'

'রিপোর্টটা পড়তে পড়তে আপনার কি একবারও মনে হয়নি যে এর পাতায় পাতায় বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। একবারও

কি আপনার মাথায় এ চিন্তাটা আসেনি যে, একটা বিশেষ দুর্ঘটনা সাতটা বিভিন্ন কারণের জন্য ঘটতে পারে না ; কিংবা একই দুর্ঘটনার স্থান পাঁচটা বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে না ; তা ছাড়া একজন লোকের আট বার মৃত্যু হওয়াটাও সম্ভব নয় ।'

'এ সব তথ্য তুমি কোথায় পেলে ?'

ডঃ ভারমার গলায় বিস্ময়ের সুর ।

'মাননায় ভারত সরকারের দয়ায়—নেতাজী ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টে ।'

শশীভূষণের মুখে উন্নাসিকের হাসি ।

'কৈ, আমার চোখে তো তেমন কিছু পড়েনি ।'

'আপনি যদি প্রি কনভিনসড্ না হতেন তা হলে আপনার চোখেও এই সহজ সত্যটা ধরা পড়ত ।'

'দিস ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট শশী, ইটস্ অ-ফুলি ব্যাড ।' ডঃ ভারমার চোখে মুখে স্পষ্টতই বিরক্তির চিহ্ন, 'তোমাদের নিউ জেনারেশনের এই একটা অদ্ভূত দোষ—তোমরা কিছুতেই বিরোধী মতকে সহ্য করতে পার না । যাদের সঙ্গেই তোমাদের মতের একটু অমিল ঘটল, তাদেরই তোমরা প্রি-কনভিনসড্, দালাল ইত্যাদি যা মুখে আসে তাই বলতে শুরু কর । এটা মোটেই প্রশংসাব্যঞ্জক নয় ।'

'কথাটা তা নয় ডক্টর ভারমা,' শশীভূষণের গলার স্বর এখন অনেক নরম, 'আমরা বিক্ষুব্ধ এটা ঠিক, কিন্তু সেটা যে অযথা তা কেউই বলতে পারবে না । আপনি কি একথা অস্বীকার করতে পারবেন যে আজকাল অনেক তথাকথিত শ্রদ্ধেয় জননেতাও নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'হ্যাঁ'কে 'না' এবং 'না'কে 'হ্যাঁ' করছেন না ?'

'দ্যাটস্ এ্যান আদার থিঙ্ক ।'

'আদার থিঙ্ক নয় ডক্টর ভারমা, নেতাজীর ব্যাপারটাও ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলা হয়েছে—কিছু তথাকথিত নেতার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ।'

সন্দেহ নিরসনতে লাভ কি হয়েছে?'
গঠনের সিলাভ হয়েছে ভাইসাব, অনেক লাভ।'
'সত্যিলা বলতে বলতে শশীভূষণের গলার স্বর ভিজে হয়ে
'আমশ আবেগপূর্ণ স্বরে ও বলে, 'আপনিই বলুন, নেতাজী
'ইউ আজ কি দেশের অবস্থা এত খারাপ হত?'
পাল্টে যাবেঁচে থাকলে নিশ্চয় ফিরে আসতেন।'
কমিটি লিতিনি ফিরে আসতে পারতেন না। একরকম চিৎকার
এর পিছনীভূষণ বলল, 'তাঁকে ফিরে আসতে দেওয়া হত না। যারা
সত্য প্রশ্নন থেকে, দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল তারাই তাঁর
ফিতিনি এইার পথে বাঁধা সৃষ্টি করত।'

'সআইশশী, আই ডিফার উইথ ইউ।'

ডঃ ভারমা একটা নতুন চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

'আপনি আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে আমার যুক্তিগুলো নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে না।'

শশীভূষণ যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে।

'তোমার যুক্তিগুলো যে কি সেটাই তো এখন পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।'

ডঃ ভারমার চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ বেশ স্পষ্ট।

শশী অত্যন্ত ধীর অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমার যুক্তিগুলো কিন্তু বেশ সহজ ডক্টর ভারমা।'

'যুক্তিগুলো যে কি সেটা যতক্ষণ জানা না যাচ্ছে ততক্ষণ সেটা সহজ না কঠিন তা ভেবে সময় নষ্ট করাটা আমার কাছে শুধু পণ্ডশ্রমই নয়, নির্বুদ্ধিতাও বটে।'

'আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে পণ্ডিত নেহরু কোন দিনই চাইতেন না যে সুভাষ বসু ভারতে ফিরে আসেন?'

'তিনি কি চাইতেন, কি চাইতেন না, তা আমার জানা নেই। তবে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝি, একজন মৃত লোকের

স্ব-শরীরে প্রত্যাবর্তনের চিন্তাটা একমাত্র পাগলে ষ দুর্ঘটনা শোভনীয়—সুস্থ লোকের পক্ষে নয়।' "দুর্ঘটনার

'যুক্তির দিক থেকে আপনার কথাটা চমৎকার—এ. একজন স্বীকার করতেই হবে, অন্ততঃ যতদিন না বজেনীতিবিদ বলে ঘোষণা করার আইন দেশে চালু হচ্ছে।' তারপর গলার স্বরটাকে বেশ নীচু পর্দায় নামিয়ে শশী বলল, ' প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমি আপনার কাছ থেকে জা কমিটির আশাকরি আমাকে নিরাশ করবেন না।'

ডঃ ভারমা অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সম্ভব হ গ পাবে।' মাস

'আপনার কি মনে হয়, নেতাজী মৃত, পণ্ডিতজী রি অ বিশ্বাস করতেন?'

'পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, তাই কখনো তাঁকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি।'

ডঃ ভারমা কথাগুলো যে খুব তির্যক ভাবে বললেন সেটা আমাদের কারোই বুঝতে বাকী রইল না।'

'তবে,' ডঃ ভারমা তার কথার রেশ টেনে বললেন, 'আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, বিশ্বাস না করার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল না।'

'অল রাইট, আমি আপনার কথা মেনে নিলাম।' শশীভূষণ বলল, 'এবার দয়া করে বলবেন কি, নেতাজী মৃত জানা সত্বেও নেহরুজী শাহনাওয়াজ কমিটি গঠন করেছিলেন কেন?

'এর উত্তর তো খুব একটা কঠিন নয়, শশী। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলের কাছ থেকে এমন ভোঁতা প্রশ্ন তো আমি আশা করি না ব্রাদার।'

'তবু, প্রশ্ন যখন করেছি, জবাবটা দিন।

'জবাবটা তুমিও জান। নেতাজীর [illegible] সম্পর্কে দেশবাসীর মনের

সন্দেহ নিরশন করতে নেহরুজী শেষ পর্যন্ত ইনকোয়ারী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

'সত্যি কি তাই ?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'ইউ আর রং ডক্টর ভারমা।' শশীভূষণের গলার স্বর মুহূর্তে পাল্টে যায়। বেশ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ও বলে, 'নেহরু সাহেব এই কমিটি নিয়োগ করেছিলেন জনতার মনের সন্দেহ নিরশন করতে নয়। এর পিছনের কারণ ছিল অনেক গভীর। তাঁর মনে সর্বদা ভয় ছিল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ার। সেই ভয়েই শেষে একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি এই কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।'

'আই ডোণ্ট বিলিভ ইট।'

ডঃ ভারমা এক কথায় শশীর সমস্ত অনুমান নসাৎ করে দিলেন।

'এইজন্যই তো আমি আপনাকে একটু আগে প্রি-কনভিনসড্ বলছিলাম।'

'শুধু বললেই তো হবে না, তোমাকে প্রমাণও করতে হবে।'

'অল রাইট, আই উইল প্রুফ ইট।'

'হ্যারী আপ মাই ব্রাদার, হ্যারী আপ।'

গলার স্বরে তাচ্ছিল্যের সুরটা স্পষ্ট করে তোলার জন্যই যে ডঃ ভারমা 'হ্যারী আপ' কথাটা দু'বার উচ্চারণ করলেন সেটা আমাদের কারোই বুঝতে বাকী রহিল না। এবং আমরা যে ডঃ ভারমার তাচ্ছিল্যটা ধরে ফেলেছি এটা বুঝতে পেরে ডঃ ভারমা মনে মনে বেশ খুশী হলেন। তার মুখের ঔজ্জ্বল্যতার আকস্মিক বৃদ্ধিই আমাদের অনুমানকে সত্য বলে প্রমাণিত করল।

ডঃ ভারমার মুখের তাচ্ছিল্যের হাসিটার মানে স্পষ্ট বুঝতে পেরেও শশী অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে বলল, 'আপনার মনে আছে নিশ্চয় ডক্টর ভারমা, উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে লোকসভায় হরিবিষ্ণু কামাথ সরকারের কাছে নেতাজীর

অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন, কেন ভারত সরকার নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করছেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিন কি বলেছিলেন তাও নিশ্চয় আপনার মনে আছে ?'

'সঠিক মনে পড়ছে না।'

'পণ্ডিতজী বলেছিলেন, 'যদি এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করতে হয়, অর্থাৎ যদি সত্যিকারের ফলদায়ক অনুসন্ধান করতে হয় তবে একমাত্র জাপান সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব। কারণ, জাপানেই সব কিছু ঘটেছিল। আমরা জাপানের উপর চড়াও হয়ে সেখানে কোন অনুসন্ধান করতে পারি না। অবশ্য জাপান সরকার যদি নিজে থেকে কোন অনুসন্ধানকারী দল পাঠান তাহলে আমরা সেই দলকে যথাসাধ্য সাহায্য করব ; কিন্তু আমরা আগ বাড়িয়ে তাদের দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করব না। বিশেষতঃ এই ঘটনার অধিকাংশ সাক্ষীই যখন জাপানী এবং জাপান সরকারের কর্মচারী।'

ডঃ ভারমা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'পণ্ডিতজী ঠিকই বলেছিলেন।'

'নিশ্চয় ঠিক বলেছিলেন।' শশীভূষণ ডঃ ভারমাকে সমর্থনের ভঙ্গীতে বলে, 'ডক্টর ভারমা, আমার নিজের বিচার বলে কি জানেন, যাই হোক না কেন, পণ্ডিত নেহরুর উচিত ছিল শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকা। কিন্তু বিধাতার পরিহাস বড় কঠিন—তাই সেই নেহরু সাহেবই, যিনি একদিন জোর গলায় বলেছিলেন, 'নেতাজীর মৃত্যুর ব্যাপারে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই' তিনিই আর একদিন ঘোষণা করলেন, 'নেতাজীর মৃত্যুর যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য শাহনওয়াজ কমিটি গঠন করা হল।' হোয়াটস্ এ ওয়াণ্ডারফুল বুমেরাং !'

'অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে অনেক কিছুই পাল্টে যায়। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলাটাই আমার মতে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তা ঠিক।' চলচ্চিত্রের সুদক্ষ অভিনেতার মত ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁটের কোণে বেশ মাপা হাসি এনে শশীভূষণ বলল,'অস্বীকার করা যায় না, ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ছাপান্ন সালের পাঁচই এপ্রিল ভারত সরকারের তরফ থেকে যখন শাহনওয়াজ খানের নেতৃত্বে গঠিত তিনজন সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটির কথা ঘোষণা করা হল, তার বেশ কিছুদিন আগে কলকাতায় নেতাজী স্মারক সমিতির উদ্যোগে মনুমেণ্টের নীচে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন মেজর শাহনওয়াজ খানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই সভায় মেজর শাহনওয়াজ খান যখন জানালেন যে, পণ্ডিত নেহরু যে কোন প্রকারের সরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে,তখন সিদ্ধান্ত হল,স্মারক সমিতির উদ্যোগে একটা বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জনসাধারণের কাছে সাহায্য হিসেবে চাওয়া হবে। তাছাড়া সভায় এও ঠিক হল যে, নেতাজীর বড় ভাই সুরেশচন্দ্র বসুকে এই কমিটির সভাপতি করা হবে। এবং আমি যদি বলি ডক্টর ভারমা,' শশীভূষণ মৃদু হাসল, 'এই বেসরকারী কমিটি গঠনের কথা শুনেই নেহরু সাহেব ঘাবড়ে যান এবং চটপট শাহনওয়াজ কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন, তাহলে কি খুব একটা অন্যায় কিছু বলা হবে?'

'ঘাবড়ে যাওয়ার যুক্তিটা আমার কাছে মোটেই সহজবোধ্য হচ্ছে না।'

ডঃ ভারমা শশীর দেওয়া কারণটা মানতে চাইলেন না।

'একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।'

শশীভূষণের কথায় ডঃ ভারমা আধ মিনিট চুপ করে যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন এমন ভাব করলেন। তারপর বললেন, 'দুঃখিত, আমার কাছে যুক্তিটা এখনো বোধগম্য হল না।'

'ভয়টা কোথায় বলব ?'

'বল।'

'বেসরকারী কমিটি যদি একবার সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে যেত, এবং সেই কমিটি যদি অনুসন্ধান করে সত্যি কথাটা প্রকাশ করে দিত তাহলে ভারত সরকার এবং তার কর্ণধারেরা ব্যক্তিগতভাবে বেশ বেকায়দায় পড়ে যেতেন।'

'তা নয় বুঝলাম, কিন্তু সত্যি কথাটা যে কি, তা তো তুমি নিজেও এখন পর্যন্ত প্রকাশ করলে না।'

'আদপে তাইহকুতে ঐ দিন কোন বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি।'

'বাঃ, চমৎকার। তুমি নিজেই তো সিদ্ধান্ত করে ফেলেছ তাহলে আর এসব তদন্ত কমিটির কি দরকার ছিল!'

'সিদ্ধান্তটা আমার নয় ডক্টর ভারমা, অনেকের।'

'আর কার কার, দু একটা শুনি ?'

ডঃ ভারমার সমগ্র মুখমণ্ডল জুড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

'গত কয়েক বছর ধরে আমি আমার ব্যক্তিগত নোটবুকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার থেকে দু' একটা উদাহরণ দিলেই আপনি আমার অনুমানের সত্যাসত্য বুঝতে পারবেন।' কথা বলতে বলতেই শশীভূষণ ওর নোট বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থেমে যায়। ডঃ ভারমার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'আপনি যদি সত্যি সত্যি গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার যুক্তিগুলো শোনেন তাহলে আমি আপনার সামনে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য রাখতে পারি।'

এতক্ষণ পরে ডঃ ভারমার উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে তিনি সত্যই এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় শুনব, তুমি বল। ইটস এ্যান ইনটারেষ্টিং ম্যাটার।'

শশী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মনে আছে কি, কবে নেতাজীর মৃত্যুর খবর প্রথম ঘোষণা করা হয় ?'

ড, ভারমা বললেন, 'আঠারই আগষ্ট তো মারা গিয়েছিলেন, তাহলে নিশ্চয় উনিশ কিংবা বিশ তারিখে।'

'মোটেই না। জাপানের সরকারী রেডিও নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রথম ঘোষণা করে বাইশে আগষ্ট সন্ধ্যায়। এই সংবাদ ঘোষণার সময়ই জেনারেল ম্যাক-আর্থার তার দলবল সহ জাপানের মূল উপকূলে অবতরণ করছিলেন। আমেরিকান সৈন্যদলের কাঁটামারা বুটের স্ব-শব্দ আস্ফালনে যখন নতুন সূর্যের দেশ নিপ্পনের পবিত্র মাটি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই জাপান রেডিওর ভাষ্যকার সমগ্র বিশ্বকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জাপানের নবগঠিত সরকার এই সংবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক, মিষ্টার চন্দর বোস গত আঠারই আগষ্ট দুপুর দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় তাইহকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জাপানের একটি হাসপাতালে আনীত হন। ডাক্তারদের শত চেষ্টা সত্বেও তাঁকে বাঁচান যায়নি। ঐ দিন মধ্যরাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।'

এই খবর ঘোষিত হওয়ার পরদিন সকালে জাপানের সরকার নিয়ন্ত্রিত দোমেই নিউজ এজেন্সী সেই একই খবর সমগ্র বিশ্বের সংবাদপত্রের অফিসে পাঠিয়ে দিল।

ভারতবর্ষের প্রতিটি সংবাদপত্রে খবরটা প্রকাশিত হল। তবে দু' একটা পত্রিকা ছাড়া আর কেউই এ সংবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করল না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সবার মনেই প্রথম থেকে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।'

শশী বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে চলল, 'অবশ্য এই সন্দেহ জাগাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ, এর আগেও একবার ঠিক একই ভাবে ইউরোপ থেকে জাপানে আসার পথে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছিল।

সেটা ছিল উনিশ শ' বিয়াল্লিশের আঠারই মার্চ। বিকেল তখন পাঁচটা। সংবাদপত্রের অফিসে কর্মীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে টেলিপ্রিন্টারে আসা খবরগুলোকে পরের দিনের কাগজের জন্য নিজেদের সুবিধে মত এডিট করে কম্পোজিং রুমে পাঠিয়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ টেলিপ্রিন্টারের কী বোর্ডটা মুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেল। তারপর এল সতর্কবাণী—ফ্লাস, ফ্লাস, ফ্লাস!

প্রত্যেকের চোখে মুখে ফুটে উঠল দারুন উত্তেজনা। সকলেই জানতে চাইছেন, এরপর কি? কি খবর নিয়ে আসছে বৈদ্যুতিক বার্তা দূত? কার খবর?

বোধহয় ত্রিশ সেকেণ্ডও অপেক্ষা করতে হল না। তবু মনে হল, এ প্রতীক্ষা অনন্তকালের; হয়তো অনন্তকাল ধরেই চলবে।

কিন্তু না, এক সময় এই শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, হঠাৎ দ্বিধায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়া টেলিপ্রিন্টারের কী বোর্ডটা তার সমস্ত লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে মেদিনী কাঁপান প্রলয়নৃত্য শুরু করে দিল। কী বোর্ডের এই বেলজ্জ ব্যবহারে জড়সড় হয়ে গুটিয়ে থাকা শ্বেতশুভ্র কাগজের রিলটা প্রথমে একেবারে হতবাক হয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর যেন কত অপমানে-লাজে-ক্ষোভে তার সমস্ত দেহে কম্পন দেখা দিল। অসহ্য যন্ত্রনা সত্বেও সে বুক পেতে গ্রহণ করল সেই ভয়াবহ সংবাদটা।

খবরটা দিচ্ছে রয়টার, লণ্ডন থেকে। বলা হল: 'এইমাত্র টোকিও থেকে নির্ভরযোগ্যসূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মিষ্টার সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ জাপানের সমুদ্রতীরে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে নিহত হয়েছেন। তিনি টোকিওতে প্রথম স্বাধীন এশীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি মিষ্টার রাসবিহারী বসুও ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় ফলে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।'

এই মর্মান্তিক খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের মা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীকে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন ঃ 'আপনার বীর সন্তানের মৃত্যুতে সমগ্র জাতি আপনারই মত শোকমগ্ন। আপনার এই গভীর দুঃখে আমার পূর্ণ সমবেদনা জানাচ্ছি। ভগবান আপনাকে এই নিদারুণ ক্ষতির বেদনা সহ্য করার শক্তি দিন।'

দু'তিনদিন পরেই সত্য ঘটনা জানা গেল। দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু তো দূরের কথা, তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ও লাগে নি। তিনি বহাল তবিয়তেই জার্মানীতে রয়েছেন। আসলে ভারতবাসীর বিপ্লবী চেতনাকে হতোদ্যম করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা আগে থাকতে বেশ সুচতুর পরিকল্পনা করেই এ খবরটা রটিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যার বেড়াজালকে ছিন্নভিন্ন করে সত্য তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সত্য ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যৌথভাবে প্রভাবতী দেবীর কাছে আর একটা তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন ঃ 'ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, যা সত্য বলে শোনা গিয়েছিল, তা মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। আমরা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

সম্ভবতঃ পুরান অভিজ্ঞতার কথা মনে থাকাতে এবার সব নেতাই প্রথম থেকেই এ ঘটনা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে ওঠেন। কেউই মন থেকে এ সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেন না।

এই সন্দেহের প্রথম প্রকাশ ঘটল পুনায়। সেখানে ডাক্তার দিন শাহ্ মেহতার নেচার-কিওর হোম-এ মহাত্মা গান্ধী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাস করছিলেন। সুভাষ বসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভবন-শীর্ষে জাতীয় পতাকা অর্ধ-নমিত রাখার যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, প্রচারিত মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে কারো কারো মনে বিশেষ সন্দেহ থাকায় সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

এর চারদিন পর কলকাতা কর্পোরেশনের বৈঠকে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। নেতাজীর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের সদস্যরা যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন দেখা গেল ইউরোপীয়ান দলের সদস্যরা ঠায় বসে রয়েছেন।

মেয়র ইউরোপীয়ান দলের নেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা শোক-প্রকাশের জন্য উঠে দাঁড়াবেন কি না ?

জবাবে ইউরোপিয়ান দলের নেতা মিষ্টার জে, এইচ, মেগুল বললেন, তারা উঠে দাঁড়াবেন না ; কারণ, তাদের দলের কেউ সুভাষ বসু সত্যি সত্যি মারা গেছেন, একথা বিশ্বাস করেন না।

মেয়র তখন ইউরোপীয়ান দলের সব সদস্যকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললেন। তার কথায় মিষ্টার এ, এ, ওয়াইজ ছাড়া আর সব সদস্যই ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন।

এরপর মেয়র মিষ্টার ওয়াইজকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উঠে দাঁড়াবেন কিনা ?

মিষ্টার ওয়াইজ মেয়রের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, 'আপনি এমন একজনের জন্য শোক-প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলছেন, যিনি মৃত নন। আর সেজন্যই আমি মনে করি শোক-প্রস্তাবটি বিধি-সম্মত নয়।'

ঠিক ঐ দিনই দিল্লীতে আর একটা ঘটনা ঘটে। লণ্ডনের সানডে অবজারভার পত্রিকার নতুন দিল্লীস্থ সংবাদদাতা মিষ্টার ফ্রাঙ্ক হ্যারিস জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁর মনোভাব কি তা জানতে চান। তিনি বলেন, সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে জাপান যে খবর প্রচার করেছে, তা বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক মহল মোটেই বিশ্বাস করছে না। জনৈক মার্কিন সংবাদদাতা বলেছেন, জাপান রেডিও থেকে মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় কদিন পরও সুভাষচন্দ্রকে সায়গনে দেখা গেছে এমন প্রমাণও নাকি তিনি সংগ্রহ করেছেন।'

'সেকি?' ডঃ ভারমা চমকে উঠলেন, '*সায়গনে নেতাজীকে* দেখা গেছে!'

'অত অল্পে চমকে যাবেন না ডক্টর ভারমা, আরো আছে। শুধু মুখ বুজে শুনে যান।'

শশী বেশ গম্ভীর স্বরে কথাটা বলল।

সম্ভবতঃ শশীর অতিরিক্ত গাম্ভীর্য দেখে নিজেকে সামলে নিলেন ডঃ ভারমা। তারপর নির্লিপ্তের ভঙ্গীতে বললেন, 'বল।'

'এর পরের ঘটনার নায়ক স্বয়ং গান্ধীজী।'

শশী আগের থেকে গম্ভীর স্বরে কথাটা বলল।

'গান্ধীজী!'

ডঃ ভারমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'হ্যাঁ, গান্ধীজী।'

কোনরকম উৎসাহ কিংবা বিস্ময় প্রকাশ না করেই জবাব দিল শশীভূষণ।

'কি হয়েছিল?'

প্রচণ্ড কৌতুহলের দৃষ্টিতে জানতে চাইলেন ডঃ ভারমা।

'বললাম না, এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হবেন না ডক্টর ভারমা; আরো অনেক বিস্ময়কর খবর আছে।'

খুব বিজ্ঞের সুরে কথাগুলো বলল শশী।

'ঠিক আছে, ধৈর্যটাকে আপাততঃ বেঁধেই রাখি।'

ডঃ ভারমা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গীতে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন ইজি-চেয়ারটায়।

'সেদিনটা ছিল সম্ভবতঃ বুধবার, দোসরা সেপ্টেম্বর।' বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলতে শুরু করল শশী, 'এর ঠিক দশ দিন আগে জাপান রেডিও থেকে প্রচারিত হয়েছে সেই মর্মান্তিক সংবাদ—সুভাষ নেই।

শোনা যায়, নিউজ এজেন্সীর সংবাদ শোনার পর বাপুজী নাকি

বলেছিলেন ঃ ইয়ে সব ঝুট হায় ; সুভাষ মরণা নেহি সকতা, দুসরা কিসিকা লাস জ্বলা দিয়া হোগা।

অর্থাৎ সুভাষ বসু মারা যান নি। এটাও আগের বারের মতই একটা নতুন ধাপ্পা। তফাৎ শুধু এক জায়গায়। আগের বার খবরটা রটিয়ে ছিল ইংরেজরা, এবার রটিয়েছে জাপানী।'

এতটা বলে শশী এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মনে মনে কিছু একটা চিন্তা করে নিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সে যাই হোক, দোসরা সেপ্টেম্বরের কথাই বলি।

গান্ধীজী সেদিন নেচার কিওর হোম-এ ছিলেন। প্রাত্যহিক অভ্যাস মত সেদিনও খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা শেষে সবে ঘরের বাইরে এসেছেন ; দেখেন, একদল পুলিশ সহ এক লালমুখো সাহেব দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। হাতে তার সার্চ ওয়ারেণ্ট।

বিস্ময়াবিষ্ট বাপু জানতে চাইলেন, ব্যাপার কি ?'

লাল মুখো সাহেব জবাব দিল, 'ভারত সরকারের অনুমান, সুভাষ বোস বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নি। তিনি সায়গন থেকে পালিয়ে এসে সম্ভবতঃ আপনার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন।'

সাহেবের কথায় গান্ধীজী একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের ভুল হয়েছে, সুভাষ এখানে নেই।'

চল্লিশ কোটি ভারতবাসী পঁচিশ বছর ধরে যার সব কথা বিনা জিজ্ঞাসায় সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে সেই 'সত্যাগ্রহী' বাপুর কথা লালমুখো সাহেবের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হল না। চব্বিশ জন সিপাহী নিয়ে প্রায় আট ঘণ্টা ধরে স্বাভাবিক চিকিৎসা গৃহের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক রকমের বিষাক্ত করে দিয়ে বৃটিশের ভাড়া করা দালালরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো !'

এতক্ষণ ধরে ডঃ ভারমার চেপে রাখা বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

'আরো অনেক বিস্ময়ের ব্যাপার আছে ডক্টর ভারম', দয়া করে এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়বেন না। একটু ধৈর্য ধরন।'

ডঃ ভারমাকে একটু নাড়া দেবার জন্যই শশীভূষণ ইচ্ছে করে কথাগুলো বলল।

ডঃ ভারমা বললেন, 'অল রাইট, তুমি বল।'

'এটা ঠিক ওর পরের দিনের ঘটনা।' শশী আবার শুরু করল, 'সিংহলের কাণ্ডি থেকে এসোসিয়েটেড প্রেস খবর দিল, শ্যাম সেনাবাহিনীর সহ-প্রধান সেনাপতি আকাদি যোনানবং কাণ্ডিতে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না।

শুধু এটাই নয়, এই ঘটনার কদিন পরের আর একটা ঘটনার কথা বলছি।

আঠারই সেপ্টেম্বর কলম্বোর 'সিলোন অবজারভার'-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ঐ পত্রিকার ওয়র রিপোর্টার মিষ্টার ডিউক রাইটের দেওয়া একটা সংবাদ বেশ ফলাও করে প্রকাশ করা হল।

খবরটা নেতাজীর মৃত্যু সংক্রান্ত।

মিষ্টার রাইট দেখা করতে গিয়েছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সিংহল শাখার সম্পাদক শ্রীপিল্লাইয়ের সঙ্গে। এ-কথা সে-কথায় নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ব্যাপারটা এসে পড়ল। মিষ্টার রাইট এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রীপিল্লাইয়ের মতামত জানতে চাইলেন।

শ্রীপিল্লাই জবাব দিলেন, 'আমি এই মৃত্যু-সংবাদ মোটেই বিশ্বাস করি না।'

ধুরন্ধর সাংবাদিক মিষ্টার ডিউক রাইট সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

'আপনি জানেন নিশ্চয়,' শ্রীপিল্লাই উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'উনিশ শ' বিয়াল্লিসের মার্চ মাসে ঠিক এভাবেই একবার নেতাজীর

মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছিল?' তারপর একটু হেসে বললেন, 'সেবারও কিন্তু মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছিল বিমান দুর্ঘটনা।'

'সেটার সঙ্গে এটার তফাৎ আছে।' মিষ্টার রাইট আপত্তির সুরে বললেন, 'সেবার খবরটা রটিয়ে ছিল বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টার আর এবার খবর দিয়েছে মিষ্টার বোসের মিত্র শক্তি জাপান সরকার নিয়ন্ত্রিত দোমেই নিউজ এজেন্সী।'

'সেটা ঠিক।' পিল্লাই হাসলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ভুলে যাবেন না, জাপান এই নিদারুণ সংবাদটা মিত্রশক্তির সৈন্য-বাহিনীর জাপানের মূল ভূ-খণ্ডে অবতরনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে প্রচার করেছে। অথচ বলছে, তিনি নাকি পাঁচ দিন আগেই মারা গিয়েছিলেন।'

'তা বটে।' মিষ্টার রাইট শ্রীপিল্লাইকে সমর্থন জানালেন, 'ব্যাপারটা সত্যি গোলমেলে।'

হঠাৎ মিষ্টার রাইটের মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি সরাসরি এক মোক্ষম প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এটাও তো ঠিক, মিষ্টার বোস এখনও মারা যান নি তেমন কোন নির্দিষ্ট প্রমাণও তো আমরা পাইনি। তা হলে ঐ দুর্ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করার কি যুক্তি আছে?'

'আছে মিষ্টার, আছে। সব খবর পাবেন, একটু ধৈর্য ধরুন।'

কথাগুলো বলে শ্রীপিল্লাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এদিকে মিষ্টার রাইট একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।

মিঃ পিল্লাইয়ের কথা শুনে যেমন মিঃ ডিউক রাইট বোবা হয়ে গিয়েছিলেন, আমরাও শশীর নিজস্ব বিশেষ বাচনীক ষ্টাইলে এই রোমহর্ষক গবেষণার কথা শুনতে শুনতে সম্পূর্ণ বাক-রহিত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে, এ যেন কোন বাস্তব ঘটনার বর্ণনা শুনছি না, স্বয়ং জেমস হেডলি চেজের মুখ থেকে তাঁর সর্বশেষ রহস্য উপন্যাসের সিনেরিও ভার্সান শুনছি।

শশী সম্ভবতঃ আমাদের বিস্ময় ও উৎকণ্ঠাকে বুঝে ফেলেছে। তাই বেশ মাতব্বরের ভঙ্গীতে বলল, 'ওহে বৎস, ধৈর্য ধর ক্ষণকাল।'

'ধৈর্য যে আর ধরছে না ব্রাদার।'

ডঃ ভারমা তার অদম্য কৌতুহলকে আর চেপে রাখতে পারলেন না। আসল কথাটা বলেই ফেললেন।

'ধৈর্য থাকবে কি করে,' আমি বললাম, 'তুমি যেমন হিচককের টেকনিকে কাহিনী বলে যাচ্ছ, তাতে তো বই শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রাখা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার থেকেও কঠিন কাজ।'

'তাহলেই বোঝ।'

শশী আবার বিজ্ঞের মত হাসল।

'অল রাইট, ক্যারী অন।'

ডঃ ভারমা অগ্রগমনের সিগন্যাল দিলেন।

শশী ডঃ ভারমার নির্দেশ পালন করে শুরু করল, 'হ্যা', যা বলছিলাম। মিষ্টার রাইট হা করে তাকিয়ে রয়েছেন শ্রীপিল্লাইয়ের মুখের দিকে।

শ্রীপিল্লাই বললেন, 'দোমেই নিউজ এজেন্সীর দেওয়া সংবাদে নিশ্চয় দেখেছেন যে ঐ একই বিমানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কিমুরাও-ও যাচ্ছিলেন?

মিষ্টার রাইট শ্রীপিল্লাইয়ের কথাটা সমর্থন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীপিল্লাই বললেন, 'এবং তিনি দুর্ঘটনার ফলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।'

রাইট জবাব দিলেন, 'প্রচারিত খবরে অবশ্য সে রকমই বলা হয়েছে

'কিন্তু,' বহুদিনের ঝানু ব্যারিষ্টার শ্রীপিল্লাই তার যুক্তির জালে সবদি- টকে নিয়ে এবার মোক্ষম একটা টান মেরে মাছকে ডাঙ্গায় তুলে [illegible]লেন। বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন 'আই এ্যম সরি মিষ্টার রাইট, একর্ডিং টু বৃটিশ মিলিটারী অথরিটি মিষ্টার কিমুরাও

ওয়াজ প্রেজেন্ট এ্যাট সিঙ্গাপুর অন টোয়েন্টিয়েথ আগষ্ট, নাইনটিন হাণ্ড্রেড এণ্ড ফর্টি ফাইভ।'

'সে কি!'

আমাদের তিনজনের মুখ থেকে একই সঙ্গে বিস্ময় বেরিয়ে এল।

শশী গভীর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল, 'ইয়েস ব্রাদারস্।'

আমি জানতে চাইলাম, 'তারপর?'

'তারপর? বলছি, একটু দম নিতে দাও।'

শশী পরবর্তী অধ্যায় শুরুর জন্য সময় চাইল।

এই অবকাশে ড. ভাবনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চায়ের অর্ডার দেব?'

শশী বলল, 'এটাও আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? আপনি হাসালেন ভাই সাব।'

শশীর কথায় ডঃ ভারমা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিলেন।

শশী বলতে শুরু করল, 'এরপর আমি আপনাদের সামনে যে প্রমানটা রাখব সেটা আরো সাংঘাতিক। এটা একটা গোয়েন্দা রিপোর্ট। সরকারের গোপন সদর দপ্তরের প্রধান ফাইল নাম্বার দশ; বিষয়ঃ সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত মৃত্যু সংক্রান্ত পাঁচই অক্টোবরে লেখা রেফারেন্স নাম্বার বি টু। এই গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এ ব্যাপারে বেশ নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে যে, উনিশ শ' চুয়াল্লিস সাল থেকেই সুভাষ বসু তাঁর মাঞ্চুরিয়ায় যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য জাপানীদের কাছে অনুরোধ করছিলেন। তিনি তাদের এ কথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে, যখন বর্মা থেকে ভারত অভিযান সম্ভব নয়, তখন তিনি মস্কো থেকে দিল্লী অভি[illegible]ানের জন্য পরিকল্পনা করবেন। মিষ্টার বোস সায়গনে [illegible] হবার অব্যবহিত পরে [illegible]হিকারী কিকান প্রেরিত তারবার্তা আ[illegible]র এই

অনুমানকে জোরদার করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিষ্টার ইসোদাও তখন সায়গনে ছিলেন।

এ সমস্ত ঘটনা অনুধাবন করলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মিষ্টার বোস ও হিকারী কিকান কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে এক বিরাট পরিকল্পনা করেছিল মিষ্টার বোসের আত্মগোপনকে নিরাপদ করার জন্য। এবং তারা এ-ও ঠিক করে যে, মিষ্টার বোস নিরাপদ স্থানে পৌঁছুবার পর তাঁর এক কল্পিত মৃত্যু কাহিনী প্রচার করা হবে।'

এ খবর আমাদের সবার কাছেই নতুন—তাই সবার চোখে মুখেই বিস্ময়ের ছাপ।

শশী বলল, 'আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন, হিকারী কিকান যে রহস্যময় তারবার্তাটা পাঠিয়েছিল সেটা কি?'

কথা বলতে বলতেই ও ওর নোট বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টে গেল। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে বলল, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। এই বিশেষ গোপন তারবার্তাটা হিকারী কিকানকে পাঠান হয়েছিল চীফ অব্ স্টাফ, সাউদার্ণ আর্মি, সিগনাল সিক্সটি সিক্স-এর তরফ থেকে বিশে আগষ্ট, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে। তারবার্তায় বলা হয়েছিল, রাজধানীতে যাওয়ার পথে আঠায়ই আগষ্ট বেলা দুটোর সময় 'টি' তাইহকুতে তাঁরই বিমান দুর্ঘটনার ফলে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং ঐ দিনই মাঝরাতে মারা গিয়েছেন। ফরমোসা সেনাবাহিনী তাঁর মরদেহ বিমানে টোকিও পাঠিয়েছেন।

কিছু বুঝলেন?'

শশী ডঃ ভারমাকে প্রশ্ন করল।

'ব্যাপারটা তো ঠিক স্পষ্ট হল না।'

ডঃ ভারমা অকপটে তার না বোঝার দৈন্যতা প্রকাশ করলেন।

'সব রহস্যটাই তো ঐখানে।' শশী বলল, 'ঐ টেলিগ্রামে 'টি' শব্দটা ব্যবহার হয়েছে 'চন্দ্র বোস' নামের পরিবর্তে। জানান হয়েছে, তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত নেতাজীর শবদেহ বিমানে টোকিওতে

পাঠান হয়েছে। অথচ দোমেই নিউজ এজেন্সীর রিপোর্টে বলা হল, জাপানের হাসপাতালে নেতাজী মারা গেছেন। সবশেষে জানা যায়, নেতাজীর দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া থেকে মরদেহ দাহ পর্যন্ত সব কিছুই তাইহকুতে সংঘটিত হয়েছিল। এবার বলুন কার কথা বিশ্বাস করব?'

'সত্যি, ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে তো।'

ডঃ ভারমা অবশেষে শশীর যুক্তিকেই মেনে নিলেন।

'আরো আছে ডক্টর ভারমা, এতো সবে কলির সন্ধ্যে।'

'ঠিক আছে, তুমি বল, আমার কাছে বিষয়টা খুব ইনটারেষ্টিং লাগছে।'

'আগেই আপনাদের বলেছি, পঁচিশে আগষ্ট নেতাজীকে সায়গনে দেখা গেছে বলে একজন আমেরিকান সাংবাদিক জানিয়েছিলেন। এবার আর একজনের কথা বলছি যিনি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, আঠারই আগষ্টের পরে সায়গনে তার সঙ্গে নেতাজীর দেখা হয়েছে।

ভদ্রলোকের নাম শ্রীরমণীও গোঁসাই।

দশই অক্টোবর শ্রী গোঁসাই এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, শ্রীআয়ার এবং শ্রী চ্যাটার্জী সায়গন থেকে চলে যাওয়ার দু'দিন পরে নেতাজী দু'জন জাপানী অফিসারের সঙ্গে বাংলোতে এসে তাদের খোঁজ করেছিলেন।

শুধু শ্রী গোঁসাই-ই নন, আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল রেজভিও বলেছেন যে, উনিশ শ' পয়তাল্লিশের উনিশে আগষ্ট তিনি নেতাজীর সঙ্গে একই দ্বীপে ছিলেন।

'তুমি যে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ হে ছোকরা।'

ডঃ ভারমা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে মন্তব্য করলেন।

শশী রাকেশের দিকে ফিরে বলল, 'রাকেশ, আপনা ক্যামেরা লেকর তৈয়ার রহো, ভাইসাবকা শির ঘুম জানে কা সাথ সাথ হি তসবির খেচনা।'

রাকেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'ফিকর মাত কর ইয়ার, ম্যায় তৈয়ার হু।'

ওদের কথায় আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

শশী আবার শুরু করল, 'এবার যে রিপোর্টটার কথা বলব, সেটা বের হয়েছিল উনিশ শ' পয়তাল্লিশ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে; আমেরিকার 'চিকাগো ট্রিবিউন' পত্রিকায়।

রিপোর্টটায় বলা হয়েছিল, ঐ পত্রিকার পূর্ব এশিয়াস্থ সংবাদদাতা ও মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসার মিষ্টার আলফ্রেড ওয়াগনার মিষ্টার সুভাষ বোস সম্পর্কে অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠিয়েছেন:

'আনামি সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার আলাপ হয়। তার কাছ থেকে অনুসন্ধান করে মিষ্টার বোস সম্পর্কে আমি জানতে পারি, গত অক্টোবর মাসে জনৈক চীনা সেনাপতির অতিথি হিসেবে তিনি দক্ষিণ চীনে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি হ্যানয়ে মিষ্টার হো চি মিনের আনামি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মিত্রশক্তির কাছে জাপানের পুরোপুরি আত্মসমর্পণের মাত্র চারদিন আগে মিষ্টার বোসকে সায়গনে দেখা গেছে। সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ডক্টর আহমেদ সোয়েকর্ণ ও অন্যান্য কয়েকজন প্রথম সারির ইন্দোনেশীয় নেতা তখন সায়গনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এ খবর জানার পর আমি আমার পরিচিত আনামি কর্মচারী-টিকে আমাকে মিষ্টার বোসের কাছে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু তিনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান। তবে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের প্রতি মিষ্টার বোসের শেষ নির্দেশনামার একটি কপি তিনি আমাকে দেন। এই নির্দেশনামায় মিষ্টার বোস তাঁর সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের

প্রথম অধ্যায় মাত্র, ভবিষ্যতে আমাদের আরো অনেক পর্য্যায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।'

এ ধরনের ঘোষণার অর্থ কি? এর থেকে কি এই অনুমানই দৃঢ় হয় না যে, মিষ্টার বোস বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন নি।'

রিপোর্ট টা পড়া শেষ হলে ডঃ ভারমা শশীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেষের যে প্যারাগ্রাফটা পড়লে ওটা কি তোমার বক্তব্য, না আলফ্রেড ওয়াগনারের?'

শশী বলল, 'আমার নয়, ওয়াগনারের।'

ডঃ ভারমা বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমার।'

শশী আত্মতৃপ্তির সুরে বলল, 'বলতে পারেন ওয়াগনার আমার বক্তব্য সমর্থন করেছেন আর কি।'

'না,' ডঃ ভারমা বললেন, 'আসলে তুমিই ওয়াগনারের বক্তব্য সমর্থন করছ।'

ডঃ ভারমার কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

ডঃ ভারমা আমাদের সমর্থন আদায়ের জন্য বললেন, 'হ্যালো ইয়ং ম্যান, অ্যাম আই কারেক্ট?'

'ওহ শ্যুয়র।'

আমি এবং রাকেশ দুজনেই একবাক্যে ডঃ ভারমাকে সমর্থন জানালাম।

শশী বলল, 'ঠিক আছে, আমার বন্ধুরাই যখন আপনাকে নিঃশর্ত সমর্থন জানাচ্ছে তখন আমার পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি হার স্বীকার করলাম।'

'ইট ইজ গ্রাণ্টেড্।'

ডঃ ভারমা হাত তুলে সম্মতি জানালেন।

'বন্ধুগণ,' শশী বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'এবার আমি আপনাদের যে কাহিনী শোনাব তা শুধু রোমাঞ্চকরই নয়, বিস্ময়করও বটে।'

ডঃ ভারমার গলা থেকে একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল, 'কি ?'

শশী হেডমাষ্টারের ভঙ্গীতে বলল, 'অধৈর্য হবেন না, মনযোগ দিয়ে শুনুন।

শ্রী পি. সি. কর তখন বাংলাদেশের গভর্ণর স্যার আর. জি. কেসির গভর্ণর হাউসের রেডিও মনিটর। বেতারে সংবাদ শোনা এবং সেই সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নোট করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়াই ছিল তার একমাত্র কাজ।

সেটা উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের উনিশে ডিসেম্বর। অন্যান্য দিনের মতই হেড ফোন কানে দিয়ে সকাল থেকে বসে আছেন শ্রী কর তার নির্দ্দিষ্ট আসনে। হঠাৎ কানে এল, 'দিস ইজ রেডিও মাঞ্চুরিয়া।'

তারপর ভেসে এল সেই চির পরিচিত কণ্ঠস্বর : 'সুভাষ বোস স্পীকিং...'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এতদিনের অভিজ্ঞ রেডিও মনিটর। উত্তেজনায় তার হাত-পা, সারাটা দেহ থর থর করে কাঁপছিল ; তবুও তিনি প্রবল শক্তিতে নিজেকে সংযত রেখে হারিয়ে যাওয়া মহানায়কের আহ্বান শুনে গেলেন :

'উই আর আণ্ডার দ্যা সেন্টার অব ওয়ান অব দ্যা গ্রেট পাওয়ারস অব দ্য ওয়ার্লড। উই শুড নট বী ডিসঅ্যাপয়েণ্টেড্। দ্যা ফার্ষ্ট রাউণ্ড অব দ্যা ব্যাটল ইজ এ ফেলিঅর্। দ্যা ব্যাটল অব ফ্রিডম ইজ নট ইজি। অ্যামেরিকা ওয়ান হার ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্ আফটার সেভেন ইয়ারস্ ফাইটিং। আয়ারল্যাণ্ড ওয়ান হার ফ্রিডম আফটার ফোর ইয়ারস্ ফাইটিং। উই আর শ্যুয়র টু বী সাকসেসফুল উইদিন টু ইয়ারস।

আই উইল গো টু ইণ্ডিয়া অন দ্যা ক্রেষ্ট অব এ থার্ড ওয়ার্লড ওয়র, অ্যাণ্ড্ সিট ইন জাজমেণ্ট আপন দোজ হু আর ট্রাইয়িং মাই অফিসারস্ অ্যাণ্ড্ মাই মেন অ্যাট রেড ফোর্ট।'

একবার নয়, দু'বার নয়, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীতে মোট তিন বার নেতাজীর বক্তৃতা কলকাতার শোনা গিয়েছিল।

এই বক্তৃতা যে একমাত্র শ্রী করই শুনেছিলেন, তা নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আরো অনেকের কানেই সেই স্বর পৌঁছে ছিল। এই তথ্য প্রথম সমর্থিত হল মালয় থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সেবিকা'য়। ঐ পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হল আঠাশে মার্চের সংখ্যায়। সেই সংবাদে বলা হল, সুভাষ বসুর রেডিও মাঞ্চুরিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা লণ্ডনেও অনেকে শুনেছেন।'

এমন খবর আমাদের কারোই জানা ছিলনা। তাই খবরটা শুনে সবাই প্রথমে অবাক দৃষ্টিতে শশীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ডঃ ভারমা প্রথম মৌনতা ভেঙ্গে বললেন, 'আমি তো এর কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ব্রাদার।'

ডঃ ভারমার গলার স্বরে আক্ষেপের সুরটা বেশ স্পষ্ট প্রতিফলিত হল।

শশী গম্ভীর ভাবে বলল, 'বললাম না, চুপচাপ শুধু শুনে যান এত সহজে ঘাবড়ে যাবেন না। এতো সবে কলির সন্ধ্যে।'

'না, না, আমি ঘাবড়াইনি, মোটেই ঘাবড়াইনি—তুমি বল।'

ডঃ ভারমা নিজের অপ্রস্তুতিটাকে ঢেকে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন।

শশী একটু মুচকি হেসে বলতে শুরু করল, 'ছেচল্লিশের চৌদ্দই মার্চ মহাত্মা গান্ধী বললেন, 'তুম হামকো যো কহ ন্যায় ইয়ে বিশওয়াস নেহি করতা হু কি সুভায মর চুকা। মেরা দিল কহে রাহা, সুভাষ আবভি তক্ জিন্দা হায়।'

এই গান্ধীজীই বেয়াল্লিশের আঠাশে মার্চ রয়টার প্রচারিত নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর মা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীকে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার বীর

সন্তানের মৃত্যুতে সমস্ত জাতি আজ আপনারই ন্যায় শোকাতুর। আপনার এই গভীর দুঃখে আমার পূর্ণ সমবেদনা জানাচ্ছি। ভগবান আপনাকে এই অপূরণীয় ক্ষতির বেদনা সহ্য করার শক্তি দিন।' কিন্তু তিনিই এবার নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ জেনেও তাঁর পরিবারের কারো কাছে শোকবার্তা পাঠালেন না। বরং বললেন, 'সুভাষ মর নহী সকতা, তুসবা কিসিকা লাস জলা দিয়া হোগা।'

গান্ধীজীর এই ঘোষণায় ব্রিটিশ রাজের মনের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল।

তারা সুভাষ বসুকে খুঁজে বের করার জন্য দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলতে লাগল।

এটা যে কারো কষ্টকল্পিত অনুমান মোটেট তা ভাববেন না। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বেশ জোরাল প্রমাণ রয়েছে। আর সে প্রমাণ হল, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধান রিপোর্ট।

অনুসন্ধান বিভাগের গোপন সদর দপ্তরের প্রধান ফাইল নাম্বার দশ-এর দু'শ তিয়াত্তর ক্রমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে:

'গান্ধী প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন সুভাষ বসু জীবিত এবং সম্ভবতঃ কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। অবশ্য গান্ধী এও বলেছেন যে, এ সংবাদের মূল উৎস বাইরে নয়, তাঁর অন্তরের নির্দেশেই তিনি এ কথা বলছেন। কিন্তু কংগ্রেসীরা মনে করে, গান্ধীর অন্তরের নির্দেশ বস্তুতঃ কোন গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করেই। একটি গোপন সূত্রের রিপোর্টে জানা গেছে, নেহরু বোসের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন; তাতে নাকি বলা হয়েছে যে, তিনি রাশিয়াতে আছেন। বোস নাকি গোপনে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। ঐ সংবাদসূত্র এ কথাও জানিয়েছে যে, এ গোপন সংবাদ যে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি জানেন তাঁদের মধ্যে গান্ধী এবং শরৎ বোসও আছেন। মনে হয়, এই পত্রটি যে সময়ে আসে ঠিক তার পরেই

গান্ধী প্রকাশ্যে তাঁর অন্তরের নির্দেশের কথা বলেন। ঐ সময়ই শোনা যায় শরৎ বোস বলেছিলেন, তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁর ভ্রাতা জীবিত আছেন। আর একটি খবর পাওয়া যাচ্ছে সীমান্ত প্রদেশ ছাত্র-কংগ্রেসের সভাপতির একটি পত্রে। এই পত্রে পত্রলেখক জানিয়েছেন, বোস তুর্কিস্তানের কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং পত্রলেখক তাঁর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। ভারতের ভিতরে এবং বাইরে আমরা যে সব গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি তার সবই বিভ্রান্তিকর। সাতই জানুয়ারী রাশিয়ার সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা' তীব্র ভাষায় বলেছে যে, বোস রাশিয়ায় আছে বলে যে সংবাদ রটেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তার আগে একজন খিলজাই মালাভ জীবিত বোসের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে কিছু প্রচাব চালিয়েছিল এবং একটা রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, আফ্‌গানিস্তানেব খোস্ত প্রদেশের গভর্ণরকে গত ডিসেম্বর মাসে কাবুলস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত গোপনে জানিয়েছিলেন যে, অনেক কংগ্রেসী নেতা মস্কোতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং তার মধ্যে বোসও আছেন। এই সব লোকের পক্ষে বোসেব সম্পর্কে মিথ্যে গল্প প্রচার করার কোন উদ্দেশ্য নেই। অপর পক্ষে তেহরান থেকে প্রাপ্ত একটা গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে দেখছি যে, রুশ অফিসাররা স্বীকার করছেন, বোস মস্কোতেই আত্মগোপন করে আছেন। এই গোপন রিপোর্টটিতে আরোও বলা হয়েছে, রুশ ভাইস কন্সাল জেনারেল মোরাদক গত মার্চ মাসে বলেছিলেন, বোস রাশিয়াতেই আছেন—সেখানে তিনি আই. এন. এর মত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে রাশিয়ানদের নিয়ে একটা গোপন দল গঠন করছেন। তাইহকু, কংগ্রেস এবং কাবুল ও তেহ্‌রানস্থিত রুশ প্রতিনিধিদের উপরই আমাদের তীব্র নজর রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে, ঐ তিনটি সূত্রের মধ্যেই এ বিষয়ের মূলসত্য লুকিয়ে রয়েছে।'

এতটা বলবার পর শশী একটু যেন দম নিয়ে নিল। তারপর বলল, 'এই সূত্রে আর একটা প্রাসঙ্গিক খবর বলি।

ছেচল্লিশের তেশরা এপ্রিল বাংলাদেশের নেত্রকোনায় এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন সুলতান। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, নেতাজী এখন রাশিয়ায় রয়েছেন। তিনি যথাযথ সুযোগের অপেক্ষায় আছেন; সুযোগ পেলে জনতাকে মুক্ত করবার জন্য তিনি স্বসৈন্যে উপস্থিত হবেন।

এই জনসভার বিবরণ পরদিন কলকাতার সব কটা প্রথম শ্রেণীর দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। একটা কথা ভুলে যাবেন না, সেটা ছিল বৃটিশ রাজত্ব। সে সময় নেতাজী স্বসৈন্যে ভারত আক্রমণ করে এখানে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে আসছেন বলাটা একটা মামুলী ব্যাপার ছিলনা। এটা ছিল সোজাসুজি দেশদ্রোহিতা। কিন্তু ক্যাপ্টেন সুলতানের ভাষণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি। বরং তাদের রিপোর্টে নেতা[illegible] রাশিয়ায় অবস্থানের গোপন সংবাদটাকেই বিশেষ গুরুত্ব[illegible]ক গ্রহণ করা হয়েছিল।'

শশীর কথা শেষ হওয়ার আগেই ডঃ ভারমা বললেন, 'খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, তুমি এত খবর যোগাড় করলে কি ভাবে।'

শশী স্কুল মাষ্টারের ভঙ্গীতে ডঃ ভারমাকে শাসনের সুরে বলল, 'বললাম না ডক্টর ভারমা, ধৈর্য ধরুন—চুপ চাপ শুনে যান।'

ডঃ ভারমা বললেন, 'শুনে তো যাচ্ছি, কিন্তু ধৈর্য ধরে চুপ চাপ বসে থাকাটা তো সম্ভব হচ্ছে না ব্রাদার।'

'সম্ভব হচ্ছে না বললে তো আর হবে না,' শশী বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল, 'এত অল্পে ধৈর্যহারা হলে যে শুরুতেই সব মাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

স্বগতোক্তির মত কথাটা বলে ডঃ ভারমা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুটটায় মোক্ষম টান দিতে শুরু করলেন।

শর্মা তার বক্তব্য শুরু করার আগে গলাটাকে পরিষ্কার করবার জন্য একটু কেসে বেশ নড়ে চড়ে বসল। তারপর হাতের ডায়রীটা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'এবার আমি ছেচল্লিশের সাতাশে এপ্রিল এসোসিয়েটেড প্রেসের পাঠান একটা সংবাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংবাদদাতা একদিন জানালেন, 'মিষ্টার সুভাষচন্দ্র বোস যে এখনও জীবিত রয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা ফেরা করছেন বিশ্বস্তসূত্রে এমন সংবাদ পাওয়া গেছে। চীন, ইন্দোচীন ও মালয়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁকে দেখেছেন বলে দাবি করছেন। ইন্দোনেশিয়া থেকে খবর পাওয়া গেছে. কয়েকদিন আগে তিনি একটি রুশ সাবমেরিনে করে ইন্দোনেশিরায় আসেন এবং সেখানকার বিদ্রোহী ''দর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলাচনা করেন।'

এব খবর প্রকাশিত হওয়ার পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে সম্পা ইয়াডের এক শ' জন বাছাই করা গোয়েন্দাকে দূরপ্রাচ্যে তের হয়। যদিও সঙ্গে সঙ্গে সে খবর বাইরে প্রকাশিত হয়নি, তবে কয়েক মাস পরে অক্টোবরে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়। সে খবর কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর বেশ কিছুদিন চুপচাপ। সবাই ভাবল বোধ হয় ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু না, কিছুদিন পরে আবার নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পেতে থাকল।

মানুষের মনের সুপ্ত বাসনাকে বেশ কিছুদিন বিশ্রামের পরে খুব একটা জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের প্রাক্তন মেজর শাহনওয়াজ খান।'

একান্ন সালের তেইশে জানুয়ারী কলকাতায় লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল সমাবেশে তুমুল বন্দেমাতারম, জয়হিন্দ এবং নেতাজী জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন করতে উঠে মেজর শাহনবাজ বললেন, 'আমি আশা করি আগামী বছর আমরা যখন নেতাজীর ছাপান্নতম জন্মদিবস পালন করব তখন নেতাজী আমাদের মধ্যে স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন।'

শাহনওয়াজের কথায় দেশবাসী চমকে উঠল। সবার মুখে এক জিজ্ঞাসা, তা হলে নেতাজী আজো জীবিত আছেন! অথচ এতকাল বলা হয়েছে তিনি মৃত।

চারদিকে তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। সবার মুখে এক দাবি, এ ব্যাপারে সরকারকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

শাহনওয়াজের ঘোষণার কিছুদিন পরে আরো কিছু নতুন তথ্য জানা গেল।

আঠাশে মে'র অমৃতবাজার পত্রিকায় নিজস্ব সাংবাদিকের রিপোর্টে বলা হল, পরলোকগত শ্রীভুলাভাই দেশাই একবার যখন কর্ণেল হবিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সুভাষ কি সত্যই মৃত ?' তখন কর্ণেল রহমান বলেছিলেন, 'আমি সৈনিক, আমাকে আদেশ মেনে চলতে হয়।'

এতে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। সকলের মনে একই প্রশ্ন দেখা দিল, তা হলে কর্ণেল রহমান কি নেতাজীর নির্দেশেই অধস্তন সৈনিক হিবেবে এই মৃত্যুর কথা রটনা করেছেন ?'

'কারেক্ট, আমি হলে আমার মনেও এই একই সন্দেহ দেখা দিত

ডঃ ভারমা আগ বাড়িয়ে শশীর অনুমানকে সমর্থন করলেন

'এখানেই শেষ নয় ডক্টর ভারমা, আরো আছে।'

নোটবুকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে শশী বলল।

ডঃ ভারমা আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেশ, বল।'

শশী তার তথ্যের ঝুলি থেকে এবার এক নতুন তথ্যের বেড়াল বের করল। বলল, 'আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ঈমন ডি, ভ্যালেরা যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিললেন তখন ফরোয়ার্ড ব্লকের জনৈক নেতা তাঁকে নেতাজী সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে প্রেসিডেণ্ট ভ্যালেরা বলেছিলেন, 'আই এক্সপেকটেড টু মিট হিম ইন ইণ্ডিয়া।'

কি আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, এক বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও নেতাজীর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করেন নি। এমন কি নেতাজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে তাঁর দেখা হবে, মনে মনে এমন আশাও তিনি করেছিলেন!

দুর্ভাগ্য, ভ্যালেরার সঙ্গে নেতাজীর দেখা হল না। কিন্তু তার জন্য তাঁর বিশ্বাস কি পাল্টে গিয়েছিল? বোধ হয় না।

যাই হোক,' শশী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এবার আমি আপনাদের সামনে আর একটা তথ্য পরিবেশন করছি।

প্রখ্যাত সাংবাদিক মিষ্টার ইলিয়ট এরিকসন চুয়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার ন্যাশনাল রিপাবলিক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখলেন, 'সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে এ কথাই বলতে হয় যে, বোসের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই অধিক। যুদ্ধের শেষে, জাপান যখন ব্রহ্মদেশ সীমান্তে প্রায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে, তখন বোস যদি দেখা দিতেন তাহলে তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিতে হত। বার্মা থেকে বিমানে অন্যত্র যাওয়ার পথেই নাকি তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তথাকথিত দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরও বহু ব্যক্তি তাঁকে দেখেছেন বলে বিবৃত করেছেন; এমন কি একটা ফিল্ড হাসপাতালের জনৈকা নার্সও তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর সামান্য

আঘাতের চিকিৎসা করেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় নি, এবং তিনি যে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তেমন কোন তথ্যপ্রমাণও মিত্রশক্তির গোয়েন্দা বাহিনী খুঁজে পায়নি। শোনা যায় যে, কালক্ষেপ না করে অন্য একটি বিমানে তিনি কমিউনিষ্ট চীনের রাজধানী ইয়েনানের পথে রওনা হয়ে যান।

ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীনতা পায়নি, তাই বোস বৃটেনের কোন শত্রু রাষ্ট্রের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন, যে রাষ্ট্র আরও একটি যুদ্ধের সূচনা করতে পারবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে।'

আপনাদের কৌতুহল নিরশনের জন্য বলি, এরিকসনের ঐ প্রবন্ধের নামটা ছিল বেশ মজাদার: 'জওহরলাল নেহরু এ্যণ্ড দি রেড থ্রেড টু ইণ্ডিয়া।' তারপর হঠাৎ ডঃ ভারমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি আমার কথাটা এবার বিশ্বাস হচ্ছে?'

'এসব শোনার পর তো অবিশ্বাস করার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

ডঃ ভারমা অকপটে তার অপারগতা স্বীকার করলেন।

আমি জানতে চাইলাম, 'তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি?'

'মোটেই না।'

শশী উত্তর দিল।

'তা হলে থামলে কেন, বল।'

'বুঝতে পারছি, শেষ কথাটা জানবার জন্য তোমরা খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছ।'

'ঠিক তা নয়,' আমি বললাম, 'তোমার সংগৃহীত তথ্যগুলো শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগছে।'

রাকেশ বলল, 'তা ছাড়া তোমার বর্ণনার ভঙ্গীটা সত্যি তারিফ করার মত।'

'অথচ এতকাল তোমরা আমাকে পাত্তাই দাও নি।'

শশী কথাটা আক্ষেপের সুরে বললেও তার মধ্যে ওর আত্মতৃপ্তির স্বরটা বেশ স্পষ্ট কানে বাজল।

রাকেশ ওর অভিযোগের উত্তরে বলল, 'তার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছি।'

শশী বুদ্ধদেবের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল, 'তথাস্তু, তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা গৃহীত হল।'

আমি বললাম, 'তা হলে এবার তোমার রথচক্র চালনা কর প্রভু।'

'করছি।'

শশী ওর নোট বইয়ের পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই বলল, 'একটা পূর্বকথা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি। সেটা আগে বলে নেই। একান্ন সালের পয়লা মে কলকাতার হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার জয়েন্ট এডিটর অশ্বিনীকুমার গুপ্ত সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, কিছুদিন আগে তিনি যখন আসামের পার্বত্য অঞ্চল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে তার সঙ্গে নাগা নেতা ফিজোর দেখা হয়। ফিজো নাকি তখন শ্রী গুপ্তকে বলেছিলেন যে, উনিশ শ' পয়তাল্লিশের আঠারই আগষ্টের আগেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে কোন মুহূর্তে জাপান সরকার নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করতে পারে, তখন যেন তিনি সে সংবাদ বিশ্বাস না করেন।

শ্রী গুপ্ত ঐ বিবরণে আরো বলেছিলেন, তিনি যখন মিশমি পাহাড় এলাকায় ঘুরছিলেন, তখন কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী মিশমি সর্দারের সঙ্গে তার আলাপ হয়। এই সর্দাররা তাকে জানায় যে, বেশ কিছুদিন আগে তাদের কয়েকজনকে চীনা অফিসাররা সীমান্তের ওপারে একজন ভারতীয়ের কাছে নিয়ে যায়। সেই ভারতীয়ের চেহারার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চেহারার যথেষ্ট মিল আছে।

এর পরের বছর আর একটা ঘটনা ঘটে।

আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় পিকিং মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনরত মঙ্গোলিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটা ছবি ছাপা হয়। এই ছবির নীচে যে ক্যাপসন দেওয়া ছিল তাতে দলের নেতা কে, কিংবা ছবিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম কি, কিছুই বলা হয়নি। তবে ঐ ছবির প্রথম সারির বাঁদিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তিকে যে হুবহু নেতাজীর মত দেখতে এ সম্বন্ধে কারো মনেই কোন সন্দেহ নেই।

এর কয়েকদিন পর ঐ পত্রিকাতেই আর একখানা ছবি ছাপা হয়। ছবির নীচে লেখা ছিল, 'সামান্ত সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে ইয়েনান পিপলস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে উত্তর বার্মার সীমান্তবর্তী আইউয়েঙ্গে সহর পরিদর্শনরত চীনা সরকারী প্রতিনিধি দল।' এই ছবিতেও দলের কোন সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু ছবির একেবারে বাঁদিকে টুপী হাতে স্যুট পরিহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে নেতাজীর চেহারার মিল সন্দেহাতীত।

এই ছবি দুটোর বেলায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সাধারণতঃ কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকাই, অন্য কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত কোন ছবি বিশেষ কারণ ছাড়া পুনর্মুদ্রিত করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ ছবি দুটো বিশ্ববিখ্যাত 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত হবার পর আর একটি বিশ্বখ্যাত পত্রিকা লণ্ডনের 'ডেইলি মেল'-এ পুনর্মুদ্রিত হয়।

ভারতীয় লোকসভার সদস্য শ্রীবাজপেয়ী শ্রীনেহরুকে ঐ ছবি দুটো দেখিয়ে এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। শ্রীনেহরু জবাবে বলেছিলেন, 'দেয়ার ইজ ষ্ট্রং রিসেমব্লেন্স উইথ সুভাষ, বাট দ্যাটস নট অল।'

ডঃ ভারমা শশীর পরিশ্রমের তারিফ না করে পারেন না। বলেন, 'সত্যি, তোমার অধ্যবসায় আছে শশী।'

'দাঁড়ান,' ডঃ ভারমার কথা সম্পূর্ণ শেষ না হতেই শশী বলে, 'আরো একটা ছবি আছে, সেটার কথা তো এখনও বলাই হয়নি।'

ডঃ ভারমা বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ঠিক আছে, বল।'

'ছবিটা তোলা হয় উনপঞ্চাশ সালে, পিকিং-এ।' শশী বলে, 'আমেরিকার এক বিখ্যাত সামরিকপত্রে প্রকাশিত এই ছবির ক্যাপসনে বলা হয়, 'চীনা মুক্তি ফৌজের কয়েকজন সেনাপতি।'

এ ছবিতে মোট তের ব্যক্তি রয়েছেন। এদের মধ্যে বাম দিক থেকে ষষ্ঠ ব্যক্তির মুখের সঙ্গে নেতাজীর মুখের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হল, ঐ তেরজন সেনাপতির মধ্যে একমাত্র ঐ বিশেষ সেনাপতিটির চোখেই কালো চশমা রয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য সেনাপতির মুখের আদল চীনাদের মত কিন্তু কালো চশমা পরিহিত সেনাপতির মুখের গড়নে চীনাদের সঙ্গে কোন মিল নেই।'

কথাগুলো বলতে বলতেই শশী ওর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ময়লা কাগজ খুঁজে বের করল। সেটার ভাজ খুলতে খুলতে বলল 'এতক্ষণ আপনারা ছবির বর্ণনা শুনলেন, এবার একটা গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা বলি।' শশীভূষণ যেন একদল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছে: 'ইতিপূর্বে আমি বৃটিশ এবং আমেরিকান গোয়েন্দা রিপোর্টের উল্লেখ করেছি, এবার যে গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা বলব সেটা জার্মান গোয়েন্দা দপ্তরের।'

রিপোর্টটা যদিও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে লিখিত কিন্তু সর্ব-সাধারণের জন্য প্রথম প্রচারিত হয় উনিশ শ' ছাপ্পান সালে, বার্লিন থেকে।

এই রিপোর্টে সব রকম আন্তর্জাতিক সাক্ষী সবুদ পর্যালোচনা করার পর জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, 'যদিও দোমেই নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হয়েছে যে, সুভাষ বোস বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কিন্তু 'দুঃখের বিষয়

পারিপার্শ্বিক কোন ঘটনাই তাঁর এই মৃত্যুকে প্রমাণ করতে পারেনি। তাছাড়া একমুঠো ছাই কোথাও সংগ্রহ করে রাখলেই তা দিয়ে কারো মৃত্যু প্রমাণিত হয়ে যায় না।'

কথাগুলো শেষ করে শশীভূষণ আমাদের সবাইকে একবার নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর ওর নিজস্ব ষ্টাইলে বলা শুরু করল, 'আপনারা বোধহয় জানেন না, রেঙ্কোজি মন্দিরে রাখা নেতাজীর তথাকথিত চিতাভস্ম দু'জন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তর যে রিপোর্ট পেয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, ঐ চিতাভস্ম কোন মানুষের নয়, পশুর। সম্ভবতঃ কোন কুকুরের। এ খবর, কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় উনিশ শ' বাষট্টি সালের পনেরই এপ্রিলের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।'

'বল কি!' ডঃ ভারমা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'এ খবর ভারত সরকার জানত না?'

'জানত; সবকিছু জানত।'

শশী অত্যন্ত নির্লিপ্তের মত জবাব দিল।

'জেনেও তারা চুপ করে ছিলেন?'

'না থেকে উপায় কি ছিল বলুন?'

শশী ডঃ ভারমাকে উল্টে প্রশ্ন করল।

'কিন্তু কেন?'

'কারণ,' শশী আবৃত্তির সুরে বলল, 'হি উড হ্যাভ বীন এ ডেঞ্জারাস কমপিটিটর হুম দে হ্যাড লার্ণড টু ফীয়ার ইন দ্যা ইয়ারস বিফোর দ্যা ওয়র, হোয়েন ইনসাইড কংগ্রেস, হি লেড এ রিভোল্ট অ্যাগেনষ্ট গান্ধী এ্যাণ্ড দ্যা আইডিয়াস অব নন ভায়োলেন্স।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলার পর একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, 'কথাটা কিন্তু আমার নয় ডক্টর ভারমা, বিশ্বখ্যাত ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক মিষ্টার কিংসলে মার্টিনের।

আপনি হয়তো বলতে পারেন এটা একজন বিশেষ ব্যক্তির

আশঙ্কা মাত্র। কিন্তু তা যে নয়, তারও একটা প্রমাণ আপনাকে দিই।'

কথা বলতে বলতেই শশী ওর নোট বইয়ের পাতা উল্টে গেল এক জায়গায় থেমে বলতে শুরু করল, 'নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর খবর পাবার কয়েকদিন পর নেহরু এবোটাবাদে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে দিতে এক সময় বলেন, 'সুভাষবাবুর মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছে ঠিক-ই, কিন্তু এটা আমাকে স্বস্তিও দিয়েছে।'

'বল কি?'

ডঃ ভারমার বিস্ময় চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ।'

শশী বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলল, 'খবরটা অনেক পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল—পয়তাল্লিশের সাতাশে আগষ্ট তারিখে।'

'এরপর আর আমার কিছু বলার নেই।'

ডঃ ভারমা ধপ করে তার চেয়ারটায় বসে পড়লেন।

'বলবেন না, শুধু শুনে যান।' শশী ডঃ ভারমাকে আশ্বস্ত করে বলতে শুরু করে, 'এই সময় এক জার্মান ভদ্রলোকের খবর বের হয়। কলকাতার শ্রী এস. এম. গোস্বামী 'নেতাজী মিষ্টি রিভিল্ড' নামে একটা বই প্রকাশ করেন। এই বইয়েই উক্ত সাংবাদটিকে সংকলিত করা হয়। শ্রী গোস্বামী জানান, উনপঞ্চাশ সালে তিনি যখন জার্মানীতে যান তখন তিনি এই খবরটি সংগ্রহ করেন।

জার্মান ভদ্রলোকটির নাম মিষ্টার হের হ্যাভ। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সংবাদ যখন প্রচারিত হয় তখন মিষ্টার হ্যাভ টোকিওতে ছিলেন। খবর শুনে তিনি খুবই আঘাত পান। কিন্তু প্রচারিত মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য না পাওয়ায় ঘটনা সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ঘটনার সত্যতা জানার জন্য তিনি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে ফরমোসাতে যান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনার সময় বিমান বন্দরে উপস্থিত থেকে নেতাজীর

মৃতদেহ দেখেছে এমন একটা লোককেও তিনি সেখানে খুঁজে পান না। এমন কি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীকে আহত হতে দেখেছেন এমন একটা লোকের সঙ্গেও তার দেখা হয়নি। ফলে ফরমোসা থেকে কোন খবর সংগ্রহ করতে না পেরে মিষ্টার হ্যাভ টোকিওতে ফিরে আসেন এবং সেখানে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি সন্তুষ্ট হবার মত কোন খবর পান না। এমন কি সেখানে নেতাজীর মৃত্যু উপলক্ষে একটা শোকসভাও অনুষ্ঠিত হয় নি। তখন তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু আশ্চর্য, পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে তাকে কোন খবর তো দেওয়া হয়ই না বরং একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, যদি তিনি নেতাজীর সত্যিকারের বন্ধু হন তা হলে তিনি যেন এই ধরনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। এরপর ভদ্রলোক দূরপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে তার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী অত্যন্ত সুচতুর রাজনৈতিক রহস্যে ভরা। তিনি ঐ দুর্ঘটনার মোটেই মারা যান নি।'

কথাগুলো একনাগাড়ে বলতে বলতে শশী যে এতটুকু ক্লান্ত হয়েছে সেটা মোটেই বোঝা গেল না। বরং ও নবোৎসাহে বলল, 'এ গেল মিষ্টার হ্যাভ-এর অভিজ্ঞতা। এবার আর একজনের অভিজ্ঞতার কথা বলি।'

তারপর নোটবুকের কয়েকটা পাতা আগের মতই উল্টে গেল। শেষে এক জায়গায় থেমে বলল, 'মিষ্টার হ্যাভের মত তিনি বিদেশী নন, খাঁটি ভারতীয়।

ভদ্রলোকের নাম ডাক্তার এম. এন. দত্ত। উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে নেতাজী ইনকোয়ারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তাইহকুতে একটি বিমানকে পরিকল্পিত পথে কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে সামান্য বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। পরে ঐ বিমানটিকেই অনেকে মেরামত করতে দেখেছিল।

বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজীর মুখ এমনভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয় যে তাঁকে চেনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া কর্ণেল হবিবুর রহমানের হাতের কিছুটা অংশ কার্বলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং ঐ দিনই গভীর রাতে পাইলট, নেভিগেটর, জেনারেল সিডি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান বন্দরে এসে মেরামত করা বিমানে করেই তাঁদের গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার ব্যাপার হল, দুর্ঘটনার ফলে ঐ চারজন ব্যক্তিকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পরদিন সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রচার করা হয় যে, নেতাজী রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং কোন এক মৃত ব্যক্তির দেহকে কাপড় চাপা দিয়ে বা একটি শবাধারকে সযত্নে হাসপাতালের একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়। চারদিন ইতি-মধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এ চারদিনের মধ্যে বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরী করে ফেলা হয়। অবশেষে নেতাজীর নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানর খবর আসে। তখন জাপান সরকার নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী প্রচার করে।

এই ভদ্রলোকের দেওয়া তথ্যের সমর্থনে আমি আর একটা ছোট খবরের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

উনিশ শ' পয়তাল্লিশ সালের আঠাশে আগষ্ট লণ্ডন থেকে বি. বি. সির খবরে বলা হয়েছিল, যে বিমানটি সুভাষ বোসকে নিয়ে তাইহকুতে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে বলে জাপান সরকারে তরফ থেকে বলা হয়েছে সেই বিমানটিকে কয়েকদিন আগে মাঞ্চুরিয়ার আকাশে উড়তে দেখা গেছে।'

শশী বেশ আত্মতৃপ্তির স্বরে বলল, 'এবার মিলিয়ে নিন ডাক্তার এস. এন. দত্তের জবানবন্দীর সঙ্গে বি. বি. সির খবর।'

সত্যি, শশীর অধ্যবসায়ের কোন তুলনা হয় না। কিভাবে ও একটার এর একটা খবর সংগ্রহ করেছে। সেগুলোকে কেউ যাতে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিতে না পারে সেজন্য সংগৃহীত তথ্যের উৎসগুলোও নোটবুকে টুকে রেখেছে। ফলে কারো পক্ষেই আর এখন ওর সঙ্গে তর্ক করে জেতা সম্ভব নয়।

একনাগাড়ে বক্তৃতা দিতে দিতে শশীর গলা ভেজাবার মত একটা কিছু না হলে আর চলছে না। তাই অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে ডঃ ভারমাকে বলল, 'আর এক কাপ চা হবে ভাইসাব ?'

'নিশ্চয়।'

ডঃ ভারমা এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। নিজেই দরজা খুলে হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন।

পনের সেকেণ্ডের মধ্যে বেয়ারা এসে হাজির। ডঃ ভারমা অর্ডার দিলেন, 'চা, টোষ্ট ঔর অমলেট। চার-চার প্লেট মে লানা।'

'এত কি হবে ?'

আমরা তিনজনেই এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলাম।

'কোন কথা নয়,' ডঃ ভারমা ধমকে উঠলেন, 'যা আসবে চুপচাপ গিলে যাবে। নো কমেন্ট, নো প্রোটেষ্ট।'

অগত্যা।

'এবার আমি যার কথা বলব, তার নাম ইতিপূর্বে আপনারা সকলেই অনেকবার শুনছেন।' শশী গলা কেসে, গলার স্বরটাকে আরো পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'ভদ্রলোকের নাম শ্রীমথুরালিঙ্গম থেবর, তামিলনাড়ু বিধানসভার একজন প্রাক্তন সদস্য; সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা। ভদ্রলোক বার বার সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে এবং প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন যে, তথাকথিত তাইহকু দুর্ঘটনার পরেও তার সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগ ছিল। তিনি নেতাজীর অগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর নির্দেশে ভারত সীমান্তে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

শাহনওয়াজ তদন্ত কমিটি শ্রী থেবরকে অনুরোধ করেন এই সংবাদের উৎস ঘোষণার জন্য। পরিবর্তে শ্রী থেবর জানতে চেয়েছিলেন, নেতাজীর নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় আছে কিনা? এর জবাবে কমিটি জানায় যে, ভারত সরকারের কাছে ও রকম কোন তালিকা নেই।

শাহনওয়াজের এই উত্তরে শ্রী থেবর সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কারণ, তার মনে সন্দেহ দেখা দেয়, ভারত সরকারের কাছে তালিকা না থাকলেও মিত্রশক্তির শরীকদের কাছে তালিকা থাকতে পারে। ফলে তিনি তার সংবাদের উৎস ঘোষণায় অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এই প্রসঙ্গে আমি লিওনার্ড মোজলের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'লাষ্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ' থেকে একটা উদ্ধৃতি আপনাদের শোনাচ্ছি। এই বইয়ের ভূমিকায় মোজলে বলেছেন, 'অফিসিয়্যাল ডকুমেণ্টস ডিলিং উইথ দ্যা ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া উইল নট বী অফিসিয়্যালী রিলিজড্ আনটিল নাইনটিন হানড্রেড এ্যাণ্ড নাইনটি নাইন।'

এখন আমার প্রশ্ন, ঐ দলিলে এমন কি গোপনীয় তথ্য আছে, যা উনিশ শ' নিরান্নব্বই সালের আগে প্রকাশ হয়ে পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আপনারাই বলুন, শ্রী থেবর তার সংবাদের উৎস প্রকাশ না করে ঠিক করেছেন, না অন্যায় করেছেন?'

এর জবাব কি তা আমরা কেউই ভেবে পেলাম না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে শশীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে টেবিলে চা-টোষ্ট-অমলেট পৌঁছে গেছে। সকলে মিলে তার সদ্ব্যবহার শুরু করে দিলাম। খেতে খেতেই শশী তার গবেষণার ফলশ্রুতি বলে যেতে লাগল, 'মিস এমিলি এরিকসনের নাম নিশ্চয় এর আগে আপনারা কেউ শোনেন নি। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও তার নাম কোনদিন শুনিনি। প্রথম জানলাম

উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার 'ন্যাশনাল রিপাবলিক' পত্রিকায় তার লিখিত প্রবন্ধ পড়ে। লেখিকার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, তিনি নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাহিনীর একজন সদস্যা। ঐ প্রবন্ধে অনেক যুক্তিতর্কের পর লেখিকা বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং জনসাধারণ কেউই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বোসের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করে না। তাছাড়া, একজন ফিল্ড নার্স সহ অনেকেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর তাঁকে দেখেছেন। সেদিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, সুভাষ বোস জীবিত আছেন।'

এবার আমি আপনাদের বহু আলোচিত ভাগ্যবান পুরুষ কর্ণেল হবিবুর রহমান সম্পর্কে একটা মজার খবর দিতে চাই।

আপনারা সবাই জানেন, কর্ণেল হবিবুর এখন পাকিস্তানে থাকেন। উনপঞ্চাশের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত 'সিভিল এ্যণ্ড মিলিটারী গেজেট' পত্রিকায় কর্ণেল রহমানের এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বিবৃতিতে কর্ণেল রহমান বলেছিলেন, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে এতদিন ধরে তিনি যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তিনি একজন সৈনিক। সৈনিককে কম্যাণ্ডের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। সুতরাং তাঁকে যেভাবে কাজ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেভাবেই কাজ করেছেন।'

'বল কি !'

হবিবুর রহমানের স্বীকৃতির কথা শুনে ডঃ ভারমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, ঐ দুর্ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষ ভারতীয় সাক্ষী তো তিনিই। শেষ পর্যন্ত তিনিও সে কথা অস্বীকার করেছেন !'

'সবই ওপরওয়ালার দয়া।'

শর্মা ডঃ ভারমার মতামতকে অনেকটা বদলে দিতে পারার

নিজে মনে মনে যে কি প্রচণ্ড খুশী হয়েছে তা ওর এই আকস্মিক ঈশ্বর ভক্তিতেই প্রমাণিত হচ্ছে। তবু মনের উচ্ছ্বাসকে যতটা পারল চেপে রেখে বলল, 'লাহোর সিভিল এ্যণ্ড মিলিটারী গেজেট' পত্রিকার কথা যখন উঠলই তখন পুরান আর একটা খবরের কথাও বলি। খবরটা ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল ক' বছর আগে, ছেচল্লিশের এপ্রিল মাসে। খবরের উৎস ছিলেন কলকাতায় আগত জনৈক চীনা ভদ্রলোক। ঐ ভদ্রলোক দাবি করেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস জীবিত এবং মাঞ্চুরিয়ায় আছেন।'

একখণ্ড টোষ্ট আর অমলেট গালের এক পাশে গুদামজাত করে শশী বলল, 'নেতাজী যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মোটেই মারা যান নি, তার স্বপক্ষে আমি এবার আপনাদের সামনে পয়ষট্টির সতরই মার্চ কলকাতার 'হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত পাটনার অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর ডক্টর এ. সি. সেনের প্রবন্ধের কিছুটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি।

এই প্রবন্ধে ডক্টর সেন ব'লেছেন, 'তথাকথিত তাইহকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী যে সত্যই জড়িত ছিলেন না সেটা শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের কাছেই নগ্নসত্য ছিল না, বহু ভারতীয় এবং দিল্লীর বড়কর্তাদের কাছেও খুব পরিষ্কার ছিল।

প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে তারা গোপনতা রক্ষার শপথ নিয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় দলের চুপ করে থাকার পিছনের কারণ ছিল দলগত ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থহানির ভয়।

শাহনওয়াজ কমিটির সামনে আমি যে কথা বলেছিলাম, আজও সেই কথাই বলছি। আমি জানিনা ঐ কমিটি এ সম্পর্কে কি ভেবেছিল। তবে আমি যখন কিং'স এমার্জেন্সী কমিশনের টেকনি-ক্যাল পার্সোনেল হিসেবে কাজ করছিলাম তখন বহু ভারতীয় ও বৃটিশ সামরিক অফিসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

তখন যে সমস্ত তথ্য আমি জেনেছিলেন তা এখানে বিবৃত করছি :

প্রথমতঃ, তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ঘটবার কয়েক সপ্তাহ পরে আমার সহকর্মী একজন বৃটিশ কর্ণেল আমাকে বলেন যে, বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সাজান। নেতাজীর গতিবিধি ও কার্য-কলাপ গোপন রাখার জন্যই ঐ কাহিনী প্রচার কয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, কয়েক মাস পরে, একজন দক্ষিণ ভারতীয় ক্যাপ্টেন আমাকে বলেন যে, তার কাকা, যিনি মাদ্রাজের একজন প্রবীণ গোয়েন্দা কর্মচারী, তাকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব চীনে নেতাজীর গতিবিধি খুঁজে বের করার জন্য পাঠান হয়েছিল। এই দলটি ছ' মাস পরে খুব বেশী সাফল্যলাভ না করেই ফিবে আসে।

তৃতীয়তঃ, সামরিক বিভাগের চাকরী থেকে ছাড়া পাবার পর আমি যখন বেসামরিক চাকুরীর সূত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলান, তখন এক বড় রেল ষ্টেশনে আমার সঙ্গে একজন পাঞ্জাবী লেফটেন্যাণ্টের দেখা হয়। সাতচল্লিশেব ফেব্রুয়ারীতে তিনি চুংকিয়াং থেকে স্বদেশ ফিরছিলেন। এই ভদ্রলোক একসময় আমার অধীনে মিলিটারী সদর দপ্তরে কিছুদিনের জন্য শিক্ষানবিস ছিলেন। চা খেতে খেতে ভদ্রলোক আমাকে বলেন যে, চীনে এক বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সেখানকার রেশনিং-এর দায়িত্ব ছিল তার উপর। তাছাড়া তার পার্টির উপর আদেশ ছিল, নেতাজীকে দেখা মাত্রই যেন গুলি করে মারা হয়।

একদিন রাত্রে তার সিপাইরা এসে খবর দেয় যে প্রায় চারশ' গজ দূরে নেতাজী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এক শিবির স্থাপন করেছেন এবং খাদ্যাভাবে সকলে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন তখনই একজন লোককে সঙ্গে করে কিছু রুটি এবং টিনে ভরা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে যান এবং নেতাজী ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো গ্রহণ করে

তাকে আশীর্বাদ করেন। বিলম্ব না করে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা দু'জন নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে আসেন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে কাউকে একটি কথাও বলেন না। ছেচল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটে।

চতুর্থতঃ, পূর্বোল্লিখিত ইংরেজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পঞ্চাশ সালে কেমব্রিজে আমার আবার দেখা হয়। তখন কথা প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন আমাকে বলেন যে, তিনি জানতে পেরেছেন, নেতাজী রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য ব্রিটিশরা সব রকম চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তারপর যে নেতাজীর ভাগ্যে কি ঘটেছিল আমার বন্ধুটি তা বলতে পারেন নি।'

একনাগাড়ে এতটা বলে শশী যেই একটু থেমেছে, অমনি ডঃ ভারমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কি তোমার লাষ্ট ইনফরমেশন?'

'মোটেই না।'

শশী বেশ গর্বিত স্বরে জবাব দিল।

'আরো কত আছে!'

'কেন, অধৈর্য হয়ে পড়লেন নাকি?'

'মোটেই না। শুধু তোমার ধৈর্য কতটা তাই দেখতে চাইছি।'

'তাহলে আপনি নিজে আগে ধৈর্য ধরে বসে থাকুন।'

'বসে রইলাম।'

ডঃ ভারমা পায়ের উপর পা তুলে বেশ আরাম করে বসলেন। দেখে আমাদের সবার হাসি পেয়ে গেল; কিন্তু উনি তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না।

শশী তার থেমে যাওয়া বক্তৃতা আবার চালু করল, 'কয়েক বছর পরের কথা বলছি। কিম্বা বলতে পারেন আজ থেকে দু তিন বছর আগের কথা বলছি। কলকাতার যুগান্তর-অমৃতবাজার গ্রুপের পত্রিকায় উনষাটের চৌঠা মার্চ খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল।

ঐ খবরে বলা হয়েছিল, কলকাতা পুলিশ বিভাগে বর্তমানে কর্মরত সৈন্য বাহিনীর জনৈক প্রাক্তন অফিসার বলেছেন, সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান বিমানে নয়, সাবমেরিনে হয়েছিল '

ঐ অফিসার যুদ্ধের শেষ দিকে সিঙ্গাপুরে জুবং অন্তরীণ বন্দী শিবিরের পরিচালনায় নিযুক্ত থাকাকালীন সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এই দাবী করেছেন।

সিঙ্গাপুরে চাকুরীরত অবস্থায় ঐ অফিসারটির সঙ্গে নেতাজীর একজন ঘনিষ্ঠ জাপানী পার্শ্বচরের আলাপ হয়। সেই পার্শ্বচরটির কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে. সিঙ্গাপুর থেকে শেষ অন্তর্ধানের প্রাক্কালে নেতাজী একটি মোটরে বুকিতিমা থেকে সমুদ্রতীরের কোন এক স্থানে যান। ঐ জাপানী ভদ্রলোকই সেই গাড়ীর চালক ছিলেন। নেতাজীর নির্দেশ মত আধ ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করে নেতাজী ফিরে না আসায় তিনি সেই গাড়ীতেই সহরে ফিরে আসেন।

অফিসার ভদ্রলোকটি দাবি করেছেন যে, পরে তিনি স্বয়ং সেই জায়গা পরিদর্শন করেছিলেন। জায়গাটা তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত থাকায় একমাত্র সাবমেরিন ছাড়া, বিমান বা অন্য কোনভাবে সেখান থেকে অন্তর্ধান করা সম্ভব নয়।

আমি বুঝতে পারছি,' শশী আমাদের বেশ ভাল মত দেখে নিয়ে বলল, 'আপনারা সবাই ব্যাপারটায় একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন। এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ সকলেই জানেন, এবং এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তথাকথিত তাইহকু দুর্ঘটনার ঠিক আগের দিন নেতাজী বিমানেই সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেছিলেন। এ ঘটনার সাক্ষী একজন দুজন নয়, অনেকে। যেমন হবিবুর রহমান, এস. এ. আয়ার, গুলজারা সিং, প্রীতম সিং, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাস প্রভৃতি।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তা হলে আমি এ কাহিনীর

কথা বললাম কেন ? আমার বক্তব্য খুব সোজা, একেবারে সাধারণ বলতে পারেন। আমি শুধু আপনাদের মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর এবং মার্কিন সাংবাদিকের সেই রিপোর্টটার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যাতে বলা হয়েছিল, পঁচিশে আগষ্ট নাগাদ নেতাজীকে সায়গনে দেখা গিয়েছিল।'

এতটা স্বাভাবিক সুরে বলার পর হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে একেবারে ঝুনো ব্যারিষ্টারের কায়দায় শশী বলল, 'হে মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, দয়া করে আপনারাই বলুন. সায়গন থেকে সিঙ্গাপুর কতদূর ?'

'এক্সেলেণ্ট শশী, এক্সেলেট।'

শশীর বলার ভঙ্গীতে ডঃ ভারমা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে হুরমুর করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলাম। হাঁপাতে হাঁপাতেই উনি শশীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করতে করতে বললেন, 'কনগ্র্যাচিউলেশন মাই ব্রাদার ; আই টেল ইউ, ইউ উইল শ্যুয়র সাইন।'

'থ্যাঙ্কস এ লট ডক্টর ভারমা।'

মনে হল ডঃ ভারমার অভিনন্দনে শশীও মনে মনে যথেষ্ট অভিভূত হয়ে পড়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে গলার স্বরে বেশ গাম্ভীর্য এনে শশী বলল, 'মাই ডিয়ার লিসনারস্, প্লিস বী সিটেট কাম এ্যাণ্ড কোয়ায়েট।'

আমরা সবাই অনেকটা-আদেশ মানার মত ওর কথা শুনে ঠিক-ঠাক হয়ে বসলাম। শশী টেবিলের ওপরে নোটবইটা রেখে প্রথম যে বইটা থেকে কিছু অংশ পড়ে শুনিয়েছিল, সেটা হাতে তুলে নিল।

বইটা খুলে কয়েকটা পাতা উল্টে যাবার পর আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'আমি আপনাদের কাছে সবশেষে ডক্টর সত্যনারায়ণ

সিংহের বই থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাব। কারণ, আমার মনে হয়, ডক্টর সিংহ যাদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে বর্ণনা করেছেন তাদের সাক্ষ্য বিচার না করে গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে প্রথমেই অগ্রাহ্য করাটা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

আপনাদের নিশ্চয় ভেরা এবং আকিমভের কথা মনে আছে। এবার আমি আর একজন অপ্রত্যক্ষ সাক্ষীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এর নাম গোগা। ইনি বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীঅবনী মুখার্জীর রুশ সহধর্মিণী ফিটিংগফের পুত্র।

এরসঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে ডক্টর সিংহ বলেছেন, 'খুব লজ্জিতভাবে অবনীবাবুর খবর জানতে চাইলাম। বললে—জ্ঞানের জগতের লোক বলে বাবা ষ্ট্যালিনের শুদ্ধিকরণের বলি হননি। যুদ্ধের সময় সাইবেরিয়ায় কমিণ্টার্ণের নির্বাসিত বিদেশী হোমরা-চোমরাদের মস্কো প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় পঞ্চাশের দশকে। তাদের কাছ থেকে বাবা শুনলেন যে, সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্ক বন্দিশালায় তারা একজন অতি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় নেতাকে দেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যুদ্ধের সময় আমাদের শত্রু জার্মান্ ও জাপানীদের সাহায্য করেছেন। বাবার বুঝতে দেরী হল না, তিনি আর কেউ নন, তিনিই সুভাষচন্দ্র। বন্দিশালা থেকে সুভাষবাবুর মুক্তি প্রার্থনা করে বাবা ষ্ট্যালিনকে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন।'

বোরিস কথার মাঝখানে মন্তব্য করল, 'এই জন্যই বোধ হয় ষ্ট্যালিন তোমার বাবার উপর খুব চটে যান।'

'ঠিক তাই। বাবা ষ্ট্যালিনকে লিখেছিলেন যে, সুভাষবাবু একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাঁকে জার্মান বা জাপানীদের ক্রীড়নক বলা সঙ্গত হবেনা। বার্লিন এবং টোকিওতে তাঁর তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বহিঃশক্তির সাহায্য লাভ করা। আর সে সাহায্য তাঁর কাম্য ছিল একমাত্র

রাশিয়ার কাছ থেকে। সুভাষবাবুর উপর সুবিচার করার জন্য তিনি ষ্ট্যালিনকে অনুরোধ জানান। বাবার কাছ থেকে এমন অনুরোধকে ষ্ট্যালিন ফ্যাসিবাদী যুক্তি হিসেবে গণ্য করলেন। পত্রটি পাঠানর পরের দিনই রুশ গোয়েন্দা পুলিশেরা বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আজও তিনি ফেরেন নি।'

'দুঃখের বিষয়,' বরিস বলিল, 'সুভাষবাবুর পক্ষে প্রফেসার মুখার্জী বলেছিলেন আর তাই তাঁকেও ইযাকুটস্ক বন্দিশিবিরে পাঠান হয়েছে।'

'তুমি নিশ্চিত জান যে, সুভাষবাবু ইয়াকুটস্ক বন্দিশিবিরে আছেন?' আমি গোগাকে প্রশ্ন করলাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সমসাময়িক কমিণ্টার্ণের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষ মাঝুত খুড়োকেও টটস্কীপন্থী বলে ইয়াকুটস্ক পাঠান হয়েছিল। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তিনি ফিরে এসেছেন। তিনিও বলেন যে, ইয়াকুটস্ক-এর কেন্দ্রীয় বন্দিশিবিরে পয়তাল্লিশ নম্বর সেলে সুভাষবাবুকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর আমার বাবা আছেন সাতান্ন নম্বরে।'

'মাঝুত কি করে সুনিশ্চিত হলেন যে তিনিই সুভাষবাবু?'

'কেন? আপনি জানেন, যুদ্ধের আগে বহুবার মাঝুতখুড়ো-ভারতে গিয়েছেন। প্রায়ই তিনি সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন। এমন কি ডক শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল।'

'মাঝুত কোন সালে সুভাষবাবুকে ইয়াকুটস্ক কারাগারে দেখেছেন?'

'উনিশ শ' পঞ্চাশ-একান্ন সালে।'

'এরপর তাঁর সম্পর্কে আর কোন খবর তোমার জানা আছে?'

'না।'

গোগার বর্ণনা এখানেই শেষ।'

বইয়ের কয়েকটা পাতা এদিক ওদিক উল্টে শশী বলিল, 'এবার আমি তাইহকু বিমানঘাটির কর্মচারী কর্ণেল ইয়ের দেওয়া বিবরণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি ঃ

'তাহলে কর্ণেল, আপনার ধারণা নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে নি। তিনি সত্যই দাইরেনে পেঁছান।'

'আমার ধারণা।…মানে, আপনি কি বলতে চান? উনিশ শ' পয়তাল্লিশের আঠারই আগষ্ট বেলা আড়াইটায় নেতাজী দাইরেন যাত্রা করলেন তা আমি নিজে দেখেছি। চুংকিং সরকারকে এ খবর আমি জানিয়েছি।'

'খবরটা কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকছে এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, 'তাইপে বিমানক্ষেত্রে তখন আপনি কি করতেন?'

'এই বিমানক্ষেত্রের জাপানী সামরিক ক্যান্টিনে একটা বয় হিসেবে কাজ নিই। অফিসার ও গণ্যমান্যদের যাবার পথে চা, প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নের হাল্কা খানা পরিবেশন করা আমার কাজ ছিল।'

'তিনিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তা আপনি কি করে জানলেন?'

'তিনি যখন কংগ্রেস সভাপতি তখন কলকাতায় তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য রাখা আমার কাজ ছিল।'

'স্বার্থ?'

'ব্যক্তিগত কিছু নয়। চুংকিং সরকারের হুকুম তালিম করেছি মাত্র।'

'নেতাজীর দাইরেন যাত্রার সময় আপনি যা দেখেছেন তার আরো কিছু বিবরণ দয়া করে দিন।'

'বিশ্বাস করুন, সেদিনের তৎপরতা সম্পর্কে যে সব জাপানী গোয়েন্দা খোঁজ রাখার কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের চেয়ে আমি বেশী খবর রাখি।'

'যথা?'

'জানেন, সেদিন আঠারই আগষ্ট। হোমরা চোমরা জাপানী অফিসারদের একটা দল আত্মসমর্পণের সাদা নিশান উড়িয়ে ওকিনাওয়ায় আমেরিকান সদর ঘাটিতে গেল। অন্যান্য যুদ্ধ ঘাটির মত এখানকার জাপানী সেনাপতিরাও আত্মসমর্পণে গররাজী ছিলেন। তাই সব জাপানী সেনাপতিদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সম্রাটের ব্যক্তিগত আদেশ পৌঁছিয়ে দেবার পথে একজন জাপানী রাজকুমার এখানে আসেন। তাঁর সম্মানে এখানে একটা বিশেষ তাঁবু খাটান হল; আর ত্রিশ পদের খানা তৈরীর ভার পড়ল আমাদের ক্যান্টিনের ওপর। অতিরিক্ত পরিচর্যার ভার পেলাম আমি। তেমনি, জেনারেল সিডির সঙ্গে নেতাজী যখন এখানে পৌঁছলেন তাদেরও চা পরিবেশন আমিই করেছি। ইংরেজী ভাষায় আনপড় আমি এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। তাই জাপানীরা তাদের প্ল্যান সম্পর্কে নেতাজীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করল সেখানে। আমি যে সব সময়েই তাঁবুতে রয়েছি সেদিকে তারা কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না।'

'কি প্ল্যান নিযে নেতাজীর সঙ্গে তাদেব আলোচনা হল?'

'নেতাজী দাইরেন বিমানক্ষেত্রে সেদিনের পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। আলোচনাকালে জাপানী গোয়েন্দা অফিসার জানালেন যে, দাইরেনে আমেরিকানরা অবতরণ করতে পারেন এমন একটা আশঙ্কা রাশিয়ানদের মধ্যে রয়েছে। সেজন্য তাদের বিমান বাহিনী দাইরেন দখলে তৎপর হয়ে উঠেছে। খবরটা শুনে নেতাজী মন্তব্য করলেন, এখনই দাইরেনে যেতে হবে আমাদের।'

'তিনি তড়িৎগতিতে চললেন। জেনারেল সিডিও তাঁর অনুগমন করলেন। বিমানে উঠেই নেতাজী আদেশ দিলেন, দাইরেন চল।'

কর্ণেল ইয়ের জবানবন্দী পড়া শেষ করেই শশী বলল, 'এবার আমি আপনাদের আর একজন সাক্ষীর জবানবন্দী শোনাব। ভদ্রলোকের নাম মিষ্টার ভিং। বর্তমানে তাইপের একজন

ব্যবসায়ী। আগে চুংকিং সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের অধীনে কাজ করতেন। গুপ্তচরবৃত্তির প্রয়োজনে যুদ্ধের সময় দাইরেনে একটা বিউটি সেলুন খুলেছিলেন।'

কথা বলতে বলতে আগের মতই পাতা উল্টে গেল শশী। তারপর পড়তে আরম্ভ করল, 'সুভাষবাবু যখন দাইরেনে পৌঁছলেন, তখন আমিই সর্বপ্রথম তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি।

রবিবারের সকাল। নিষ্ঠাচারী ক্যাথলিক আমি। গীর্জায় যাবার পথে আমাকে দেখে জাপানী চাফ অব ষ্টাফের গাড়ীতে আমাকে জাপানীরা উঠিয়ে নিল। তারা বলল, ক্ষুর কাঁথা নিয়ে আমাকে এক বিশেষ কাজে এখনি তাদের অনুগমন করতে হবে।

সেখানে কাকে দেখলাম জানেন? পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে। এই ইউনিফর্মে তাঁর ছবি আমি বহুবার জাপানী সংবাদপত্রে দেখেছি। তাই, তাঁকে চিনতে আমার অসুবিধে হয়নি।

তাঁর কাছে গিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'ইওর এক্সেলেন্সী!' মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সংশোধন করে বাংলায় বললাম, 'নেতাজী, আসুন, চুল কামিয়ে দিই।'

তাঁর স্বভাব হাসিমাখা স্বরে আমাকে ঠিক পরিচিত স্বজনের মত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বাংলা কোথায় শিখলে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'কলকাতায়।' তাঁর বিশ্বাস অর্জনের পক্ষে এই পরিচয়টুকুই তিনি যথেষ্ট মনে করলেন। আমি কাপড় দিয়ে তাঁর গা ঢাকতে যাচ্ছি, তিনি আমাকে বাংলায় রেডিও খুলে দিতে বললেন।

আমরা আমেরিকান সংবাদে শুনলাম—চীনে জাপানীরা হাজারে হাজারে আত্মসমর্পণ করছে। রাশিয়ানরা চারজন জাপানী সেনাপতিকে বন্দী করেছে।

নেতাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের মধ্যে কি শিডি আছে?'

আমি তার কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

তারপর নেতাজী বাংলায় বললেন, 'শীগগিরই দাইরেণের পতন হচ্ছে।'

এতটা এক নাগাড়ে পড়ে যাবার পর, শশী মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে ?'

'একেবারে হিচককের সাসপেন্স মনে হচ্ছে।'

আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানালাম।

'এর আগে এ বই তুমি পড়নি ?'

'না।'

'সেকি ! এটাতো বাংলায়ও বের হয়েছে !'

'আমি ঠিক যোগাড় করে উঠতে পারিনি।'

'কেন ? বই হয়ে বের হবার আগে এর সবটাই তো কলকাতার আনন্দ বাজার এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল।

'দিল্লীতে থেকে রোজ কি আর কলকাতার কাগজ পড়া সম্ভব হয়। এখানেই তো ইংরেজী হিন্দী মিলিয়ে গোটা আষ্টেক কাগজ; সেগুলোই ভাল করে দেখতে হলে দিন কাবার হয়ে যাবে।'

'তা হলেই বোঝ, তুমি বাঙালী হয়েও তোমার এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই।'

শশী কথাটা যেন খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলল বলে আমার মনে হল। নিজের অজ্ঞতার সাফাই গাইবার জন্য বললাম, 'না, ঠিক তা নয়, তবে তোমার মত অধ্যবসায় তো আমার নেই, তাই এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ থাকা সত্বেও সেটা খুব একটা কার্যকরী হয়নি।'

'বাজে যুক্তি দেখিও না।'

প্রায় ধমকের সুরেই কথাটা বলল শশী।

উপায়ান্তর না দেখে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম।

শশী বলল, 'আপাততঃ আমার নোট বইয়ের ষ্টক এখানেই খতম হল। যদি ডক্টর ভাবমা অনুমতি দেন তাহলে আর একদিন সবাইকে অন্য কিছু তথ্য শোনাব।'

'নিশ্চয়।'

ডঃ ভাবমা সোৎসাহে শশীর প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন।

'কবে, ডেটটা এখনই ঠিক হয়ে যাক।'

রাকেশ প্রস্তাব করল।

'না, না', শশী আপত্তি করল, 'এখন নয়, বরং আমি ডক্টর ভাবমার সঙ্গে ফোনে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে নেব।'

'অল রাইট, আই উইল ওয়েট ফর ইওর রিঙ্গ।'

'থ্যাঙ্কস।'

'বাই বাই, সি ইউ এগেন।'

'বাই বাই।'

ডক্টর ভারমা আমাদের লিফটের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে হাটতে হাটতে কখন যে কনট্ প্লেসের গোল চত্বরে এসে পড়েছি তা কারো খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম এক সুরেলা কণ্ঠের আহ্বানে: 'হ্যাল্লা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, হাই?'

মিসেস রত্না ভাণ্ডারী।

সময়ের উল্টো দিকে শরীরটাকে কি করে চালনা করতে হয় নিপুণ ভাবে সেই কঠিন বিদ্যেটাকে আয়ত্ব করা যদি আর্টের জগতে শিল্প বলে বিবেচিত হত, তাহলে মিসেস ভাণ্ডারী এদেশের শিল্পিসমাজে সম্রাজ্ঞীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হতেন।

ভদ্রমহিলার সঠিক বয়স যে কত সে নিয়ে দিল্লীর পার্লামেন্টে

কখনো আলোচনা হয়েছে বলে শুনিনি। যদি হতো, তা হলে সরকারী আমলারা যে কি সমস্যার মধ্যে পড়তেন সেটা ভাবতেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়।

মিসেস ভাণ্ডারীর বয়স নিয়ে কফি হাউসের টেবিলে একবার তর্ক হয়েছিল মনে আছে। বনোয়ারী বলেছিল, 'ওনার বয়স তিরিশ থেকে বত্রিশ হবে।'

কথাটা শুনে উষা জৈন এত রেগে গিয়েছিল যে সেদিন আর একটা কথাও বলেনি।

মনে আছে, উষার রাগ দেখে শশী আমার কানের কাছে মুখ এনে খুব চাপা স্বরে বলেছিল, 'বোধ হয় নিমন্ত্রণটা মারা গেল। উষা যে রকম সিরিয়াস হয়ে গেছে তাতে বনোয়ারীকে আর বিয়ে করতে রাজী হবে বলে তো মনে হয় না।'

কথাটা আমি আইভির কানে পৌঁছে দিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও আমাদের সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'যদি বনোয়ারী কিছু মনে না করে, তা হলে আমি আমার বাবার কাছ থেকে শোনা একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলতে চাই।'

আমি, শশী দুজনেই সোৎসাহে আইভিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিলাম, 'নিশ্চয় বলবে। তাছাড়া তোমার বাবার কাছ থেকে শোনা কাহিনী বলাতে বনোয়ারীর কিছু মনে করার তো কোন কারণ নেই।'

আমাদের সমর্থন পেয়ে আইভি বলে, 'তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। একদিন মিসেস ভাণ্ডারীর কাছ থেকে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেলাম তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য।

কার্ডটা পেয়ে আমার মনে খুব স্ফূর্তি হল। কারণ, মিসেস ভাণ্ডারীর মত একজন বিশিষ্ট সোসাইটি লেডি আমাকে তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছেন—তখন এটাই ছিল আমার কাছে সব থেকে গর্বের বিষয়।

নির্দিষ্ট দিনে সেজেগুজে উপহারের প্যাকেট নিয়ে বের হতে যাব, একেবারে গেটের মুখে বাবার সামনে পড়ে গেলাম। বাবা হেসে জিজ্ঞসা করলেন, কোথায় যাচ্ছি।

বাবার কাছে সত্যি কথাই বললাম। শুনে বাবা আকাশে থেকে পড়লেন। বললেন, 'সেকি, তোমাকে মিসেস ভাণ্ডারী তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছেন!'

বাবার কথায় আমার রাগ হল। বললাম, 'কেন, আমাকে কি নিমন্ত্রণ করতে পারেন না?'

'না, ঠিক তা নয়,' বাবা বললেন, 'জন্মদিনে সাধারণত সম-বয়সী-দেরই নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ, তাই বলছিলাম ...'

বাবার কথায় আমি খুব রেগে গেলাম। বললাম, 'কেন দু'এক বছরের ছোট হলে কি তাকে নিমন্ত্রণ করা যায় না?'

'কি বললে!' আমার কথায় বাবা যেন চমকে উঠলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মুন্না, তোমার মাকেও যখন আমি মিসেস ভাণ্ডারীর জন্মদিনের পার্টিতে যাবার ব্যাপারে আপত্তি করতাম তখন তিনিও তোমার মত রেগে গিয়ে বলতেন, কেন মিসেস ভাণ্ডারীর থেকে আমি দু'এক বছরের ছোট বলে কি আমাকে নিমন্ত্রণ করাটা তার অন্যায় হয়েছে?'

আইভির কথা শুনে সেদিন আমরা হেসে লুটোপুটি খেয়েছি-লাম। শুধু হাসেনি একজন—বনোয়ারী। বেচারা মুখ ফসকে একটা কথা বলে কি বিপদেই না পড়েছিল।

সেই মিসেস ভাণ্ডারী কুশল বিনিময়ের পরে জানতে চাইলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

এ প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব আমাদের কারোই জানা নেই। আসলে এতটা পথ কেউ কোন কথা না বলে স্বপ্নাবিষ্টের মত হেঁটে এসেছি। কোথায় চলেছি, এরপরে কি করবো সেটা কারো চিন্তাতেই আসেনি। মনে হয়, আমার মত ওদের দুজনের ভাবনাকেও

আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন সেই হারিয়ে যাওয়া পথিক, যিনি আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে ঘর ছেড়ে বেড়িয়েছিলেন ভয়ঙ্করের ডাকে—অজানার পথে।

সে দিনটা উনিশ শ' চল্লিশ সালের দোসরা জুলাই।

বেলা তখন দুপুর দুটো বেজে পনের মিনিট।

এলগিন রোডের বাড়ীর দোতলায় নিজের ঘরে বসে ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা বলছিলেন সুভাষচন্দ্র। এমন সময় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জে. ভি. জানভ্রিন এসে দাঁড়ালেন বাইরের ঘরে; সঙ্গে তার দুজন সিপাই। তিনি দেখা করতে চান সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে।

জানভ্রিনকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় পনের মিনিট। বেলা আড়াইটার সময় তার ডাক পড়ল সুভাষচন্দ্রের ঘরে।

ঘরে ঢুকে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময়ের পর জানভ্রিন সুভাষচন্দ্রের সামনে মেলে ধরলেন তাঁর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। পরোয়ানায় লেখা আছে: মহামান্য সরকার বাহাদুর ভারতরক্ষা বিধির একশ' উনত্রিশ ধারা বলে তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছেন।

সরকার বাহাদুরের আদেশ অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়া হল প্রেসিডেন্সি জেলে।

পরদিন প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই গ্রেপ্তারের সংবাদ; সঙ্গে সরকারী মুখপাত্রের দেওয়া গ্রেপ্তারের কারণও জানান হল। মহামান্য সরকার বাহাদুরের মতে, সুভাষচন্দ্র হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবিতে তেসরা জুলাই থেকে যে আন্দোলন শুরু করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তাতে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকাতে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কথাটা ঠিক।

উনত্রিশে জুনের 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় এক সাক্ষরিত প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলন হলওয়েল মনুমেণ্ট উৎখাত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের। উনিশ শ' চল্লিশের তেসরা জুলাই সমগ্র বাংলায় সিরাজদ্দৌল্লা দিবস প্রতিপালিত হবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি আমরা ঐদিন পূজো করব। হলওয়েল মনুমেণ্ট শুধু নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতিকেই অকারণে মসিলিপ্ত করেনি, পরন্তু বিগত দেড় শত বৎসর ধরে সমগ্র জাতির অবমাননার সাক্ষ্য হয়ে কলকাতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে।

আগামী তেসরা থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।'

সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক গ্রেপ্তারের খবরে যদিও তাঁর অনুগামী-বৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না। অচিরেই তাঁরা প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে পূর্ব-পরিকল্পনা মত কাজে হাত দিল।

যথাসময়ে সভা বসল অ্যালবার্ট হলে। জনসমাগমও হল প্রচুর। কিন্তু সভায় যতটা উত্তেজনা উদ্দীপনা দেখা যাবে আশা করা গিয়েছিল, তা হল না।

ঐদিনই পুলিশ গ্রেপ্তার করল জননেতা হেমন্ত বসু ও কৃষ্ণ কুমার চ্যাটার্জীকে। এ ছাড়া চারজন স্বেচ্ছাসেবকও গ্রেপ্তার হল।

এরপর একে একে গ্রেপ্তার হলেন রাজেন দেব, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, কালী বাগচী, অমর বসু, অনিল রায়, লীলা রায় প্রভৃতি অনেকে।

ওদিকে সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকরাও কারাবরণ করতে লাগল দলে দলে।

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন অনেকে। কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র জনাব সিদ্দিকি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'সুভাষচন্দ্র বসুর মত একজন সর্বজনমান্য নেতার এই অহেতুক গ্রেপ্তারে আমাদের মনে অস্বস্তিকর ধাক্কা দিয়েছে।' বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক বললেন, 'আমরা সবাই সুভাষচন্দ্রকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর প্রতি অনুরক্তও। এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি।'

কিন্তু সে সময় কংগ্রেস নেতারা কি করলেন ?

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পরের দিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক বসল দিল্লীতে। সেই বৈঠকে অনেক আলাপ আলোচনার পর গান্ধীজীর এতদিনকার সিদ্ধান্তকে একেবারে ধরা-শায়ী করে দিয়ে এক অদ্ভুত প্রস্তাব গৃহীত হল। সে প্রস্তাবে বলা হল, 'ব্রিটিশ সরকারকে অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস দিতে হবে। এবং সেই সদিচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ অবিলম্বে এমন একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে, যার প্রতি নির্বাচিত কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যদের পরিপূর্ণ আস্থা থাকবে। একমাত্র জাতীয় সরকারই ইংরেজকে বর্তমান যুদ্ধে সাহায্য করতে সমর্থ হবে।'

এই প্রস্তাব ছাড়াও বৈঠকে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে আরো অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলা হল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার সম্পর্কে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না।

দেশনেতাদের এই ব্যবহারে দেশবাসী সেদিন মনে মনে যে কতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল তেরই জুলাই, অ্যালবার্ট হলের প্রতিবাদ সভায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু বক্তাই সরকারের এই কাজের তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল নেতা এত বড় সরকারী অপরাধ দেখেও চুপ করে রয়েছেন, তাদেরও

সমালোচনা করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেন না। সভায় সর্ব-সম্মতিতে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হল। সেই সঙ্গে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্যও পুনরায় দাবি জানান হল। বলা হল, অন্যথায় বর্তমান আন্দোলন বন্ধ করা হবে না।

এই ঘোষণায় সরকার ঘাবড়ে গেল। ঠিক করল, যে ভাবেই হোক, এই আন্দোলনকে দমন করতে হবেই।

যে কথা সেই কাজ। পরের দিনই ঘোষিত হল দুটো নতুন আদেশ।

এই আদেশ দুটোর প্রথমটাতে বলা হল, 'হলওয়েল-মনুমেণ্ট আন্দোলন সংক্রান্ত কোন দলিল, বিজ্ঞপ্তি, গ্রেপ্তার সংবাদ কিংবা সভা বা শোভাযাত্রার বিবরণ কোন সংবাদপত্রে অথবা পুস্তিকায় ছাপান চলবে না। আর দ্বিতীয় আদেশ মতে, সভা সমিতি শোভা-যাত্রা বা ধর্মঘটে স্কুল বা কলেজের কোন ছাত্রের যোগদান বে-আইনী বলে ঘোষিত হল। কোন ছাত্র যদি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে তাকে শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হতে পারে।'

সুভাষচন্দ্রের বহু চেষ্টাতে যে কাজ হত না—সরকারের এক আদেশেই সেই অসাধ্য সাধন হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সারা কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠল।

ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পুলিশী অত্যাচার। চলল বেপরোয়া লাঠি চার্জ। দেখতে দেখতে রক্তে লাল হয়ে গেল কলেজ প্রাঙ্গন।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা কলকাতার ছাত্রসমাজ সমবেত হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সে দিনটা আঠাশে জুলাই। সভার পর এক বিরাট মিছিলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠল, কালা কানুন মানছি না, মানব না; ইনকিলাব-জিন্দাবাদ, সুভাষ বসু জিন্দাবাদ; হলওয়েল মনুমেণ্ট ভেঙে দাও—গুড়িয়ে দাও।

এ্যাসেমব্লীর ভিতরেও এ আওয়াজ ঝড় তুলল। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বিভিন্ন দলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসলেন। অবশেষে সন্ধ্যার সময় ঘোষণা করলেন হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। অবিলম্বে ওটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হবে।

এর একমাস পর উনত্রিশে আগষ্ট সব বন্দীরা ছাড়া পেল! শুধু আটকে রাখা হল একজনকে। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

সরকারের তরফ থেকে বলা হল, তাঁর নামে আরো অনেক অভিযোগ আছে; অনেক মামলা ঝুলছে। সুতরাং তাঁকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে না।

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই দু'মাসের মধ্যে একজন কংগ্রেসী নেতাও কংগ্রেস সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতিকে এভাবে আটকে রাখার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন নি। নেতৃবৃন্দের এই ব্যবহারে দেশবাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

সেদিন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে মহাত্মা গান্ধী দিল্লী থেকে রেলে করে ফিরছিলেন ওয়ার্ধায়। গাড়ী যখন নাগপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ এক যুবক গান্ধীজীর কামরায় উঠে এসে সরাসরি তাঁর কাছে জানতে চাইল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার সম্পর্কে একটি কথাও বলা হল না কেন? কেন কমিটি এ ব্যাপারে এমন পাস কাটিয়ে গেল?

সে মুহূর্তে গান্ধীজী যুবকটির প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারলেন না; শুধু বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জবাব দিলেন কদিন পরে—চৌদ্দই জুলাইয়ের 'হরিজন' পত্রিকায়।

গান্ধীজী লিখলেন, 'যুবকটির প্রশ্নে আমার মুখে কথা ফুটল না, তাই কোন জবাবও দিলাম না। তবে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সেদিনেব ঐ প্রশ্ন কেবলমাত্র ঐ একটি যুবকেরই প্রশ্ন নয়, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষেব মনেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছে।'

শুধু জনতাই নয়, সুভাষচন্দ্রেব কার্যকলাপের কথা চিন্তা করে ব্রিটিশেব শক্ত হৃদয়ও দোল খেয়ে উঠেছিল। তবে জনতার সঙ্গে তাদেব একটু তফাৎ ছিল। জনতাব মন দুলে উঠেছিল বিক্ষোভে, ব্রিটিশেব মন দোল খেযেছিল ভযে।

ভয়ের কারণ ছিল অন্য।

ওদিকে তখন ইউবোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে।

উনচল্লিশেব পয়লা সেপ্টেম্বর ভোববাত্রে, আগে থাকতে কাউকে কিছু না জানিযে হঠাৎ জার্মান সৈন্যবাহিনী পূর্ব প্রুশিয়ার সাইলেশিযা এবং শ্লোভাকিয়াব দিক থেকে পঙ্গপালের মত ঢুকতে থাকে পোল্যাণ্ডেব মূল ভূখণ্ডে।

খবর শুনে সাবা বিশ্ব স্তম্ভিত। প্রতিবাদ জানায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। কারণ মাত্র কদিন আগেই তাদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের এক মৈত্রীচুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। হিটলার অনেকদিন ধরেই বলে আসছিলেন ডানজিগ তাঁর চাই ই চাই। ওটা না হলে তিনি রাতে ঠিক মত ঘুমোতে পারছেন না।

যদিও কথাটা অনেকদিন ধরেই বলছিলেন ফ্যুয়েরার, তথাপি সেটাকে কেউ-ই তেমন কানে তোলেনি এতদিন। কারণ, সবাই জানত জোর করে ডানজিন দখল করতে গেলে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না। সুতরাং হিটলার যতই চিৎকার করুন না কেন, হুট করে বর্ডার ক্রশ করতে সাহস পাবেন না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাই-ই করলেন।

অবশ্য এর আগে একটা ব্যাপার পাকাপাকি করে নিয়েছিলেন ষ্ট্যালিন সাহেবের সঙ্গে।

সেটা তেইশে আগষ্ট। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের মাত্র আট দিন আগের কথা।

দুপুর বেলা একটা বিশেষ সরকারী বিমানে করে হঠাৎ বার্লিন থেকে উড়ে সোজা মস্কোতে গিয়ে হাজির হলেন জার্মান পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জোয়াসিস ভন রিবেনট্রপ। ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করার জন্য বিমানঘাটি পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাচিস্লাব মিখাইলোভিচ মলোটভ।

ঐ দিন রাত্রেই বার্লিন এবং মস্কো থেকে একযোগে ঘোষিত হল, ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ডের সরকারী মহলের হাড় কাঁপিয়ে দেবার মত সংবাদ—জার্মান এবং রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির খবর।

সেদিন থেকেই সবাই মনে মনে একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়েছিলেন। সবাই জানতেন, একদিন না একদিন একটা অঘটন ঠিকই ঘটবে। কিন্তু সেটা যে এমন হুড়মুড় করে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে তা কারো মাথায়-ই আসেনি। অঘটনটা যখন সত্যিই ঘটল তখন আর কারো কিছু করার নেই; কেবলমাত্র রেডিওতে জার্মান বাহিনীর অগ্রগমনের সংবাদ শোনা ছাড়া।

এদিকে বৃটিশ এবং ফরাসীরা যখন রেডিওর সামনে বসে যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির খবর শুনছে—তখন ওদিকে পোল জনসাধারণ চাতক পাখির মত আকাশের দিকে পরম আশায় মুখ তুলে দিনরাত চেয়ে রয়েছে একটা ব্রিটিশ কিম্বা ফরাসী বিমান দেখার জন্য। তাদের স্থির বিশ্বাস, তাদের এই বিপদের দিনে ব্রিটিশ কিম্বা ফরাসীরা চুপ করে বসে থাকবে না। তারা ওদের বন্ধু। বন্ধুর বিপদে

কোন সত্যিকারের বন্ধু কি এমন চুপ করে বসে থাকতে পারে!

এইতো সেদিনের কথা ; সপ্তাহটা এখনো কাটেনি। মাত্র ছ'দিন আগে বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। হয়তো সই করা চুক্তিপত্রটা এখনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ড্রয়ারেই পড়ে রয়েছে। কি জানি ওটাকে হয়তো সংরক্ষিত ফাইলের আলমারীতে তোলার সময়ই পাননি পররাষ্ট্র সচিব ভদ্রলোকটি।

অথচ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল আক্রমণ।

প্রথমটা সবাই একটু ঘাবড়ে গেল মনে মনে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ব্রিটিশ বিমান বহর এসে পড়ল বলে। তখন দেখবে, বাছাধনরা মারের চোটে পালাবার পথ পাবেনা।

বাচ্চা ছেলে জিজ্ঞাসা করল তার বাবাকে, ওদের আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

হবেনা? বাবা অবাক সুরে বললেন, ব্রিটেন ফ্রান্স কি আর বাড়ীর কাছে যে হুট করে গাড়ী চেপে এসে হাজির হয়ে যাবে। তারপর ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, তোদের স্কুলে কি ভূগোলটাও ভাল করে পড়ান হয় না রে! ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোরে পড়ছিস, অথচ এখন পর্যন্ত ইউরোপের ম্যাপটাও ভাল করে চিনলি না! সত্যি, আজকাল পড়াশুনার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একেবারেই নেমে গেছে।

ছেলে বাবার ধমক খেয়ে চুপ করে থাকে। তারপর নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে সোয়াৎলীকের ইউরোপের মানচিত্রটা খুলে বেশ ভাল করে দেখে মনে মনে হিসেব করে নেয়, পোল্যাণ্ড থেকে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের দূরত্ব কতটা।

ঠিকই তো, বাবা তো ঠিক কথাই বলেছেন। ব্রিটেন-ফ্রান্স কি

আর বাড়ীর কাছে যে হুট করে গাড়ী চেপে এসে হাজির হবে দোরগোড়ায়।

এদিকে হঠাৎ আকাশে বিমানের শব্দ। আশ পাশের সব বাড়ী থেকে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো বেড়িযে আসে রাস্তায়। আনন্দ উচ্ছ্বাসে সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে, হে ভগবান, এতদিন পবে তুমি মুখ তুলে তাকিয়েছ।

সবাই চিৎকার করে, হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানায নাল আকাশে ঘুর্ণায়মান একঝাক শঙ্খচিলেব মত দেখতে বিমানগুলোকে।

একজন বৃদ্ধ বলে ওঠেন, কি, আগেই বলেছিলাম না, বৃটিশ কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ওবা একবার কথা দিলে জান গেলেও সে কথা রাখবে। আরে বাপু আমি নিজে পাঁচ বছর কাটিয়ে এসেছি লণ্ডনে ; আমি জানব না ওদের স্বভাব-চবিত্র। সেদিনই বলেছিলাম তোমাদের ; তখন কেউ আমার কথাকে আমলই দিতে চাইলে না। এবার বল, ঠিক বলেছিলাম কিনা ?

একসঙ্গে কয়েকটা কণ্ঠ বৃদ্ধকে সমর্থন জানাল। সকলেই একবাক্যে বলল, সত্যি, বৃটিশের কোন তুলনা নেই।

ওদিকে আকাশে চক্রাকারে প্লেনগুলো ঘুরে চলেছে তো ঘুরেই চলেছে। নিচের মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে ওরাও যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে জনতার অভিনন্দনের উত্তরে প্রত্যাভিনন্দন জানাচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে জনতার উচ্ছ্বাস মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে—অনেকে নিজের গায়ের জামা খুলে ওড়াতে থাকে আর চিৎকার করে বলে, লং লীভ ইন্দো-পোল ফ্রেণ্ডসীপ, লং লীভ। এগ্রেসর নাজী, সেম সেম।

মনে হয় কথাটা বিমানগুলোর চালকদের কানে যায়। তারা জনতার এমন স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে নিজেদের স্থির রাখতে পারে না। হঠাৎ গোত্তা মেরে নেমে আসে একেবারে মাটির কাছাকাছি।

অস্থির জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে—'ব্রিটিশ জিন্দাবাদ।'

কট্‌···কট্‌···কট্‌···কট্‌···কট্‌·········

মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কয়েক ডজন মানুষ। চোখের পলকে সারাটা এলাকা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল। আহতদের চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে জার্মান বিমানগুলো পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

এই আক্রমণে বাচ্চা ছেলেটাব বাবাও মারা গেছে। তার মৃতদেহের পাশে বসে ছেলেটার আজ বার বার বাবার একটা কথাই মনে পড়ছে, এখন পর্যন্ত ইউরোপের ম্যাপটাও ভাল করে চিনলি না।

সত্যি, এখনো ইউরোপের ম্যাপ ওর ঠিক মত চেনা হয়নি। শুধু ও কেন, পোল্যাণ্ডের কারোই চেনা হয়নি। চিনলে সবাই বুঝতে পারত, ব্রিটেন-ফ্রান্স বাড়ীর কাছে নয় যে হুট করে গাড়ীতে চেপে চলে আসবে। অতদূর থেকে আসতে সময় লাগে না বুঝি?

নিশ্চয়। কে বলেছে লাগে না? দরকার হলে দু'চার বছরও লেগে যেতে পারে। এমনকি সারাজীবন লেগে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পোল্যাণ্ডের বেলাও তাই লাগল। সারাজীবনেও আর বৃটিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছতে পারল না। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষেও না।

তখনও বিস্ময়ের অনেক কিছু বাকী ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য অনেক নতুন অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল।

সেটা সম্পূর্ণ হল সতেরই সেপ্টেম্বর।

দুনিয়া শুদ্ধ লোক হতবম্ব হয়ে শুনল, রুশ সীমান্তের দিক থেকে রাশিয়ার লালফৌজ পোল্যাণ্ডের মূলভূমিতে ঢুকে পড়েছে।

কারণ?

কারণ—পোল্যাণ্ডে বসবাসকারী রুশ নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে হবে তো !

বোঝা গেল, কথামালার নীতিবাক্য আজও এতটুকু পুরানো হয়নি। সত্যি সত্যিই আজো শঠের কখনো ছলের অভাব হয় না।

রাশিয়ারও তা হল না। সে পরম নিশ্চিন্তে আক্রমণটাকে নিতান্ত কর্তব্য বলে চালিয়ে দিল।

এর কদিন পর সাতাশে সেপ্টেম্বর জার্মানী এবং রাশিয়া যৌথভাবে ইতিমধ্যেই হতবাক বিশ্ববাসীর সামনে আরো এক নতুন খেলা দেখাল।

ঐ দিনই ওয়ারস সরকারীভাবে আত্মসমর্পন করে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভাগ বাটোয়ারা। শিল্পকেন্দ্র আর কয়লার খনিগুলো যায় জার্মানীর ভাগে। রাশিয়া পায় পোলিশ ইউরোপের গমের ক্ষেত আর তেলের খনি।

সেই প্রথম শুরু।

তারপর কয়েক মাসের বিশ্রাম। কারণ শীত পড়ে গেছে।

তাছাড়া অন্য একটা বাস্তব অসুবিধাও আছে। ঠিক এই মুহূর্তে হাতের কাছে তেমন কোন রেডিমেড অজুহাতও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা যা নিয়ে এখনি কারো ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া যেতে পারে।

সুতরাং শুরু হল অনুসন্ধান।

যেহেতু আধুনিক যুগে কোন কারণ না দেখিয়ে কারো দেশ আক্রমণ করাটা নিতান্তই অসভ্যতা, সেহেতু আক্রমণের জন্য একটা যুৎসই কারণ চাই-ই চাই। তাছাড়া সভ্য জার্মানীর পক্ষে কোন রমক অসভ্যতা করাটাও ঠিক মানায় না। তাতে দুনিয়াবাসীর সামনে প্রেষ্টিজ হ্যাম্পার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই একটা যুৎসই কারণ আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত হল গবেষক। যে করেই হোক আক্রে কারণ বের করতে হবেই। তা না হলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না।

আশার কথ, মহামান্য ফ্যুয়েরারকে এই একটা সাধারণ ব্যাপারের জন্য খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। সুদক্ষ প্রচার সচিব ডঃ যোশেফ গোয়েবলসের ক্যারামতিতে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মোক্ষম কারণ আবিস্কৃত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুবে শুরু হয়ে গেল সাজ সাজ রব। বার্লিন রেডিওর কর্মচারীদের খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শুধু প্রচার আর প্রচার। একটা কথা বার বার বলে যাও, হাজার বার বলে যাও, তা হলে মানুষ তো কোন ছাড় স্বয়ং ভগবানও সে কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন।

তাছাড়া এ যেমন তেমন কথা নয়; এ যে একেবারে খোদ জার্মানী আক্রমণের পরিকল্পনা! এত বড় সাহস ঐ লাল মুখোদের! নিজের প্রচার সচিবের তৈরী কারণের কথা শুনে রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন জার্মান ভাগ্যবিধাতা এডলফ হিটলার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক তিনি ওদের শিক্ষা দেবেনই।

কিন্তু অভিযোগটা কি?

খুব সোজা, ওরা ষড়যন্ত্র করছিল।

কারা?

কারা আবার কি! আজকের দুনিয়ায় বৃটেন আর ফ্রান্স ছাড়া কে এমন মুর্খ আছে যে প্রবল প্রতাপান্বিত জার্মানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মত দুঃসাহস দেখাবে!

তাও তো বটে!

অতএব আর দেরী নয়, কুইক মার্চ। চল নরওয়ে, নরওয়ে চল।

সেকি! ষড়যন্ত্র করল বৃটেন এবং ফ্রান্স, আর সৈন্যদল চলল

নরওয়েতে। এ কেমন বিচার তোমার শাহেন-শা ?

মুচকী হাসলেন ফ্যুয়েরার। বললেন, বুঝলে না, ষড়যন্ত্র বৃটেন আব ফ্রান্স যৌথভাবে করেছে ঠিকই। কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে সেটা তারা কোথায় বসে করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেবের দল বলল, তাও তো বটে। কর্তা তো ঠিকই বলেছেন।

সেই জন্যই তো নাজী বাহিনী চলেছে নরওয়ে। ওখানকার নাভিক বন্দরে বসেই তো যত সব প্যাচ কষা হয়েছে। তাই যতক্ষণ না আমাদের সৈন্যদল নাভিকে পেঁছিচ্ছে ততক্ষণ আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব না ; যতক্ষণ না আমরা তাদের চুড়ান্ত শিক্ষা দিতে পারছি ততক্ষণ আমাদের পুর্বপুরুষদের অতৃপ্ত আত্মা জার্মানীর আকাশে বাতাসে হাহাকার করে ঘুরে ফিরবে ; যতক্ষণ না পরাজিত নরওয়ে-বাসীদের দিয়ে তাদের কৃতকর্মের জন্য সমগ্র জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করাতে পারছি, ততক্ষণ জার্মান জাতির দেহে আর্য রক্তের উত্তাল তুফান থামবে না।

বক্তা হিসেবে হিটলারের সুখ্যাতি চিরকালের। এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। যারা তার বক্তৃতা শুনল তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠল ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁত ভেঙ্গে দেবার নেশায়। আর যারা শুনল না, প্রচারের মাধ্যমে তারাও বলতে লাগল—নরওয়ের উচিত হয়নি ষড়যন্ত্রকারীদের ডেকে এনে নিজের দেশে এমনভাবে আশ্রয় দেওয়া। আগ বাড়িয়ে একবার যখন অপরাধ করেইছ তখন তার শাস্তি তো বাপু পেতেই হবে।

ঠিকই তো। ষড়যন্ত্রকারীকে শাস্তি না দিলে সে তো পরে মাথায় চড়ে বসবে !

সুতরাং শুরুতেই তাকে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া দরকার। অতএব··· কুইক মার্চ।

নয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' চল্লিশ।

তখনও পূর্ব দিগন্তে ঘুম ভাঙ্গা সূর্যের ঢুলু ঢুলু ভাব কাটেনি। গাঁয়ের চাষীরা কেউ সবে বিছানা ছেড়ে মাটিতে পা রেখেছে—কেউবা হয়তো একটু আগেই উঠে পড়েছে মুরগীগুলোর কর্কশ ডাক সহ্য করতে না পেরে। এমন সময় ঠিক কি হচ্ছে তা বুঝে ওঠার আগেই ছোট ছোট বর্ডার পোষ্টগুলোকে গুড়িয়ে দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কগুলো ঢুকে পড়ল ডেনমার্কের দক্ষিণ সামান্ত অতিক্রম করে। ওদিকে নৌ সেনাবাহিনীর অবতরণ শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন বন্দরে। দেখতে দেখতে এরো, নাইকোবিন, টোনডের, ডাইবরল প্রভৃতি বন্দর জার্মান সেনাবাহিনীর দখলে চলে গেল।

চোখের নিমেষে একটার পর একটা ডেনিস শহরের পতন ঘটতে লাগল। রাজা ফ্রেডরিক বুঝলেন, এ অবস্থায় এই উন্মত্ত সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেবার চেষ্টা করাটাও পাগলামি। তাতে নিজের সৈন্যদলের ধ্বংস ছাড়া আর কোন লাভই হবেনা। সুতরাং তিনি বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করতে মনস্থ করলেন। হাত তুলে বললেন, আমি স্যারেণ্ডার করছি; তোমরা আমার নিরীহ দেশবাসীকে মের না। আমরা সত্যিই শান্তিপ্রিয়। এত বেশী শান্তিপ্রিয় যে, তোমরা আমাদের দেশ দখল করলে, অথচ আমাদের কি অপরাধ তাও আমরা জানতে চাইছি না। শুধু দয়া করে আমাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাবটা গ্রহণ কর। তাতেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করব।

সত্যি, কি বিচিত্র বিচার! আসামী জানল না তার অপরাধ কি, অথচ ফাঁসির দড়িটা তাকে গলায় পড়ে নিতে হল।

ডেনমার্ক দখলের পর, ফ্যুয়েরারের রেডিও, দিন নেই, রাত নেই, চব্বিশ ঘণ্টা চিৎকার করে কেবল একই কথা বলে চলল, নাভিকে বসে আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং ফরাসীরা ষড়যন্ত্র করেছে ; ওরা আমাদের খতম করতে চায় ; ওরা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে ইউরোপের মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলতে চায়। ওদের এই ষড়যন্ত্রকে শুরুতেই উপড়ে ফেলবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের বীর সেনাবাহিনী নরওয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। যতক্ষণ না আমরা ষড়যন্ত্রের মুল কেন্দ্র নাভিক দখল করে ষড়যন্ত্রকারীদের সমূলে উচ্ছেদ করতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের এই ধর্মযুদ্ধ শেষ হবে না।

কর্তাভজার দল সঙ্গে সঙ্গে বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন ফ্যুয়েরার—নরওয়েকে শিক্ষা দিতেই হবে। পাজী, হতচ্ছাড়া নরওয়েজিয়ানদের যদি এখনি পিটিয়ে ঠাণ্ডা না করা হয় তাহলে একদিন ওরা জর্মানদের মাথায় চেপে বসবে। তখন ওদের সামাল দেওয়াই হয়ে উঠবে দায়।

'কিন্তু স্যার, একটা ব্যাপার তো কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না!'

'কি?'

'দোষ করেছে নরওয়ে, তাকে পিটিয়ে লাস বানান হচ্ছে, মারতে মারতে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে ছাড়া হচ্ছে এ সব তো বুঝলাম। কিন্তু নরওয়ের অপরাধে ডেনমার্কের মৃত্যুদণ্ড হল কেন, সেটা মোটেই ক্লিয়ার হচ্ছে না জনাব।'

হবে কি করে, ওটা যে আউট অব সিলেবাস।

তবে যাই বলনা কেন বাপু, নরওয়েজিয়ানদের হিম্মত আছে বটে। ডেনমার্কের মত ওরা অমন কাঁচা ছেলে নয় যে জার্মান গুণ্ডাগুলোর হাতে এক চড় খেয়েই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে।

ওরা বেশ গর্ব করেই বলে, আরে, আমরা হচ্ছি মরদ কা বাচ্চা। মরতে হয় তো সামনা সামনি লড়াই করে মরব। অমন মেয়েছেলের মত গুণ্ডার ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদব আর দরজায় ধাক্কা শুনেই 'তোমার পায়ে পড়ছি গো, আমায় ছেড়ে দাও গো' বলে মরা কান্না জুড়ে দেব এমন কাপুরুষের জাত আমরা নই।

তা ছাড়া ভয় কি? আমরা তো আর ডেনিসদের মত বিধবা নই যে চারকূলে আমাদের আপন বলতে কেউ থাকবে না। দুনিয়া জুড়ে আমাদের দোস্ত, ইয়ার, সাগরেদরা ছড়িয়ে রয়েছে। গলা উচিয়ে একটা হাঁক দিলেই হল—সবাই একসঙ্গে ছুটে আসবে হৈ হৈ, রৈ রৈ করে। তারপর আর দেখতে হবে না। মারের চোটে বাছাধনরা চতুর্দশপুরুষের নাম ভুলে যাবে। যত সব বদ-মাসের দল।

সুতরাং শুরু হল যুদ্ধ।

তুমুল যুদ্ধ।

দেখতে দেখতে কামান-বিমান-জাহাজের মেলা লেগে গেল চতুর্দিকে। ট্যাঙ্ক-টর্পেডো-ক্রুজার—কিছুই বাদ রইল না। সব এনে জড় করা হল একসঙ্গে। উত্তর সাগর পেরিয়ে হাজার হাজার নাজী বাহিনী এসে নামতে লাগল নরওয়ের মূল ভূখণ্ডে।

নরওয়ে মুখে যতই বলুক না কেন তারা জার্মানদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে যাবে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, তারা শুধু ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে। দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে লড়াই করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই।

দেখতে দেখতে একটার পর একটা শহর নাজীদের দখলে চলে যেতে লাগল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, রাজধানী অসলো থেকে মানুষজন গ্রামের দিকে পালাতে শুরু করল। বিমান আক্রমণের থেকেও সাধারণ মানুষের মনে তখন একটা ভয় মারাত্মকভাবে চেপে

বসল যে, নাজীরা হয়তো দু'একদিনের মধ্যে রাজধানীতে এসে পৌঁছে যাবে। তখন তাদের অত্যাচারে আর টেকা যাবে না। সুতরাং আগে থাকতে পালিয়ে গ্রামে চলে গেলে হয়তো কিছুটাও ইজ্জত রক্ষার সম্ভাবনা আছে। অতএব—চল গ্রামে।

এদিকে যখন বন্ধুর এমন শোচনীয় অবস্থা, তখন আর ব্রিটিশ সিংহের পক্ষে চুপচাপ গুহার মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না। তা ছাড়া নরওয়ের মূল ভূখণ্ড থেকে ইংল্যাণ্ড খুব একটা দূরে নয়। কি জানি, জার্মানদের আর্য রক্ত এখন যেমন টগবগ করে ফুটছে তাতে কখন জাহাজের মুখ উত্তরের বদলে পূবদিকে ঘুরে যায় তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সুতরাং আগে থাকতে এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডিল করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া শেষ, অমনি শুরু হয়ে গেল গর্জন।

সে কি বিকট গর্জন! শুনলে মনে হয়, এখনি আকাশ ভেঙে পড়বে মাটিতে—আর মাটি উড়ে চলে যাবে আকাশে।

বৃটিশ ভেবেছিল বোধ হয় তার গর্জন শুনেই সেদিনকার ছোকরা এতলক মূর্চ্ছা যাবে। বাস্তবে হয়তো তাকে গুহা ছেড়ে বের-ই হতে হবে না।

কিন্তু একি! মূর্চ্ছা যাওয়া তো দূরের কথা—ছোকরাটা যে আবার উল্টে তাদেরকেই হুমকী দিচ্ছে। বলছে কি না এক পা এগোলে দাঁত ভেঙে দেবে।

তবে রে, পাজি নচ্ছার।

এক লাফে গুহা থেকে বেরিয়ে এল পশুরাজ। এমন অপমান আর কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করা যায় না। একটা চ্যাংড়া ছোকরার জন্য সারা দুনিয়ায় বৃটিশের প্রেষ্টিজ যেতে বসেছে। এমন কি কোন কলোনীতেও আর মুখ দেখাবার উপায় নেই। ইণ্ডিয়ার

নেটিভ আদমীগুলোও আজকাল ওদের দেখে মুখ টিপে হাসে! আফ্রিকান জংলীগুলো পর্যন্ত সুযোগ পেলে বৃটিশের পৌরুষ নিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না!

না, এ কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব নয়। এ কলঙ্ক এবার ঘোচাতেই হবে। তাতে যদি জানও দিতে হয় তো কুছ পরোয়া নেহী। অপমানের প্রতিশোধ যে ভাবেই হোক একেবারে পাই টু পাই আদায় করে নিতে হবে।

.

দেখতে দেখতে ইংল্যাণ্ডের নৌ-বন্দরগুলো ফাঁকা হয়ে গেল। সারবন্দী জাহাজের উন্মত্ত দাপটে উত্তর সাগরের শান্ত জলরাশিতে তুফান উঠল। ইংল্যাণ্ডের সব থেকে গর্বের বস্তু রাজকীয় নৌবাহিনীর হাজার হাজার সেনার মুখ থেকে বের হল এক আওয়াজ—'লং লীভ দ্যা কিং, লং লীভ দ্যা কিং'।

ব্রিটিশ সিংহের আস্ফালন শুনে প্রথমে ফুঁয়েরার ভেবেছিলেন— এটাও বোধহয় সেই পোল্যাণ্ডের বেলা যেমন করা হয়েছিল তেমনই একটা ফাষ্টহ্যাণ্ড পাঁয়তারা। বিশ্ববাসীর সামনে মুখরক্ষার জন্য দু'একবার ষ্টেজ রিহার্সাল হয়েই ওটা যথাসময় বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু না। ক'দিনের মধ্যেই বোঝা গেল এটা রিহার্সাল নয়, রীতিমত পাবলিক পারফরমেন্স।

অর্থাৎ ডাইরেক্ট এ্যকসন।

দশই এপ্রিল একেবারে পাকা খবর এল; বৃটিশরা সত্যি সত্যিই এগিয়ে আসছে নরওয়ের দিকে। প্রিয়তম বন্ধুর এমন হৃদয় কাঁপান আর্তনাদ শুনে তারা আর বসে থাকতে পারেনি। প্রতিজ্ঞা করেছে, যে করেই হোক বন্ধুকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেই।

দেখতে দেখতে খবরটা নরওয়ের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। তাছাড়া বেডিও অসলো আছে না—সেটা তো এখনো নরওয়েজিয়ানদেব দখলেই। সুতরাং, সে ক্রমাগত চিৎকার করে চলল, হে ভীত সন্ত্রস্ত নরওয়েবাসী, দয়া করে ভয় পাবেন না। আমাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ব্রিটিশ আমাদেব এই চরম বিপদের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব সাহায্য করাব জন্য তাব বিশ্বজয়ী নৌ-সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে নরওয়েব দিকে। যতদূব খবর পাওয়া গেছে তাতে এ কথা জোব দিয়ে বলা যায় আব মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যেই আমাদেব বন্ধুবা নরওয়েব উপকূলে পৌঁছবেন। তাবপব দেখা যাবে, কাব কত মুবোদ; কে কত শক্তি ধরে।

বেডিওব ভাষ্যকাবের গলাব পর্দা ক্রমাগতই চড়তে থাকে—বন্ধুগণ, আমবা আপনাদেব বলে বাখছি, ব্রিটিশ বন্ধুবা এসে পৌঁছবার চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে এ দেশ হানাদাব মুক্ত হবেই হবে। তখন, নচ্ছার নাজীর দল পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মবার সুযোগও পাবে না। কাবণ, দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ নৌ-সেনাবা তাব আগেই সমগ্র উপকূল অঞ্চল ঘিবে ফেলবে। তাই বলছি, নার্ভাস হবেন না, নার্ভিক বন্দব দখলের জবাব আমরা নির্ভীকভাবেই দেব। শেষ নরওয়েজিয়ানের জান থাকা পর্যন্ত একটা জার্মানকেও জিন্দা ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। মারেব চোটে ওদের বাপের নাম ভুলিয়ে···

একি! এ যে জার্মান লাফটওফ।

বুম্···বুম্···বুম্··বুম্···

ওমা, রিলে ট্রান্সমিটাবটা যে ভেঙ্গে একেবারে চুবমার হয়ে গেল। শহরের চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কুটমারজাইগ স্ট্রীটের বিরাট লাইফ ইনসিওরেন্স বিল্ডিংটা বোমার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একেবারে মাটিতে মিশে গেছে। ধোঁয়ায় সব কিছু স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না।

প্রায় পনের মিনিট ধরে চলল জার্মান বোমারু বিমান লাফট-ওফের নারকীয় ধ্বংসলীলা। ওদের বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, যথাসময়ে সাইরেন বাজিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেবার জন্যও একটা লোক পাওয়া গেল না সেদিন সারা অসলো শহরে।

কাজ হাসিল করে লাফটওফগুলো যখন ফিরে গেল তখন অসলোবাসীদের রক্ত-কান্না আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া দেবার মত কিছুই অবশিষ্ট রইল না। শহরের বাইরে থেকে যতটুকু সাহায্য এল তা দিয়ে রক্তের দাগগুলোও ভালভাবে মোছা গেলনা।

তবুও মানুষের আশা যায় না। এত মার খাওয়ার পরও, দক্ষিণের বন্দর ক্লেকেফজোর্ড থেকে উত্তর সীমান্তের নর্ডকাইন পর্যন্ত যত নরওয়েজিয়ান আছে সবার মনেই এক আশা—এ্যয়সা দিন নেহী রহেগা—একবার বৃটিশ এসে পৌঁছতে পারলে হয়। তখন, হুঁ হুঁ বাবা, পালিয়ে বাঁচবার পথ পাবে না বাছাধনেরা।

একদিন যায়, তুদিন যায়, তিনদিন যায়—কিন্তু ব্যাপার কি, ব্রিটিশের টিকিটিও যে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠল। পোল্যাণ্ডের মত হবে না তো! সেবার যেমন বেচারারা অপেক্ষা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেল, অথচ ব্রিটিশের একটা ছ্যাকড়া গাড়ীও গিয়ে সেখানে পৌঁছল না।

একজন বলল, 'না, না, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কোথায় পোল আর কোথায় আমরা। আমাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের দোস্তি কি আজকের। পোলরা তো সেদিনকার ছোকরা হে—কয়েক দশক আগেও ওদের অস্তিত্বই ছিল না তুনিয়ায়।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। কথাটা ঠিকই বলেছেন। পোল আর আমরা কি এক হলাম।'

সত্যি, কথাটা হানড্রেড পার্শেণ্ট খাঁটি। পাঁচদিনের মধ্যেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

সেদিনটা পনেরই এপ্রিল। একাদশীর চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়াতে খুব বেশী দূরে দৃষ্টি যাওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং এই তো সুযোগ।

দেখতে দেখতে পর পর কয়েকটা বৃটিশ জাহাজ এসে দাঁড়াল ইগারসুণ্ড, বোকেনপ-এর আশে পাশে সমুদ্র উপকূল ঘেঁষে। সৈন্যদল টপাটপ নেমে পড়তে লাগল ছোট ছোট ডিঙ্গীতে। সেখান থেকে সোজা তীরে।

খবর শুনে চারদিকে সে কি উল্লাস, সেকি উচ্ছাস। সবার মুখে এক কথা—মার কা বদলা মার হ'য়। একটা নাজীকেও আর জিন্দা ফিরে যেতে দেব না।

এই আনন্দোৎসবের মধ্যেও দু'একজন বেয়াড়া টাইপের লোক ফস করে একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল। জানতে চাইল, ব্রিটিশরা তো সেই দশ তারিখে রওযানা দিয়েছে, কিন্তু মাত্র এটুকু পথ আসতে তাদের পাঁচদিন লেগে গেল কেন?

একজন বলল, 'বোধ হয ওনারা ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই।'

মুখরক্ষা করার জন্য একজন ব্রিটিশ জবাব দিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল অন্য।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী যখন 'লং লীভ দ্যা কিং' গাইতে গাইতে প্রবল বিক্রমে উত্তর সাগরের বুক কাঁপিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে তখন হঠাৎ কো ্থেকে একগাদা জার্মান যুদ্ধ জাহাজ এসে হাজির। পথ আটকে বলল, ঘরের ছেলে ভাল মত ঘরে ফিরে যাও; বৌ-ছেলে মেয়েকে নিয়ে ফূর্তি কর গে। এ দিকে আর

এক পাও এগিও না। যদি এগোও তাহলে হাড-মাংস এক করে দেওয়া হবে।

কি! এত বড় কথা! প্রথম মহাযুদ্ধে অমন মার খেয়েও তোমাদের শিক্ষা হয় নি বেহায়া। আবাব আমাদেব উপব চোখ বাঙাচ্ছ। ঠিক হায়, কে কত বড বাপের বেটা দেখা যাক।

ব্রিটিশ অধিনায়ক তার দলবলকে হুকুম দিলেন, 'আগে বাড়ো।'

দ্রাম-দ্রুম-দ্রাম· · ·

কট্···কট· ·কট·· কট্·

দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। কামান, ষ্টেনগান, ব্রেনগানের আওয়াজে আকাশে ঝড় উঠল—সমুদ্রেব তলে তিমি, হাঙ্গব থেকে চুনোপুঁটিবাও পর্যন্ত ভয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ধরে চলল দু'দলেব হাড কাঁপিয়ে দেওয়া লড়াই। সকাল থেকে দুপুব, দুপুব থেকে বিকেল—লড়াই চলেছে তো চলেছেই। এর যেন আব বিবাম নেই। দেখে মনে হল যুগ যুগান্ত ধরে চলবে এ লড়াই—যতদিন পৃথিবী থাকবে, যতদিন ব্রিটিশ থাকবে, যতদিন জার্মান থাকবে, ততদিন এ লড়াই থামবে না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল, তবু দু'পক্ষেবই কামান গর্জে চলেছে এক নাগাড়ে। মনে হচ্ছে ওদের কামানের গোলাব প্রচণ্ড আঘাতে ধরিত্রী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে। সেখান থেকে ভয়ার্ত মুখ নিয়ে মাতা বসুমতী এসে দাঁড়াবেন ওদের সামনে। হাত জোড় করে মিনতির সুরে দু'দলকেই বলবেন, বাছা, অনেক হয়েছে, এবাব ক্ষ্যান্ত দাও।

মাতা বসুমতীর কথা শুনে দু'দলই অট্টহাস্য করে বলে উঠবে—চোপরহ বে শরম ঔরত। হঠ যাও সামনা সে পুরুষ মানুষেরা ঝগড়ার মধ্যে তুমি বাপু মেয়েছেলে হয়ে মাথা গলাতে এসেছ কেন—যাও, বিরক্ত কোর না। যতত্ সব।

ওদিকে পশ্চিম আকাশের কোল ঘেঁষে আগে থাকতে কাউকে কিছু না জানিয়ে আগুনের গোলার মত দেড় হাত ব্যাসের বিরাট সূর্যটা হঠাৎ জলের তলে টুপ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চতুর্দিকে নেমে এল ঘন অন্ধকার। দশ হাত দূরের জিনিষকেও আর এখন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক আবার আলোয় আলোয় ছেয়ে গেল। সব কিছু এখন দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক মাইল দূরের জিনিস দেখতেও আর কারো এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না।

এই আশ্চর্য ঘটনায় সবার মুখেই জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। সবাই জানতে চাইলে, কি ব্যাপার? কি হল? হঠাৎ অত আলো কেন?

ব্রিটিশ অফিসার কাচু মাচু মুখ করে বললেন, 'আমাদের যুদ্ধ জাহাজ 'হার্ডি' আর 'হান্টারে' আগুন লেগেছে। জার্মানরা ও দুটোর একেবারে মোক্ষম জায়গায় গোলা ফেলেছে। জাহাজ দুটোকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না—ও দুটো ডুববেই।'

'কিন্তু বাকীগুলো?'

'বাকীগুলোর যা অবস্থা, তাতে মাঝ সমুদ্রের মাঝে বেশীক্ষণ থাকলে এগুলোকেও আর ভাসিয়ে রাখা যাবে না—এর প্রত্যেক-টাতেই কম বেশী কিছু না কিছু আঘাত লেগেছে।'

তা হলে উপায়? এখন কি করা যায়?

ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার মুখ বুজে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলেন। তারপর হুকুম দিলেন, 'গো ব্যাক টু দ্যা ফাদারল্যাণ্ড।'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল দৌড়। দেখতে দেখতে সব কটা জাহাজের মুখ ঘুরে গেল উল্টো দিকে। সবাই মনে মনে বলল, অনেক শিক্ষা হয়েছে বাবা, এবার যে কটা পৈত্রিক জান অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি। উঃ, কি সাংঘাতিক একটা জাত এই জার্মানরা।

সে যাই হোক, ব্রিটিশ বাহিনীর উপকূল এলাকায় অবতরণের সংবাদটা কিন্তু জার্মানদের কাছে মোটেই গোপন রইল না। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিশেষ তৎপরতা। খবর চলে গেল খোদ বার্লিনে।

খবর শুনে ফ্যুয়েরার রাগে ফুঁসতে লাগলেন। কি এত বড় সাহস ঐ লালমুখো বানরদের! মাত্র তিনদিন আগের আড়ং ধোলাইয়ের কথা এর মধ্যেই ভুলে গেল! পাজী, নচ্ছার, বেহায়া। ঠিক আছে, কেমন করে জন্মের মত শিক্ষা দিয়ে দিতে হয় তা আমি ভাল করেই জানি।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল, 'পুট মি টু দ্যা ওয়র কম্যাণ্ড?'

ওয়র কম্যাণ্ডের উত্তর এল, 'জি, হুজুর?'

'নর্দান কম্যাণ্ডের লাইট ডিভিসনকে বল এখনি জাহাজে উঠতে। একটা ব্রিটিশও যাতে পালাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। যেটাকে সামনে পাবে কোতল করে ছাড়বে।

যথা আজ্ঞা মহারাজ।

দেখতে দেখতে আজ্ঞাপালনের হুকুম চলে গেল নর্দান কম্যাণ্ডে। জাহাজ ভর্তি নতুন সেনাবাহিনী এগিয়ে চলল ইগারসুণ্ড, বোকেনথ-এর দিকে।

শুরু হল তুমুল লড়াই। একেবারে হাতাহাতি লড়াই।

সেদিনকার হাফপ্যাণ্ট পরা জার্মান বাহিনী এরমধ্যেই যে ফুল প্যাণ্ট পরে এমন লড়াই করতে শিখে গেছে, সেটা ব্রিটিশ জানবে কি করে। যখন জানল, তখন আর তার করার কিছুই নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে লড়াই শিখে এসে যে তারা লড়াই করবে সে সময়ও হাতে নেই। অতএব, চল, চল, ফাদারল্যাণ্ড চল।

সত্যিই তো, বিদেশ বিভুয়ে, কোথাকার কে নরওয়েজিয়ান—

তাদের জন্য লড়াই করে জান দেওয়ার কোন মানে হয়! ওরা যদি নিজেরাই নিজেদের দেশ রক্ষা করতে না পারে তবে আমাদের কি ঠেকা পড়েছে বাপু তোমাদের হয়ে মার খেতে আসার?

না, অনেক হয়েছে, এবার জাহাজে ওঠ। ভাল ছেলের মত বাড়ী ফিরে চল বাছা। ঘরে ছেলে, বৌ হাঁ করে বসে রয়েছে পথ চেয়ে—এখন আর এসব তামাসা মোটেই ভাল লাগে না।

সত্যি, তামাসা-ই তো বটে। সেই কোন সমুদ্র-পাড় থেকে ব্রিটিশ এল নরওয়েজিয়ানদের ফাদারল্যাণ্ড বাঁচাতে, আর ওরা কিনা বলছে ফাদারল্যাণ্ড জাহান্নমে যাক, আগে নিজেরা বাঁচি। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ ঘেন্নায় মরে যাই বাপু। এমন স্বার্থপর জাত আর দুনিয়ায় দুটো নেই। বাপো।

কথাটা ঠিকই।

ব্রিটিশদের চম্পট দানের সঙ্গে সঙ্গে রাজা হাকনও তাঁর মন্ত্রীসভার দুলালদের নিয়ে পাড়ি দিলেন উত্তর সাগরে। দু'দিন পরেই এসে হাত জোড় করে হাজির হলেন লণ্ডনের বার্মিংহাম প্যালেসে। মুখে শুধু একটি মিনতি—বৃদ্ধ বয়সে এই অভাগাকে যেন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে না হয় স্যার, দয়া করে শুধু সেটুকু দেখবেন।

রাজা হাকনের আবেদন মঞ্জুর হল। ইংল্যাণ্ড-রাজ ষষ্ঠ জর্জ হাত তুলে বললেন, তথাস্তু

ভাবে গদগদ হয়ে মন্ত্রীসভার দুলালেরা বললেন—রাজা দীর্ঘজীবি হোন, লং লীভ দ্যা কিং।

পড়ে রইল দেশ, পড়ে রইল দেশবাসী। রাজা যে স্বয়ং নাজীদের হাতে আড়ং ধোলাই না খেয়েই দেশ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন, তাতেই যথেষ্ট। কারণ, রাজা নিজে বাঁচলে তবেই না রাজত্ব।

নরওয়েবাসীদের সেই ছুদিনে, প্রতিহিংসাপরায়ণ জার্মান সেনা-বাহিনীর হাতে স্বদেশবাসীর জীবন, সম্পত্তি যাতে ধ্বংস না হয়, সে কথা চিন্তা করে জার্মান সেনা-নায়কদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশ শাসনের ভার নরওয়েজিয়ানদের হাতেই রেখে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে একজন নরওয়েজিয়ান সৈনিক নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই অসম সাহসিক সৈনিকের নাম মেজর ভিডকুন কইসলিং।

বহু আলাপ আলোচনার পর মেজর কুইসলিং জার্মানদের রাজী করালেন একটা দেশীয় সরকার গঠনের অনুমতিদানের জন্য। তাঁর যুক্তিগুলো এত ধারাল ছিল যে জার্মানদের পক্ষে সেগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথও ছিল না।

ব্রিটিশ এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কানে যখন কথাটা গেল, তখন তারা সারা ছুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল।

বি. বি. সি-র সদর দপ্তরে কাজের সুবিধের জন্য তো একটা টেপ রেকর্ডই তৈরী করে ফেলা হল। সকাল নেই, ছুপুর নেই, রাত নেই—সেটা ক্রমাগত বেজে চলল, 'বেইমান কুইসলিং', 'বেইমান কুইসলিং', 'বেইমান কুইসলিং' আবৃত্তি করে।

সেদিন ব্রিটিশ প্রচারের ধার এত বেশি ছিল যে সারা ছুনিয়ায একটা লোকও তাদের কাছে আসল কথাটা জানতে চাইল না। কেউ প্রশ্ন করল না সত্যিকারের কুইসলিং কে? যে তাঁর দেশবাসীকে এতবড় বিপদের দিনে নাজীদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সেই মেজর ভিডকুন কুইসলিং না রাজা হাকন, যিনি সমগ্র দেশবাসীকে নাজীদের প্রতি-হিংসার ক্ষুধার সামনে ফেলে রেখে নিজের অমূল্য জানটাকে বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিদেশে?

সেদিন সত্য কথাটা কেউ জানতে চায়নি বলে, পরবর্তী কালে যাকে তাকে কুইসলিং বলাটা ইংরেজদের একরকম স্বভাবেই দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। ভার্দুন বিজয়ী নব্বই বছরের বীর মার্শাল পেঁতা থেকে শুরু করে ভারতবাসীর মাথার মণি সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত কাউকেই তারা কুইসলিং বলতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেনি। যার সঙ্গেই তাদের মতের অমিল হয়েছে, যারাই তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধীতা করেছে, তাদেরই তারা ঐ এক নামে গাল দিয়েছে—কুইসলিং, কুইসলিং, কুইসলিং।

ইংরেজ যখন সারা দুনিয়া জুড়ে যাকে তাকে কুইসলিং বলে গাল দিয়ে গলা ফাটাচ্ছে তখন ওদিকে বার্লিন কিন্তু একেবারে চুপ চাপ। বাইরে থেকে কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়—ওখানে কি হচ্ছে।

দু'দুটো অভিযানে অসাধারণ সাফল্যলাভ করে সমগ্র জার্মান জাতির মনে তখন সে কি উচ্ছ্বাস। দক্ষিণের মিউনিক থেকে উত্তরের কিয়েল, পূবের কোলন থেকে পশ্চিমের ড্রেসডেন—যেখানেই যাওয়া যাক না কেন সবার মুখে শোনা যাবে এক কথা—কেমন, ব্রিটিশের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি না এবার। আর কোনদিন আসবে বাছাধনেরা আমাদের সাথে পায়তারা কষতে।

জার্মান চান্সেলারীতেও তখন উচ্ছ্বাসের জোয়ার কম নয়। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে বিজয় উৎসব পালিত হচ্ছে। কাউকে না কাউকে বিশেষ পদক দেওয়া হচ্ছে—কোন না কোন বিশেষ অতিথির আপ্যায়ন চলছে।

ফ্যুয়েরার হের হিটলার থেকে তাঁর আর্দালি পর্যন্ত সকলেরই আজকাল কথাবার্তা, চাল-চলনে কেমন যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কেউ আর আগের মত তেমন হাল্কা সুরে কথা বলে না; তেমন সাধারণভাবে চলা ফেরা করে না। সবার মুখ গম্ভীর। দেখে মনে হয় সকলেই যেন জাতির ভবিষ্যত চিন্তায় খাওয়া দাওয়া

ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু চিন্তাটা কি? সব কাজ ফেলে সারাদিন এত সলা-পরামর্শই বা কিসের?

শেষে একদিন আসল কথাটা সবার সামনে ভেঙেই বললেন ফ্যুয়েরার, 'এবার একটু প্যারিসে যেতে বড্ড মন চাইছে।'

'কেন?'

'কেন কি হে। সেই প্রতিজ্ঞাটা তোমাদের মনে নেই?'

'কি প্রতিজ্ঞা?'

'হায় রাম! তোমাদের মত লোকদের নিয়ে দেশ শাসন করছি আমি!'

'অপরাধ নেবেন না জনাব, সবসময় সব ব্যাপার মনে রাখা আমাদের মত মূর্খের পক্ষে কি সম্ভব?'

একটু হাসলেন ফ্যুয়েরার। সত্যিই তো, ওদের ব্রেন তো আর আমার মত নয় যে, একবার একটা কথা মাথায় এলে সারা জীবন ধরে সেটাই পোঁকার মত দিনরাত ঘিলুটাকে কুড়ে কুড়ে খাবে। তাছাড়া ব্যাপারটা তো আজকের নয়। এক এক করে বাইশটা বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে। বাইশটা অভিশপ্ত বসন্ত পার হয়ে গেছে দেখতে দেখতে।

এ সেই উনিশ শ' উনিশের কথা।

প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে আর এক নতুন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কোন অস্ত্র নেই—আছে বুদ্ধি। তরবারি নেই—আছে কলম। এ কলম দিয়ে দিনের পর দিন যুদ্ধ চালালেও আপাতদৃষ্টে কেউ মারা যাবে না, কিন্তু মানসিক দিক থেকে মৃত্যু ঘটবে অনেকের। কেউ তা জানতে পারবে না—কেউ তা বুঝতে পারবে না।

এই অদ্ভুত যুদ্ধের নাম আদর করে দেওয়া হয়েছে শান্তির যুদ্ধ —দ্যা ওয়র অব পিস। জার্মানদের মতে—প্রতিশোধের যুদ্ধ।

এ যুদ্ধের শুরু হয়েছিল আঠারই জানুয়ারী, প্যারিসে।

ঐদিন প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ এক রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিল। সাধারণ লোকের কাছে যাতে ব্যাপারটা সহজ বোধ্য হয় সেজন্য বেশ কায়দা করে এই সম্মেলনের গালভরা নাম দেওয়া হয়েছিল—শান্তি সম্মেলন। প্যারিস শান্তি সম্মেলন।

এই সম্মেলনে জার্মানী, অস্ট্রীয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়া বা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন প্রতিনিধিকে দেখা গেল না। যদিও মুখে বলা হল এ সম্মেলন সকলের।

সম্মেলনকে পরিচালনা করবার জন্য প্রথমে মিত্রপক্ষের দেশগুলো থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এক 'দশজনের পরিষদ' গঠন করা হল। পরে সে পরিষদকে ছোট করে এনে 'চারজনের পরিষদ গঠিত হল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ইতালী সে পরিষদ থেকে বেরিয়ে এলে পর ওটা মূলতঃ 'তিনজনের পরিষদ'-এ পর্যবসিত হল।

এই তিনজনের পরিষদের তিন বত্ন হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মহামান্য উড্রো উইলসন, ইংলণ্ডের ধূর্ত প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জেস ইউজিন ক্লেমেঁশো।

বহু চেষ্টা চরিত্রের পর সারা বিশ্বে আর যাতে কখনো শান্তিভঙ্গ না হয় সেই মহান উদ্দেশ্যে রচিত হল এক আশ্চর্য শান্তির শর্তাবলী। এই শর্তাবলী শোনার জন্য ভাগ্যের পরিহাসে পরাজিত জার্মানীর প্রতিনিধি কাউন্ট ভন্ ব্রকডফ রানাৎসাওকে সম্মেলন কক্ষে ডেকে পাঠালেন মঁসিয়ে ক্লেমেঁশো। ডাক পেয়ে যথাসময়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলেন রানাৎসাও।

বলির পাঁঠাকে যথাযথ আদর আপ্যায়ন করে ক্লেমেঁশো তাঁর হাতে দুশো ত্রিশ পাতার এক শান্তিচুক্তির খসড়া প্রস্তাব তুলে দিলেন। দেবার সময় মুচকি হেসে বললেন, 'আমাদের দাবি কেমন

কিছু একটা বেশি নয়, যৎসামান্যই বলতে পারেন। আপনাদের যাতে খুব বেশি অসুবিধের মধ্যে পড়তে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমরা এই শর্তাবলী তৈরী করেছি। আশা করি, দু-চার দিনের মধ্যেই আপনি এটা সই করে দেবার জন্য আমাদের দপ্তরে আবার উপস্থিত হবেন।

ক্লেমেঁশোর বিনয়াবনত বাচন ভঙ্গীতে অভিভূত হয়ে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রানাৎসাও

সেটা ছিল মে মাসের শেষ সপ্তাহ।

অন্যান্য বারের তুলনায় সেবার যেন গরমটা একটু বেশীই পড়েছিল। প্যারিসে এমন গুমট গরম খুব কমই দেখা যায়।

নিজের ঘরে ফিরে রানাৎসাও কোটটা খুলে ফেললেন। টাইয়ের নটটাও আলগা করে দিলেন।

এবার যেন ভদ্রলোক একটু হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। বাব্বাঃ, যা গরম পড়েছে। বেশীক্ষণ টাই কোট পরে থাকলে হয়তো দম আটকেই মরতে হবে।

শরীরটাকে শোফায় এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন রানাৎসাও। তারপর ক্লেমেঁশোর দেওয়া ফাইলটা তুলে নিলেন হাতে। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন লাল মলাটটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে টাইটেল পেজটা উল্টে চোখ বোলাতে শুরু করলেন মূল বয়ানের উপর।

বোধহয় মিনিট খানেকও যায়নি ; এরমধ্যে কখন যে তিনি সোজা হয়ে বসেছেন তা তাঁর নিজেরও খেয়াল হয়নি।

এতক্ষণ কোট-টাই পড়ে ভদ্রলোক হাফিয়ে উঠেছিলন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘামে ভিজে জব জব করছিল। গরম সহ্য করতে না পেরে শেষে কোটটাও খুলে ফেলেন। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যে

যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল ; দেখতে দেখতে গায়ের ঘাম শুকিয়ে সাফ ; উল্টে শীত করতে লাগল, তাঁর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে শুরু করল।

দলিলটা পড়তে পড়তে রানাৎসাওর চোখ ছুটো লাল হয়ে উঠল। চোখের পাতায জ্বালা শুরু হল। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। গলা শুকিয়ে এল। মনে হল বেশীক্ষণ আর এভাবে তিনি বসে থাকতে পরাবেন না।

ভদ্রলোক যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলেন। স্বগতোক্তিব মত বললেন, এ কি ! ওবা এসব কি লিখিছে ?

ওরা কি পাগল ! ওদেব কি মাথার ঠিক আছে ?

রানাৎসাওর ইচ্ছে হল, ফাইলটাতে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিযে দেন—পুড়িয়ে ছাই করে দেন এই শয়তানের খসড়াপত্রকে। চুক্তি ! সন্ধি ! ন্যায় বিচাব ! কেন এব থেকে তো সমগ্র জার্মান জাতটাকে ধবে এনে ফাঁসি দিলেই ল্যাঠা চুকে যায। তা না কবে এত ভনিতা কিসের ? কিসের শান্তি বৈঠক ? কাদের শান্তি ?

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন বানাৎসাও। তবুও নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত বেখে পড়ে যেতে লাগলেন খসড়াটা। একবার নয়, ছুবার নয়, তিন তিনবাব। নিজের অজান্তেই পড়ে ফেললেন দলিলটা।

শেষে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন—না, এ দলিলে নিজের হাতে তিনি কিছুতেই সই করবেন না, করতে পারবেন না। আর পারলেও করবেন না। তাতে যদি লুঠেরার দল ওর গর্দান নিতে চায় তো নিক। তারজন্য উনি এতটুকুও বিচলিত হবেন না। কিন্তু নিজের হাতে তিনি জার্মান জাতির মৃত্যুদণ্ডাদেশে সই করতে পারবেন না।

ছুদিন পরেই সম্পূর্ণ খসড়া পত্রটাই গ্রহণের অযোগ্য বলে

ক্লেমেঁশোর হাতেই ফেরৎ দিয়ে এলেন কাউন্ট রানাৎসাও। এরপর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না, প্রথম ফ্লাইটেই ফিরে গেলেন বার্লিনে। সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন রাষ্ট্রপতি ফ্রেডরিক এবার্টকে।

রানাৎসাওয়ের কথা শুনে রাষ্ট্রপতি এবার্টের মুখে যেন কালো মেঘের ছায়া নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন যুক্তি দিলেন। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হল ঐ খসড়ার কিছুটা পরিবর্তনের জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গকে অনুরোধ করা হবে। তারা যদি পরাজিতদের কথা অনুগ্রহ করে রাখে তো ভাল, না হলে ঐ চুক্তিতেই সই করতে হবে। কারণ চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করার একমাত্র অর্থ হবে আবার একটা নতুন যুদ্ধের মধ্যে দেশকে টেনে নিয়ে যাওয়া। জার্মান অর্থনীতির বর্তমানে যে পঙ্গু দশা তাতে আর একটা যুদ্ধ মানে—ইতিহাস থেকে জার্মান জাতির নাম চিরদিনের জন্য মুছে যাওয়া।

জার্মান মন্ত্রীসভার সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে দু'দিনের মধ্যে বার্লিন থেকে প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন নতুন প্রতিনিধি হের হারম্যান মুলার।

জার্মানীর অনুরোধে খসড়া চুক্তির কিছুটা হের ফের করে আর একটা নতুন চুক্তির শর্তাবলী তৈরী হল। নতুন প্রতিনিধির হাতে সেই চুক্তিপত্রের খসড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবশ্য একথাও শুনিয়ে দেওয়া হল, যদি পাঁচদিনের মধ্যে জার্মানী এই চুক্তিতে সই না করে তাহলে মিত্রশক্তি আবার বার্লিন অভিযান শুরু করতে বাধ্য হবে।

মৃতপ্রায় এক মুমূর্ষু জাতির কাছে ঐ হুমকীটুকুই ছিল যথেষ্ট।

ফলে এক হুমকীতেই আশাতীত কাজ হল।

আঠাশে জুন মৃতপ্রায় জার্মানীর বিক্ষুব্ধ আত্মার প্রতিনিধি হয়ে ক্যাম্পেন বনের নির্জন প্রান্তরে এক রেলগাড়ির কামড়ায় বসে ভার্সাই সন্ধিতে সাক্ষর করলেন হেব হারম্যান মুলার।

কদিন পরে ঠিক সেইখানে ফরাসী ভাষায় এক প্রস্তর ফলক স্থাপন করে লিখে দেওয়া হল: 'এখানে একটি স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানীর গর্ব খর্ব হয়েছে।'

সত্যি, কথাটা একবর্ণও মিথ্যে নয়।

ঐ চুক্তির ফলে জার্মানীর গর্বের যা কিছু ছিল, তার সবকিছুই তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হল। কোনটা ফ্রান্সের কাছে, কোনটা ইংল্যাণ্ডের কাছে আবার কোনটা পোল্যাণ্ডের কাছে।

ফ্রান্স পেল পশ্চিম আলসাস-লোরেইন, বেলজিয়াম পেল তিনটি প্রুশিয়ান প্রদেশ ইউপেন, ম্যালমেডি আর আর্চেন, লিথুয়ানিয়া পেল মেমেল বন্দর আর পোল্যাণ্ডের ভাগে পড়ল পোজেনের কিছুটা, পশ্চিম প্রুশিয়া, আপার সাইলেশিয়া এবং পূর্ব প্রুশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল। এছাড়া ডানজিগ জাতিসঙ্ঘের অধীনে এক 'স্বাধীন নগরী' হিসেবে ঘোষিত হল।

উত্তরের শ্লেসউইগ চলে গেল ডেনমার্কের হাতে আর আপার সাইলেশিয়ার এক অংশ পেল চেকোশ্লোভাকিয়া। তাছাড়া সারের বিখ্যাত কয়লাখনি অঞ্চল জাতিসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় পনের বছরের জন্য ফ্রান্সের অধিকারে দেওয়া হল।

এ খেলার শেষ শুধু এখানেই নয়। যুদ্ধের আগে আফ্রিকায় জার্মানীর যত উপনিবেশ ছিল সেগুলো বিজয়ী শক্তির মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তাছাড়া চীন, শ্যাম, তুরস্ক, সাইবেরিয়া, মরক্কো এবং মিশরের উপর তাঁর বিশেষ অধিকারও

হস্তচ্যুত হল।

কেবলমাত্র জায়গা কেড়ে নিলেই যে জার্মানীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পূর্ণ হল এটা বিজয়ী শক্তির কেউই স্বীকার করতে চাইল না। তাই তারা অন্যভাবে প্রতিশোধ নেবার শর্তও সন্ধিপত্রে জুড়ে দিল।

এই শর্ত অনুযায়ী মিত্রপক্ষের বেসামরিক জনসাধারণের ক্ষতি-সাধনের অপরাধে ক্ষতিপূরণ হিসেবে উনিশ শ' অষ্টআশি সাল পর্যন্ত জার্মানীকে বিভিন্ন কিস্তিতে মোট ছশো ষাট কোটি পাউণ্ড মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোকে দিতে হবে। তাছাড়া জার্মান সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা কখনই এক লক্ষের বেশী করা চলবে না এ শর্তও জুড়ে দেওয়া হল ঐ সন্ধিপত্রে। আর সমরাস্ত্র উৎপাদন? ওটা যতটুকু না হলে নয়, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাইরে এক পা-ও এগোলে আর নিস্তার নেই। বেয়াদবী কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না।

নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রথম দু'তিন বছর অতি কষ্টে ক্ষতি-পূরণের বার্ষিক কিস্তি শোধ করল। কিন্তু বাইশ সালে এমন অবস্থা হল যে কিস্তির টাকা যোগাড় করাই তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কলকারখানা সব বন্ধ, উৎপাদন নেই বললেই চলে—তার উপর মার্কের অভাবনীয় অবমূল্যায়ন। এ অবস্থায় তারা টাকা পাবেই বা কোথায়?

জার্মানীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখে ইংল্যাণ্ডের কঠিন মন কিছুটা গলল। সে চেষ্টা করতে লাগল একটা মধ্যপন্থা আবিষ্কারের জন্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সে এ ব্যাপারে আলোচনাও চালাল। কেউ কেউ তাতে কিছুটা নরম হতে রাজীও হল। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে নিয়ে। তারা জার্মানীর সঙ্গে কোন মীমাংসায়

আসতে চাইল না; উল্টে ফরাসী সৈন্যবাহিনী আগে থাকতে কাউকে কিছু না জানিয়ে জার্মানীর মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে শিল্পসমৃদ্ধ রূঢ় এলাকার বেশ কয়েকটা শহর দখল করে নিল। এই ঘটনার ফলে জার্মান জাতির আত্মমর্যাদাবোধে যে কি নিদারুণ আঘাত লাগল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে আঘাত তখন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া তাদের আর করবার কি-ই বা করার ছিল। তাই সার্কাসের চাবুক খাওয়া সিংহের মত তারা সব কিছুই নীরবে সহ্য করে গেল। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে ভুলল না, যদি কোন দিন ভগবান আমাদের দিকে আবার মুখ তুলে তাকান তা হলে আমরা এ অপমানের বদলা নেবই নেব।

সেদিনের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জার্মান জাতি পরবর্তী দিনগুলোতে একমুহূর্তের জন্যও ভোলে নি। গত সতের বছর ধরে অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তারা নিজেদের আবার একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। তাই, যখন বদলা নেবার সুযোগ এসে গেল, তখন তারা নিজেদের সংযত করে রাখতে পারল না। সব সময়ই ভাবতে লাগল, কখন অর্ডার হবে—কখন আমরা রওয়ানা হব; কখন বদলা নেব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে মিত্রশক্তির রাষ্ট্রগুলোর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, যার যত সৈন্য সংখ্যা তার পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনাও তত বেশী। আসলে এই ধরণার পিছনে কাজ করছিল প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। কারণ, সেবার কেবল ম্যান-পাওয়ারের জোরেই মিত্রপক্ষ অনেক ফ্রণ্টে শত্রুবাহিনীকে একেবারে নাজেহাল করে তুলে ছিল।

কিন্তু এদিকে ইতিমধ্যে জার্মানী যে যুদ্ধ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছিল এটা প্রথমে কারো মাথায়ই গেল না।

সকলে ভাবল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সরাসরি লড়াইতে নামলে জার্মানবাহিনী দেখতে দেখতে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অতএব ভাবনার কিছু নেই।

তাছাড়া ফ্রান্সের দিক থেকে আত্মতৃপ্তির আর একটা বিরাট কারণ ছিল ম্যাজিনো লাইন। আটশো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফ্রান্স—সুইজারল্যাণ্ড সীমান্ত থেকে মিউজ নদীর পূর্ব-পারে মণ্টিভেডি পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুর্গশ্রেণী জয় করার ক্ষমতা পৃথিবীতে কোন শক্তির আছে কিনা সন্দেহ। বাইরে থেকে এই দুর্গশ্রেণী যদি কয়েক বছরও অবরুদ্ধ হয়ে থাকে তবু তার কিছু যায় আসবে না। এর ভূগর্ভে মজুদ খাদ্য সামগ্রী এবং অস্ত্র দিয়েই সে শত্রুকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। বাইরে থেকে সাহায্য আনার কোন প্রয়োজন হবে না তার।

একথা যে ফ্যুয়েরার হিটলার জানতেন না, তা নয়। সে কারণে মনে মনে তিনিও বেশ চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তার থেকেও আর একটা ভাবনা গত বিশ বছর ধরে প্রতি মুহূর্তে তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; উঠতে-বসতে-শুতে তিনি কেবল সেই এক কথাই ভেবেছেন—কবে কাম্পেন বনের সেই প্রস্তর ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে বলতে পারবেন—না, জার্মান জাতির গর্ব এতটুকু খর্ব হয়নি—এই দেখ, সে আবার জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে আজ তার অপমানের সম্পূর্ণ বদলা নিতে পেরেছে। সে আবার প্রমাণ করেছে, 'ডয়েচ ল্যাণ্ড উইবার আলেস'; সকল দেশের চাইতে সেরা জার্মানী।

ফ্যুয়েরার ডেকে পাঠালেন তাঁর বাঘা বাঘা সেনাপতিদের। কোন রকম ভনিতা না করেই সোজাসুজি জানালেন তাঁর মনের গোপন ইচ্ছা—যে করেই হোক ফ্রান্স আমার চাই-ই চাই।

ফ্যুয়েরারের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন বাঘা বাঘা জেনারেলরা। সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এ যে এক অসম্ভব কথা ফ্যুয়েরার।'

'সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন আপনারা বুঝবেন। আমি শুধু বুঝি, ফ্রান্স আমার চাই। ওটা আমার চিন্তায় আলসারের মতো চেপে বসে আছে। আমাকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে বিশ বছর আগের সেই দিনগুলোর কথা, যেদিন আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হের মুলারকে দিয়ে জোর করে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল ভার্সাইয়ের মৃত্যুদণ্ডের দলিলে।'

কথাটা মিথ্যে নয়; কিন্তু ম্যাজিনো লাইনের ব্যাপারটার সমাধান করা যায় কি ভাবে? সবাই গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে বসলেন।

হঠাৎ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন জেনারেল ভন ম্যানস্টাইন। উত্তেজনায় চিৎকার করতে লাগলেন 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলে।

সবাই অবাক। একসঙ্গে পঞ্চাশটা চোখ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। অবশেষে একজন বিনীত স্বরে প্রশ্ন করল, 'জেনারেলের উত্তেজনার কারণটা জানতে পারি কি?'

'আমি পেয়েছি।' ম্যানস্টাইন হাফাতে হাফাতে বললেন।

'পেয়েছি শব্দটা আমাদের সকলের কানেই ইতিমধ্যেই কয়েকবার অনুপ্রবেশ করেছে, কিন্তু মাননীয় জেনারেল ঠিক কি পেয়েছেন সেটা এখনও জানার সৌভাগ্য হয়নি কারোই। দয়া করে যদি শব্দটাকে একটু এক্সপ্লেন করেন…।'

এতক্ষণে নিজেকে যথেষ্ট সামলে নিয়েছেন জেনারেল ম্যানস্টাইন। বললেন, 'আমরা অনয়াসেই ফ্রান্স দখল করতে পারব।'

কথাটা শুনে পঞ্চাশ জোড়া ভুরু একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে, সেটা জানতে পারি কি?'

'খুব সহজে।'

'তবু?'

'আমরা প্রথমে ম্যাজিনো লাইনের দিকে যাবইনা।'

'তা হলে আমরা কোনদিন ফ্রান্সেও পৌঁছব না।'

সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

'হাসবেন না,' ম্যানস্টাইন বললেন, 'আপনারা আগে আমার প্রস্তাব শুনুন। তারপরে নিজের নিজের মতামত জানাবেন।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল, 'স্বশরীরে যদি ফ্রান্সে পৌঁছতে না পারি, তবু জেনারেলের কল্পনার রথে চড়ে একটু ঘুরে আসতে দোষ কি?'

'এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়—আপনারা দয়া করে আমার পরিকল্পনাটা আগে শুনুন। তারপর যা মনে আসে বলবেন, আমি একটুও আপত্তি করব না।'

'ঠিক আছে, বলুন ; শোনাই যাক।' ভিড়ের মধ্য থেকে একজন সেনাপতির গলা শোনা গেল।

'আমার পরিকল্পনাটা হল,' 'ম্যানস্টাইন বললেন, 'আমরা ম্যাজিনো লাইনের দিকে মোটেই যাবনা, কারণ নিঃসন্দেহে ওটা দুর্ভেদ্য। সুতরাং আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা প্রথমে বেলজিয়াম আক্রমণ করব। বেলজিয়াম ক্ষুদ্র দেশ—সেটাকে দখল করতে খুব বেশি হলে সাতদিন সময় লাগবে। তারপর সেখান থেকে আর্দেনশ পর্বত পার হয়ে সোজা ঢুকে পড়ব ফ্রান্সে।'

'বাঃ চমৎকার !' একজন মন্তব্য করল, 'জেনারেলের পরিকল্পনাটাকে অবশ্যই তারিফ করতে হয়। কিন্তু আর্দেনশ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ভারী কামান, বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক ওপারে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে সেটা যদি জেনারেল একটু খোলসা করে বুঝিয়ে দেন তা হলে আমরা সকলেই একসঙ্গে পুলক বোধ করতে পারি।'

ম্যানস্টাইন বক্রোক্তিটা বুঝেও হজম করে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনাদের থেকে ফুয়েরার বিষয়টা আরো ভাল করে বুঝবেন—সুতরাং আমি তাঁকেই আমার পরিকল্পনার কথা জানাব।

আপনাদের মধ্যে যাদের এ ব্যাপারে কৌতূহল অদম্য তারা দয়া করে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ফ্যুয়েরারের কাছ থেকেই জেনে নেবেন।'

এই পরিকল্পনার কথা হিটলারের কাছে যথা সময়ে পেঁছল। তিনি কিন্তু প্রথমে এটাকে তেমন আমলই দিলেন না। পরে কি মনে হল—ফিল্ড মার্শাল গুডেরিয়ানকে ডেকে পাঠালেন এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানাবার জন্য।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমগ্র পরিকল্পনাটাকে খুঁটিয়ে বিচার করবার পর বললেন, 'অলরাইট। সব ঠিক আছে। নিখুঁত পরিকল্পনা। এটাকে নিয়ে এগোন যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র বেলজিয়াম নয়, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গের ভিতর থেকেও আমাদের এগোতে হবে।'

কিন্তু আপত্তি এল স্বয়ং সেনাবাহিনীর হাই কম্যাণ্ডের কাছ থেকে। তাদের মতে, এ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করাটাও হবে মুর্খামী। হয়তো মাঝপথেই অভিযান পরিত্যাগ করে ফিরে আসতে হবে জার্মান বাহিনীকে।

এদিকে হাই-কম্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্বেও গুডেরিয়ান কিন্তু বারবার ফ্যুয়েরারকে বললেন—বিষয়টাকে পুনর্বিবেচনা করে দেখবার জন্য।

অবশেষে ফ্যুয়েরার রাজি হলেন। আদেশ দিলেন, 'এগিয়ে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল, লেফট রাইট-লেফট ; লেফট্-রাইট।

সেদিন দশই মে, উনিশ শ' চল্লিশ।

হুড়মুড় করে জার্মান প্যানাৎসার বাহিনী ঢুকে পড়ল বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড আর লুক্সেমবুর্গের ভিতর। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ।

এ খবর যখন লণ্ডনে এসে পেঁছল, তখন হাউস অব কমন্স-এ

তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল। সব সদস্যই এক সঙ্গে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কে কি বলছেন তা জানবার জন্য আজ আর কারো অবকাশ নেই। তাছাড়া ইচ্ছেও নেই।

এদের মধ্যে যারা দলে ভারি তাদের দাবি হল, এই মুহূর্তে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। নরমপন্থী চেম্বারলেনকে দিয়ে চলবে না। চেম্বারলেন নিপাত যাক। আমরা নতুন প্রধানমন্ত্রী চাই। এমন প্রধানমন্ত্রী চাই, যিনি শক্ত হাতে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবেন। এরপর যদি চেম্বারলেনকে আর একদিনও গদাতে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে জাতির মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে জার্মানরা হয়তো খাস লণ্ডনেই হাজির হয়ে পড়বে।

কথাটা সত্যি।

তিন বছর আগে সাইত্রিশের আটাশে মে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন আর্থার নেভিল চেম্বারলেন। ভদ্রলোক প্রথম থেকেই হিটলারকে তোষণ করে কিভাবে সংযত রাখা যায় সে ব্যাপারে গভীর মনসংযোগ করেন। তাঁর আশা ছিল, এই পদ্ধতি কিছুদিন ঠিক মত চালাতে পারলে হিটলারকে তাঁর নিজের গণ্ডীর মধ্যেই বেঁধে ফেলা যাবে। তখন তিনি ইংল্যাণ্ডের উদারতায় ব্রিটিশ জাতির প্রতি ভাবে গদ গদ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ফল হল উল্টো। হিটলার চেম্বারলেনের দুর্বলতা ধরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দাবিগুলোরও যেন দিন দিন পাখনা গজাতে লাগল।

উনিশ শ' ছত্রিশের মার্চেই জার্মান সেনাবাহিনী রাইনল্যাণ্ড অধিকার করে নিয়েছিল। দু'বছর পর, আটত্রিশের মার্চে, অষ্ট্রিয়াও তাদের দখলে এসে গেল।

এত সব কিছু দেখা সত্ত্বেও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড দালা-

দিয়েরের মতই চেম্বারলেনও চোখ বুজে বসে রইলেন। হিটলার বুঝলেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম। ফলে তিনি আর এক নতুন দাবি তুললেন—চেকশ্লোভাকিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

দাবিটা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন চেকশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেস। তবু ভদ্রলোকের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো শেষ পর্যন্ত চেক জাতিব এই দুর্দিনে তাদের পুরান বন্ধু ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড এগিয়ে আসবে সাহায্যেব ডালি নিয়ে।

কিন্তু আশ্চর্য, প্রয়োজনেব মুহূর্তে এ দু'জনেব কেউই তেমন উৎসাহ দেখাল না। অবশ্য ছাতা হাতে বৃদ্ধ চেম্বারেলন দু'বার হিটলারেব সঙ্গে দেখা কবলেন একটা মীমাংসায় আসাব অনুবোধ নিয়ে। কিন্তু ফ্যুয়েরার তাব কথায় কানই দিলেন না। তিনি তাঁর নিজের দাবিতেই অটল বইলেন। চেম্বারলেনেব মুখেব উপর বলে দিলেন—অন্য কোন কথা শুনবনা—চেকশ্লোভাকিয়া আমার চাই-ই চাই।

হিটলাবের কাছ থেকে সোজাসুজি থাপ্পর খেয়ে অবশেষে ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চেম্বারলেন সাহেব আবেদন জানালেন ইতালীর ডিক্টেটর বেনিটো মুসলিনির কাছে। হাতজোড় করে বললেন, সাহেব এবার আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন। জার্মান ভাগ্যবিধাতাটি তো আপনার একেবারে প্রাণের দোস্ত; হয়তো তিনি আপনার কথা রাখতেও পারেন।

মুচকি হেসে মুসলিনি বললেন, 'আচ্ছা দেখি।'

অবশেষে চতুঃশক্তির এক বৈঠক বসল মিউনিকে, আটত্রিশের সেপ্টেম্বরে। এ বৈঠকে উপস্থিত রইল জার্মানী, ইতালী, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। কিন্তু যাকে নিয়ে এত ঝামেলা সেই চেকশ্লোভাকিয়াকেই দেখা গেল না সম্মেলন কক্ষের শত হস্তের মধ্যে।

কিন্তু ফল যা হবার তা ঠিক-ই হল।

হিটলারের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের

চুক্তিপত্রে সই করে ফিরে এলেন স্ব-স্ব রাজধানীতে। ওদিকে চুক্তির শর্তাবলী জানবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় চেকশ্লোভাকিয়ার সরকার পদত্যাগ করল। রাষ্ট্রপতি বেনেস-ও ক্ষোভে ও হতাশ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন নিরুদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বি বাধায় চেকশ্লোভাকিয়ার এগার হাজার বর্গমাইল এলাকা নিজ দ' পেয়ে গেল। এ ছাড়া বাকিটার বেশ কিছু এলাকা লুটের মা মত ভাগাভাগি করে নিল পোল্যাণ্ড আর হাঙ্গেরী। ফলে আস চেকশ্লোভাকিয়া তার ধর মুণ্ড হারিয়ে বেঁচে রইল শুধু বুকের হ ক'খানা নিয়ে।

দিনের পর দিন বিশ্বের তাবৎ ইতিহাস ঘেটেও যদি দেখা যায়, তাহলেও এমন আব একটা চমৎকার ভাগ বাটোয়ার নিদর্শন যে সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবেনা তাতে কোন সন্দেহ-ই নেই।

ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের নিবুদ্ধিতায় চেকশ্লোভাকিয়ার সমগ্র সুদেতেন এলাকা বিনাযুদ্ধে নিজের অধিকারে চলে আসায় হিটলারের পক্ষে সব থেকে বড় লাভ হল স্কোডার বিখ্যাত অস্ত্র কারখানা। এই বিশ্বখ্যাত কারখানাটা হিটলারের পাওয়া এলাকার মধ্যেই পড়েছিল। ফলে জার্মানী এখন পুর্ণদ্যমে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারল।

এই চুক্তির পর পুরো ছ মাসও কাটেনি, এমন সময় হঠাৎ খবর এল—জার্মান সেনাবাহিনী প্রাগে ঢুকে পড়ে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া দখল করে নিয়েছে। ফলে ভাগবাটোয়ারার পর চেক প্রজাতন্ত্রের যতটুকুও বা অবশিষ্ট ছিল সেটাও মুছে গেল ইউরোপের মানচি থেকে। অবশ্য এরপরও চেক জাতি, নামে একটা জাতি নামে বেঁ রইল ঠিকই, কিন্তু ইহুদীদের মত তাদেরও কোন দেশ রইলনা। তা নিজেদের পিতৃভুমি হারিয়ে হল যাযাবর অর্থাৎ বেওয়ারিস।

এদিকে বৃটিশ এবং তাব বন্ধুরা, যারা ক্রমাগত হিটলারকে তোষণ
নুর মাথায় তুলে দিযেছিল, তাদেব জন্য স্বয়ং হিটলারই পিলে চমকে
তুার মত আরো অনেক নতুন নতুন খবর তৈরী করে রেখেছিলেন।
গমিয়া এবং মোবাভিযা দখলের খবরটা বাসী হয়ে যাবার আগেই
বাষ্ট্র খবরও একে একে লণ্ডন, প্যারীসে পৌঁছে দেওয়া হতে
শেঃ। পবেব মাসেই জানা গেল জার্মান সেনাবাহিনী লিথুয়ানিয়ার
ই‌ং থেকে জোব করে মেমেল বন্দব দখল কবে নিয়েছে।

এবপর আবো নতুন খবর—হিটলাব পোল্যাণ্ডের কাছে ডানজিগ
হরটা দাবি কবেছেন। হুকুম হযেছে, পত্রপাঠ ওটা জার্মানীর
হাতে সমর্পণ কবতে হবে। নচেৎ সমর্পণ যাতে কবা হয় তার
ব্যবস্থা করতে জার্মান বাহিনী বাধ্য হবে।

এবার মহদাশয় চেম্বারলেনের টনক নড়ল। তিনি প্রকাশ্যে
জার্মানীকে সতর্ক করে দিলেন—খববদার, পোল্যাণ্ডের গায় হাত
উঠিয়েছ কি আর বক্ষা নেই। আমবা এর আগে আহ্লাদে আটখানা
হয়ে তোমাদের যে বকম মাথায় তুলে বেখেছিলাম তা আর রাখবনা।
বেশি বাড়াবাড়ি করলে মেবে হাড ভেঙ্গে দেব।

চেম্বারলেনের আস্ফালন শুনে হিটলার শুধু মুচকি হাসলেন;
মুখে কোন কথা বললেন না।

বৃটিশের বড় আশা ছিল, আব যাই হোক, রাশিয়ার ভয়ে হিটলার
বেশি দূর এগোতে সাহস করবে না। কারণ, লাল জুজুর ভয়ে শুধু
জার্মানীই নয় সারা ইউরোপই তখন ফোবিয়াগ্রস্থ। কি জানি,
ভাল্লুকটা কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। এ বড় অদ্ভুত জীব।
গে থাকতে তার মনেব আঁচ পাওয়া স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য।

কিন্তু এত সব হিসেব এক মুহূর্তে ওলোট পালোট হয়ে গেল
ইশে আগষ্ট দুপুর বেলা। ঐদিন জানা গেল, রাশিয়া এবং

জার্মানীর মধ্যে দশ বছরের জন্য এক পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

রাগে, শোকে, অপমানে একেবারে মুষড়ে পড়ল বৃটিশ সিংহ। চেম্বারলেনের সব আশা, সব চেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এরপর তিনি যে কি করবেন তা তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

যাইহোক, অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে আপাতত ঠেকা দিয়ে রাখবার মত একটা পথ বের করা হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছুটে গেল ওয়ারশয়। সেখানে বসল মন্ত্রণাসভা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল আলোচনা। অবশেষে দুদিন পর সাক্ষরিত হল বৃটিশ-পোল পারস্পরিক দেশরক্ষা চুক্তি।

ঠিক হল, পোল্যাণ্ড যদি নাজী বদমায়েসদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে ব্রিটিশ সিংহ সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়বে জার্মানদের ঘাড়ে। কামড়ে খিমচে শেষ করে দেবে পাজীগুলোকে।

কিন্তু বাস্তবে কি হল?

চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হবার পর সাতটা দিনও কাটল না। পয়লা সেপ্টেম্বর ভোররাত্রে আগে থাকতে কোন রকম সতর্কতা কিংবা যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই জার্মান ঝটিকা বাহিনী হুড়হুড় করে সীমানা ডিঙ্গিয়ে ঢুকে পড়ল পোল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে।

যদিও এ সংবাদ জানার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স যৌথভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানীর বিরুদ্ধে, কিন্তু কোন রকম সক্রিয় বাধাদানের আগেই সম্পূর্ণ পোল্যাণ্ড চলে গেল জার্মান সেনাবাহিনীর দখলে। তখন দূর থেকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী সৈন্যদের এই দৃশ্য ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না।

এই ঘটনায় অন্ধ জগৎবাসীর মানসনেত্র যেন মুহূর্তের মধ্যে

উন্মীলিত হয়ে গেল। সারা দুনিয়ার জনসাধারণ সেদিনই প্রথম গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে এ সত্য উপলব্ধি করতে পারল, যে, পায়ে তেল দিয়ে কারো হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। তাতে হয়তো বড়জোর কিছু দিনের জন্য তার লোভকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু কখনোই সে ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। সমালোচকরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া স্বত্বেও এতদিন যে সত্যটা বৃটিশরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছিল না শেষে একেবারে হাতে নাতে ফল পেয়ে তারাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু তাদের সামনে তখন নীরবে অপমান সহ্য করে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ-ই খোলা রইল না।

তবে পোল্যাণ্ডের বেলা যে অপমান হজম করা সহজ হয়েছিল, ডেনমার্ক ও নরওয়ের বেলা যে অপমান মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ ও বেলজিয়ামের বেলা কিন্তু সে অপমান সহ্য করা ব্রিটিশ সিংহের পক্ষে মোটের সম্ভব হল না।

অবশ্য এই অসম্ভব্যতার মনস্তাত্বিক কারণ যতটা না জার্মানীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি তার থেকে অনেক গুণ বেশি নিজেদের আত্মরক্ষার চিন্তা। সেদিন, সেই মুহূর্তে, একটা সাধারণ ইংরেজ চাষীর ছেলেরও এ কথা বুঝতে বাকি রইল না যে, এখনই যদি জার্মানীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান না যায় তা হলে দেখতে দেখতে যুদ্ধ একেবারে ইংল্যাণ্ডের ঘাড়ের উপর এসে পড়বে। তখন তাকে সামাল দেওয়াই হয়ে উঠবে মুসকিল। সুতরাং এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া দরকার। এরপর একটা দিন নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্ত থেকে এক ধাপ পিছিয়ে আসা।

অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এবার রুখে দাঁড়াতে হবে।

সিদ্ধান্ত তো হল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য দিকে।

চেম্বারলেনের মত একজন দোদুল্যমান হৃদযের মানুষের হাতে এই কঠিন কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কোন পাগলও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। কারণ লোকটা যে কখন কি করে বসবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো দেখা যাবে তিনি একদিন নিজেই যাচক হয়ে বার্লিনে গিয়ে বৃটিশ জাতির আত্মসমর্পনের দলিলে সই দিয়ে এসেছেন।

অতএব এ লোককে হঠাও।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রব উঠল—চেম্বারলেন গদ্দী ছোড়ো, অভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো।

হঠাৎ এমন তুমুল চ্যাচামেচীতে বেচারা চেম্বারলেন একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর একাত্তর বছরের পুরান ও ধরা হৃদযন্ত্রের ওঠা নামা প্রায় দ্বিগুন হয়ে গেল। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক গিয়ে হাজির হলেন বার্মিংহাম প্রাসাদে। মহামান্য সম্রাটের সামনে হাত জোড় করে, নতজানু হযে কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সী, একাত্তর বছরের জীবনে আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে; কমন্স সভায় ওরা আমাকে শুধুমাত্র ধোপী আছাড় দিতেই যা বাকি রেখেছে। সুতরাং আর নয়—এবার আমাকে রেহাই দিন।'

মহামান্য ষষ্ঠ জর্জ মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে চেম্বারলেনের পদত্যাগ পত্রটা গ্রহণ করলেন। তারপর সেটা এডিকংয়ের হাতে তুলে দিলেন রাজকীয় দলিল দস্তাবেজের সংরক্ষণশালায় পোঁছে দেবার জন্য।

এই ছোট্ট, অথচ ব্রিটিশ জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটুকু শেষ হয়ে গেলে একাত্তর বছরের রোগা ভদ্রলোকটি মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলেন বার্মিংহাম প্যালেসের সিংহমার্কা দরজা পেরিয়ে। মনে হল আজ যেন দ্বাররক্ষী তাঁকে আর আগের মত সেলুট জানাল না। কিংবা এও হতে পারে যে, ওটা তাঁর মনের

ভুল। সে হয়তো সেলুট ঠিকই দিয়েছে—কিন্তু তিনিই আজ সেটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

বার্মিংহাম প্যালেস রোড থেকে ডানদিকে ঘুরে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট ধরে হোয়াইট হল ষ্ট্রীট আর ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রিজ রোডের সংযোগস্থলে যখন প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী এসে পৌছল তখন ওদিকে বি, বি, সি, থেকে অতি জরুরী ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। ভাষ্যকার বেশ চড়া গলায় বলে চলেছেন, 'এইমাত্র বার্মিংহাম প্যালেস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মাননীয় আর্থার নেভিল চেম্বারলেন কিছুক্ষণ আগে মহামান্য সম্রাটের কাছে তাঁর মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করে এসেছেন। এই সঙ্গে মহামান্য সম্রাটের নিজস্ব সচিবালয় থেকে আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহামান্য সম্রাট রক্ষণশীল দলের বিশিষ্ট সদস্য মিষ্টার লিওনার্ড স্পেন্সার উইনষ্টন চার্চিলকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

রেডিওর সাংবাদ শুনে আনন্দে উদ্বেলিত জনতা রাস্তাঘাটে নৃত্য করতে শুরু করল। অফিস-কাছারি-দোকানপাট ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ নেমে এল পথে। তাদের ভীড়ে গাড়ী ঘোড়া চলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। প্রতিটি রাস্তার ক্রসিং-এ ট্রাফিক পুলিশ জ্যাম ছাড়াতে গলদঘর্ম হয়ে পড়ল। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রিজের প্রবেশ মুখে আটকা পড়া গাড়ীর স্বচ্ছ কাঁচের জানালার ফাঁক থেকে চেম্বারলেনকে নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখতে হল। সেদিনই প্রথম তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন, এতদিন হিটলারকে তোষামোদ করে তিনি কি ভুলটাই না করেছেন। হিটলারকে খুশী রাখতে গিয়ে তিনি নিজের দেশবাসীর হৃদয় থেকে কতদূরে সরে এসেছেন!

পরদিন এগারই মে সকালে বার্মিংহাম প্যালেসে এক বিশেষ

অনাড়ম্বর উৎসবের মধ্য দিয়ে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন ছেষট্টী বছর বয়স্ক তরুণ উইনষ্টন চার্চিল।

প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেই চার্চিল তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতায় বললেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের পিতৃভূমি যে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে তার কোন তুলনা হয় না। আমরা কেউই জানিনা এই পরিস্থিতির শেষ কবে এবং কিভাবে হবে। তাই আজ আমি আপনাদের শুধুমাত্র রক্ত, শ্রম, অশ্রু, এবং ঘর্ম ছাড়া আর কিছুই দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না।'

চার্চিল যখন তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার আহ্বান জানাচ্ছেন, ওদিকে তখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রবল পরাক্রান্ত জার্মান বাহিনীর আক্রমণের সামনে খড় কুটোর মত ভেসে যেতে লাগল আক্রান্ত দেশগুলোর সেনাদল। দেখতে দেখতে আত্মসমর্পণ করল লুক্সেমবুর্গ। তার দু'দিন পর হল্যাণ্ড।

কিন্তু রুখে দাঁড়াল বেলজিয়াম। আহত ব্যাঘ্রের মত বলল, না, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ সে কিছুতেই করবে না।

সঙ্গে সঙ্গে জরুরী বার্তা গেল মিত্রবাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল গামেলাঁর কাছে। তাতে শুধু একটিই অনুরোধ—সাহায্য চাই, অফুরন্ত সাহায্য, এই মুহূর্তে। তা না হলে বেলজিয়ামকে রক্ষা করা যাবে না। বেলজিয়ামও নাজিবাহিনীর করতলগত হবে।

তারবার্তা পাঠিয়েছেন বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড দি থার্ড নিজে; সুতরাং সাহায্য না পাঠাবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া রাজা লিওপোল্ড ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ—দুজনেরই অনেক দিনের দোস্ত। আজ দোস্তের এই বিপদের দিনে যদি তারা পাশে না দাঁড়ায় তা হলে বাইরের লোক বলবে কি?

অবশ্য আসল কারণটা ঠিক তা নয়—অন্য।

লণ্ডন ও প্যারিস—ছু' রাজধানীতেই সবার কাছে দিবালোকের মত এটা স্পষ্ট ছিল যে এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য 'বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ কিংবা হল্যাণ্ড নয়—ফ্রান্স। বর্তমান আক্রমণটা ফ্রান্স আক্রমণের প্রস্তুতি পর্ব মাত্র। তাই এখন আর চুপ করে বসে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল, এই মুহূর্তে প্রিয়তম বন্ধু বেলজিয়ামকে রক্ষার জন্য পাঠাও সৈন্যবাহিনী, পাঠাও জাহাজ, বিমান, কামান, ট্রাঙ্ক, মাইন।

দেখতে দেখতে পঁচিশ ডিভিশন সৈন্যবাহিনী এগিয়ে গেল বেলজিয়ামের সাহায্যার্থে। এব মধ্যে ইংরেজ সৈন্যই ছিল সাড়ে তিন লাখ।

ওদিকে তখন জার্মান বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে বেলজিয়ামের শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম দখল করে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমমুখে। তাদের চলার পথে কোথাও বাধা দেবার জন্য কেউ সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে নেই; শুধু আত্মসমর্পণের জন্য এক এক জায়গায় রাজকীয় সৈন্য বাহিনীর এক একটা দল সাদা ফ্লাগ উড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সবার মুখে আজ এক জিজ্ঞাসা—কখন নাজীরা এসে তাদের বরণ করে নেবে গলায় মালা পড়িয়ে?

সত্যি! প্রবল পরাক্রান্ত নাজীবাহিনীর আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন এক স্বাধীন জাতির কি চরম দুর্দশা!

অবশ্য ফরাসী এবং বৃটিশের যৌথ বাহিনী কোথাও কোথাও এগিয়ে গিয়ে জার্মান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি যে একেবারেই হয় নি এমন ডাহা মিথ্যে কথাটা তাদের চরম শত্রুরাও বলতে পারবে না। কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার হল, জার্মান বাহিনীকে প্রতি-আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দেবার বদলে তারা নিজেরাই সব ফ্রণ্টে পিছিয়ে আসতে লাগল। শেষে কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন দেখা গেল, তারা যেখান থেকে রওয়ানা দিয়েছিল নাজীদের গুতোর ঠেলায় ফের সেখানেই ফিরে এসেছে।

অবশেষে একদিন সেই বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণা প্রচারিত হল:

রাজধানী ব্রাসেলস সহ সমগ্র বেলজিয়াম জার্মান সেনাবাহিনীর দখলে চলে গেছে।

বেলজিয়াম যায় যাক, তাতে কারো মাথা ব্যাথা নেই—কিন্তু ফ্রান্স যেন হাতছাড়া না হয়।

ফ্রান্স রক্ষার চিন্তায় তখন কি ব্রিটিশ, কি ফরাসী কারো চোখে ঘুম নেই। সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল—চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলেছে মিটিং, মিটিং, আর মিটিং।

একবার ওয়র ক্যাবিনেটের মিটিং শেষ হয় তো পর মুহূর্তে বসে ওয়র হাইকম্যাণ্ডের মিটিং। আবাব হাই কম্যাণ্ডের মিটিং শেষ না হতেই শুরু হয়ে যায় জেনারেল ষ্টাফদের মন্ত্রণাসভা।

প্রতি মুহূর্তে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন পরিকল্পনা—নতুন নতুন ট্যাকটিজ। থেনভিলের পথে একদলকে রওয়ানা করিয়ে দেবার পরই আর একদলকে তৈরী হতে বলা হচ্ছে হিরগনের দিকে যাবার জন্য। এমনভাবেই কাজ চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন।

মিত্র পক্ষের ধারণা ছিল—জার্মান সেনাবাহিনী যতই এগিয়ে আসুক না কেন, ম্যাজিনো লাইনের সামনে এসে তাদের থমকে দাঁড়াতে হবেই। তখন দেখে নেওয়া যাবে কার কত দৌড়।

কিমাশ্চর্যমতপরং!

প্যানৎসার বাহিনী যে ম্যাজিনো লাইনের ধার কাছ দিয়েও যাচ্ছে না। ব্যাপার কি, অন্য কোন মতলব নেই তো ওদের? বলা যায় না, ওরা যা কাণ্ড করছে দিনের পর দিন! হঠাৎ হয়তো একদিন সকালে উঠে দেখা যাবে, আকাশ থেকে উড়ে এসে হাজির হয়েছে সোজা প্যারিসে।

বৈঠক ডাকলেন জেনারেল গামেঁলা।

জনে জনে সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,. 'ওদের মতলবটা কি, সেটা কেউ আঁচ করতে পেরেছেন?'

'না, স্যার।'

সবার মুখেই এক উত্তর।

হঠাৎ খবর এল বেলজিয়ামের গিভেটের দিক থেকে মিউজ নদী পার হয়ে সেডানের হাইওয়ে ধরে ছুটে আসছে একটা প্যানৎ-সার বাহিনী। ওদিকে বাউবিনেস্কের পথে একদল হানাদার তীর বেগে এগিয়ে যাচ্ছে বুলান ও ক্যালে বন্দর দখল করার জন্য।

ওয়র হাইকমাণ্ডের ঘরে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। দেখতে না দেখতে নতুন নতুন পরিস্থিতির জন্য নতুন পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াবলেসে অর্ডার চলে যাচ্ছে ফ্রণ্টে—প্রসিড টুওয়ার্ড থেনভিন, ব্যাক টু লাওন, এয়ার ড্যাস টু ভার্ডুন।

এত সত্বেও সবার মুখেই একটা উদ্বেগের ছায়া। প্রত্যেকের চোখেই এক জিজ্ঞাসা—এরপর কি হবে? আমরা কোথায় যাব?

ওদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল দিনের পর দিন রেডিওতে চিৎকার করে চলেছেন, 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই, আপনারা গুজবে কান দেবেন না। আমাদের বীর সেনাবাহিনী বহু জায়গায় জার্মান সৈন্যবাহিনীকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। জার্মান বাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীর তৈরী ব্যূহ ভেদ করে আগের মত আর এগোতে পারছে না। অনেক ফ্রণ্টে তো আমরা তাদের অগ্রগমন একেবারেই রুদ্ধ করে দিয়েছি।'

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণী তখনও অনেকের কানে বাজছে। ঠিক এমন সময় বিনিদ্র জেনারেলদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত একটা নতুন খবর এসে হাজির হল। নিজের কামরায় অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে জেনারেল গাঁমেলা তাঁর রেডিও অপারেটরের কাছ থেকে শুনলেন, বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড জার্মান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

চমকে উঠলেন জেনারেল গাঁমেলা। তাহলে কি তাঁদেরও সময় হয়ে এল!

দেখতে দেখতে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমি পাল্টে গেল। বুলান, ক্যালে তখন সম্পূর্ণভাবে জার্মান সেনাবাহিনীর দখলে। জেনারেল আর্উইন রোমেল, জেনারেল গুডেরিয়ান, জেনারেল ফন রানষ্টেড তাদের দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী নিয়ে তিনদিক থেকে জেনারেল লর্ড গর্টের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সেনাবাহিনীকে তাড়া করে ভেড়ার পালের মত খেদিয়ে নিয়ে চলেছেন ডানকার্কের দিকে।

সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত অবিরাম বোমাবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে মার্শাল হারমান গোয়েরিংয়ের পরিচালনাধীন বিমান বাহিনী।

সারা বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠল। এমন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সিংহও যে মার খেয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিতে পারে, তা এর আগে কারো কল্পনায়ও আসেনি। এবার বাস্তবে সে দৃশ্য দেখে সবাইকে স্বীকার করতে হল—হ্যাঁ, বৃটিশ সিংহকেও দরকার হলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

বেচারা জেনারেল গর্টের অবস্থা তখন সত্যি শোচনীয়। একজন নয়, দুজন নয়, সাড়ে তিন লক্ষ বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য আটকা পড়ে গেছে ডানকার্কে। এই হতভাগ্য সৈন্যদের সামনে তখন মৃত্যুবরণ কিংবা আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় পথ নেই। এ পরিস্থিতিতে জেনারেল কি করবেন, তাঁর কি করা উচিত!

বেতারে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী এন্থনী ইডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন জেনারেল। জানালেন নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কথা। অনুরোধ করলেন, এই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধারের জন্য দ্রুত নৌবহর পাঠাবার জন্য।

ব্যাপারটা যে খুব সহজসাধ্য নয় সেটা জেনারেল নিজেও

জানতেন। সেই মুহূর্তে জার্মান ডেস্ট্রয়ার এবং বিমান বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বন্দরে প্রবেশ করা কোন বৃটিশ জাহাজের পক্ষে শুধু অসম্ভবই নয়, আত্মঘাতীও বটে। কারণ, যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণে জাহাজ ডুবে যেতে পারে; বোমাবর্ষণের ফলে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

এসব সম্ভাবনার কথা জেনারেল গর্টের ভালভাবেই জানা ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জাহাজ পাঠাবার অনুরোধ না করে পারলেন না। কারণ চোখের সামনে এমন ভাবে সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্যকে মরতে বলা কিংবা জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা তাঁর কাছে নিতান্ত অমানবিক কাজ বলে মনে হল।

ওদিকে জেনারেল গর্টের বার্তা পেয়ে বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যরা আলোচনায় বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল—হ্যাঁ, জাহাজ পাঠান হবে। ইংল্যাণ্ডের যত জাহাজ আছে সব যাবে। যদি জার্মান বিমান কিংবা নৌবহরের আক্রমণের মুখে পড়ে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণও হয়ে যায় তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করা হবে ডানকার্কে পেঁছবার জন্য। ইংল্যাণ্ডের নিজস্ব অধিকারে একটা জাহাজ থাকা পর্যন্ত এমন ভাবে লক্ষ লক্ষ ঘরের ছেলেকে বিদেশে মরতে দেওয়া যাবে না। ওদের যে করেই হোক দেশে ফিরিয়ে আনতে হবেই। তা না হলে ইতিহাস কোনদিন বর্তমান নেতৃত্বকে ক্ষমা করবে না।

সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইল্যাণ্ডের বন্দরগুলোতে যত জাহাজ, ষ্টিমার, মোটর বোট, লঞ্চ ছিল সবাই একসঙ্গে হুইসেল বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ল নোঙ্গর তুলে। সঙ্গে যোগ দিল মাছধরা জাহাজ থেকে জেলে ডিঙ্গী পর্যন্ত যা কিছু জলে ভাসে, সব। দেখতে দেখতে ডোভারের জল ঘোলা হয়ে গেল। শত শত হুইসেলের একসঙ্গে প্রাণ কাঁপানো আওয়াজে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। সবার মুখে তখন এক আওয়াজ—চল ডেনমার্ক, ডেনমার্ক চল!

ওদিকে কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। জার্মান বাহিনী যখন ব্রিটিশ সৈন্যদলকে কুকুরের মত তাড়া করে নিয়ে চলেছে, মারের চোটে লালমুখো সাহেবেরা যখন চোখে সর্ষেফুল দেখছে, তখন বার্লিন থেকে হঠাৎ আদেশ এল—রুখ যাও। আপাততঃ আর সামনে এগোবে না! যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়।

আদেশ শুনে সেনাবাহিনী তো হতবাক। এতদূর ছুটে এসে, শিকার যখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, তখন কি না বলা হচ্ছে শিকার ছেড়ে দাও। না, এ অসম্ভব। এ কিছুতেই হতে পারেনা। মনে হয় কেউ ভুল আদেশ দিয়েছে—হয়তো রেডিও অপারেটারই ভুল শুনেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তারবার্তা গেল বার্লিনে—প্লিজ ক্ল্যারিফাই দ্যা ম্যাসেজ।

ও প্রান্ত থেকে নির্মম কণ্ঠে উত্তর এল—নো ক্লারিফিকেশন সুড বি আসকড্। ইট ইজ দ্যা রিটেন অর্ডার ফ্রম হিজ এক্সিলেন্সী দ্যা ফ্যুয়েরার।

এর পর আর কোন কথা চলে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবাইকে থেমে পড়তে হল যার যার সীমান্তে। হাতের থাবা তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতে হলে শিকারকে।

এই সুযোগ।

বৃটিশ বাহিনীর জীবনে এমন সুযোগ আর কোন কালে আসেনি। এমন ভাবে যে মরণের মুখ থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে তা এর আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। অথচ বাস্তবে তা-ই ঘটল।

দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেন টোন্যান্টের নেতৃত্বে এক বিশাল নৌ-বহর এসে হাজির হলে ডানকার্কে। পথে তাদের কোন বাধারই

সম্মুখীন হতে হয় নি ; আকাশে একটা শত্রু বিমানও দেখা দেয়নি। শুধু হুইসেল বাজাতে বাজাতে তাঁর নৌবহর এগিয়ে এসেছে তীব্র বেগে। আসার সময় তাদের সামনে ছিল কেবল এক লক্ষ্য—ডানকার্ক। মুখে এক শ্লোগান—লং লীভ দ্যা কিং। সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন।

মাত্র দু'দিন। বিশ্বাস করা যায় না—তবু আজ একথা দিনের আলোর মতো সত্য—মাত্র দু'দিন সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সামরিক-অসামরিক মানুষেরা মিলে সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিককে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এ কাহিনীর কোন তুলনা নেই। যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্য উঠবে, যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে, ততদিন এ কাহিনীও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রইবে।

ডানকার্ক থেকে শেষ সৈন্যদল যখন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পৌঁছল তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হাউস অব কমন্সের সভ্যদের উদ্দেশ্য করে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'হাজার বাধা বিপত্তি সত্বেও আমাদের বীর সৈন্যরা ডানকার্ক থেকে গৌরবজনক পশ্চাদাপসরণ করেছে।' অর্থাৎ গ্লোরিয়াস রিট্রিট।

সঙ্গে সঙ্গে বি. বি. সির ভাষ্যকার দুনিয়াবাসীকে চিৎকার করে জানিয়ে দিল খবরটা। আমাদের সৈন্যদল হাজার বিপদের মুখেও পরাজয় স্বীকার করেনি। বরং গ্লোরিয়াস রিট্রিট করেছে। তারা আবার তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছে।

সেই থেকেই কথাটার চল। সেই থেকেই সারা দুনিয়ার লোক পালিয়ে আসাটাকে 'গৌরবজনক পশ্চাদাপসরণ' বলে জানতে শিখেছে। এরপর যেখানেই যারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য উর্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে এসেছে, সেখানেই তারা সেটাকে

গ্লোরিয়াস রিট্রিট বলে চালিয়ে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই এটা একটা বেশ ভাল রকমের ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকাল যে কোন যুদ্ধেই পরাজিত পক্ষ নিজের পরাজয়কে গৌরব-মণ্ডিত করে তোলার জন্য মহামতি চার্চিল আবিষ্কৃত এই মোক্ষম অস্ত্রটির প্রয়োগ করছে।

ফ্রান্সের বেলা কিন্তু সে ফ্যাসানটা আর খাটল না।

দশই জুন বেনিটো মুসোলিনির ইতালী, এডলফ হিটলারের জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। দেখতে দেখতে ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনী পশ্চিম দিক থেকে ফ্রান্সের মুল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ল। জার্মান সেনাবাহিনীর মত তাদেরও তখন এক লক্ষ্য—প্যারিস।

বেকায়দা দেখে ফরাসী সরকার প্যারিসকে অরক্ষিত নগরী বলে ঘোষণা করল। এই ঘোষণার মানে দাঁড়াল, এখন যে খুশী প্যারিসে চলে আসতে পার; এখানে এসে যত ইচ্ছে খবরদারী করতে পার; কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। শুধু দয়া করে এমন সুন্দর শহরটাকে কার্তুজ, কামান দেগে ধ্বংস করে দিওনা। ওতে ফরাসীজাতির চতুর্দশ গোষ্ঠীর অভিশাপ বর্ষিত হবে তোমাদের উপর।

ওদিকে ব্যাপার কিন্তু আসলে অন্য। জার্মান বাহিনীর বিশ লক্ষ সৈন্য তখন প্যারিসের দোর গোড়ায় পেঁাছে গেছে—ইচ্ছে করলে যখন তখন শহরের ভিতর তারা ঢুকে পড়তে পারে। সুতরাং, রক্ষিত হোক আর অরক্ষিতই হোক প্যারিসের পতন তখন ঠেকিয়ে রাখে তেমন সাধ্য ফরাসী কেন, ইংরেজদেরও আর নেই।

তবুও একটা অনুষ্ঠান না হলে যেন কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। তা ছাড়া আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্যে যে চোখ ধাঁধানো জৌলুস আছে—নীরব অশ্রু বিসর্জনে তার কণামাত্রও নেই।

সুতরাং প্রস্তাব পাঠাও। সন্ধির প্রস্তাব।

যেমন সিদ্ধান্ত, তেমনই কাজ। দেখতে দেখতে জার্মান সেনানায়কের কাছে সন্ধিব প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন মার্শাল পেঁতা।

কে ইনি?

নব্বই বছবের বৃদ্ধ মার্শালকে দেখেই চিনে ফেললেন জেনারেল। জিজ্ঞাসা কবলেন, 'আপনিই না সেবার ভার্দুনে আমাদেব সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন?'

জেনাবেলেব প্রশ্নেব জবাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রথম মহাযুদ্ধের বীর সেনাপতি মার্শাল পেঁতা।

সত্যি, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

আজ যে বৃদ্ধ নত মস্তকে জার্মান সেনানায়কের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সামান্য করুণা ভিক্ষার জন্য, প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোতে তাঁরই দাপটে কেঁপে উঠেছিল ইউরোপের রণাঙ্গন। তাঁর প্রবল বিক্রমের সামনে দাঁড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল প্রবল পরাক্রান্ত জার্মান বাহিনী। তাদেরকে নিতান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই এই নিষ্ঠুর সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে, জার্মান সেনানায়কদের থেকে মার্শাল পেঁতার যুদ্ধ পরিচালন ক্ষমতা অনেক বেশী। সেদিন থেকেই বিশ্ববাসীর চোখে মার্শাল পেঁতা 'ভার্দুনের বীর' হিসেবে সম্বর্দ্ধিত হয়ে আসছেন।

কিন্তু আজ?

আজ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে নব্বই বছরের বৃদ্ধ 'বীর'কে নত মস্তকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হল চিরশত্রু জার্মানদের সম্মুখে। ইতিহাস পুরুষ সম্ভবত এই চরম রসিকতাটুকু করার জন্যই এতদিন ধরে ভার্দুনের বীরকে যমরাজের অধিকারের সীমানার বাইরে সতর্ক প্রহরায় ধরে রেখেছিলেন। তাই, আজ

যখন রসিকতা উপভোগের চরম মুহূর্ত উপস্থিত হল, তখন তিনি যেন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। জার্মান সেনা-নায়কদের ছদ্মবেশে এক প্রচণ্ড বিদ্রূপ হয়ে প্রকাশিত হলেন পেঁতার সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল বার্লিনে—ট্রাঙ্কে, টেলিগ্রাফে।

তখন দুপুর দু'টো। কয়েকজন জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে সবে লাঞ্চ খেতে বসেছেন ফ্যুয়েরার, সামনে উপবিষ্টা ইভা ব্রাউন।

খবরটা শুনে উৎসাহে লাফিয়ে উঠল জেনারেলের দল। হফম্যানের হাতের ধাক্কায় একটা জলের গেলাস উল্টে গিয়ে হেইন হেসের ট্র'উজারটাকে একেবারে ভিজিয়ে দিল। হিটলার মৃদু হেসে বললেন, 'এটা আমি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম; তবে ঘটনাটা যে এত শীঘ্র ঘটবে সেটা কখনো ভাবিনি। যাইহোক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।'

হফম্যান বললেন, 'তা হলে কি আমরা সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি?'

'নিশ্চয়।' জবাব দিলেন ফ্যুয়েরার, 'তবে সামান্য কয়েকটা শর্তে।'

'কি শর্ত?'.

'খুব সামান্য।'

দু'দিন পরেই সন্ধির সামান্য শর্তাবলী নিয়ে প্যারিসে এসে হাজির হলেন বার্তাবাহক। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক জানালেন ফ্যুয়েরারের সামান্য ইচ্ছাটুকুর কথা।

তিনি বললেন, 'ফ্যুয়েরার চান ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান, যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি ফরাসীদের যা কিছু সমরাস্ত্র আছে সেটা আপাততঃ জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। অবশ্য ফরাসী অসামরিক শাসন ব্যবস্থা

চালাবার জন্য যেটুকু অস্ত্রশস্ত্রের দরকার সেটুকু ফরাসীরা রেখে দিতে পারে। তারজন্য ফ্যুয়েরার কিছু মনে করবেন না। তবে এর পরিমাণটা জার্মানরাই ঠিক করে দেবে।'

'শুধু এই শর্ত?'

মার্শাল পেঁতা জানতে চাইলেন।

'না, আরো দু' একটা ছুট-ছাট শর্তও আমাদের আছে। যেমন: আবিসিনিয়ার জিবুতি-আদ্দিস আবাবা রেললাইনটা আপাততঃ আমাদের কাছেই জমা থাকবে।'

জবাব দিলেন ফ্যুয়েরারের বার্তাবাহক।

'ঠিক আছে, আমরা রাজি।'

সম্মতি জানালেন মার্শাল পেঁতা।

'আর একটা কথা।'

'বলুন।'

'সন্ধি সাক্ষরের জায়গাটা আমরা-ই ঠিক করে দেব।'

'কেন?'

'ওটা আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে।'

বেশ মাপা হাসি হেসে কথাটা বললেন ফ্যুয়েরারের বার্তা-দূত।

নব্বই বছরের পরাজিত বৃদ্ধ ব্যাপারটা ঠিক বুঝলেন না। বললেন, 'আপনার কথার মানেটা আমার কাছে তেমন পরিষ্কার হল না। অনেক দিনের ইচ্ছে বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'আমি বোঝাতে চাইছি,' বার্তাবাহক হাসলেন, 'উনিশ শ' উনিশ সালে যে জায়গাটায় বসে আপনারা আমাদের পরাজয়ের দলিলে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেছিলেন ঠিক সেই জায়গাতে বসেই এবার আমরা আপনাদের সঙ্গে চুক্তিপত্রটা সই করব। মনে করবেন না, এটা কেবলমাত্র মাত্র ফ্যুয়েরার কিম্বা আমাদেরই মনের ইচ্ছা। আসলে সমগ্র জার্মান জাতিই গত একুশ বছর ধরে এই শুভদিনটার জন্য প্রতীক্ষা করে করে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। তাই আজ

সেই চরম মুহূর্ত উপস্থিত হওয়ায় আমরা যে কতটা আনন্দিত এবং গর্বিত সেকথা আপনাকে ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না মঁশিয়ে।'

বার্তাবাহকের উচ্ছ্বাসভরা কথাগুলো নত মস্তকে চুপ করে শুনে গেলেন মার্শাল পেঁতা। মনে মনে বললেন, হে ভগবান, ফরাসী জাতির এত বড় অপমান স্বচক্ষে দেখতে হবে বলেই কি তুমি এই অধমকে এমন অফুরন্ত আয়ু দিয়েছিলে!

সেদিনটা বাইশে মে,' উনিশ শ' উনচল্লিশ।

যথাসময়ে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হলেন ফ্যুয়েরার হিটলার। সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট সেনানায়কের দল—গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, হারমান, কাইটেল, ব্রাউশিচ, রাইনষ্টাইন। তাছাড়া পাত্র-মিত্র-অমাত্যের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়।

যাইহোক, আগে থাকতেই পুরান রেলের কামরাটাকে যথাস্থানে এনে হাজির করে রাখা হয়েছিল। হিটলার ঝকঝকে জার্মান ক্রাইসলার থেকে নেমে সদর্পে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। পাদানীর তিনটে ধাপ পার হয়ে যখন মূল কামরার মেঝেতে তিনি পা রাখলেন তখন তাঁর চোখে মুখে কি এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস। দেখে মনে হল, তিনি যেন অনেক সাধনার পর স্বর্গের সিঁড়ির শেষ ধাপটা অতিক্রম করে মূল স্বর্গভূমিতে পা রাখতে পেরেছেন। সেই আনন্দেই তিনি আজ দিশাহারা। চোখে মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে যখন ফ্যুয়েরার নতুন পালিশ করা ঝকঝকে টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালেন—তখন এক সঙ্গে কয়েক ডজন ক্যামেরার ঝলকে কামরার ভিতরটা যেন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বেয়ারাদের এগিয়ে দেওয়া মসৃণ ভেলভেটে মোড়া বিশেষ চেয়ারটাতে তিনি নিজে বসলেন—এবং পাশের চেয়ারগুলোতে পাত্র-মিত্রদের বসবার ইঙ্গিত দিলেন।

সবার আসন গ্রহণ করা হলে, একজন লম্বা-জুলফী ও বাবড়ী চুল-

ওয়ালা লোক উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে বেশ চড়া গলায় সন্ধির শর্তাবলী পড়তে শুরু করে দিল।

শ্রোতাদের কারো মুখে কোন কথা নেই—সবাই নির্বাক। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এ যেন কোন বোবাদের সম্মেলন বসেছে। এখানে সবাই শ্রোতা—বক্তা মাত্র একজন। কেবলমাত্র তিনিই বলবেন, আর সবাই সে কথা শুনে যাবে। কেউ কোন প্রতিবাদ করবে না, কারণ, এটা বোবাদের সম্মেলন। এ সম্মেলনে সবাই বোবা—একমাত্র বক্তা ছাড়া।

সন্ধিপত্রের শর্তাবলী যিনি পাঠ করছেন তার জলদগম্ভীর স্বরে রেলের কামরাটা যেন বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, হয়তো এখনি একটা প্রবল ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে। কি জানি, শর্তাবলী শুনতে শুনতে এক সময় হয়তো মার্শাল পেঁতা চিৎকার করে উঠবেন, না, আমরা এই শর্তাবলী মানব না—মানছি না। আমরা এ চুক্তিপত্রে সই করব না, আমরা আবার যুদ্ধ করব।

কিন্তু না তেমন কিছুই হল না।

হবে কি করে। নব্বই বছরের বৃদ্ধের আজ সে প্রতিবাদের শক্তি কোথায়? ইতিমধ্যে ফরাসীদের সবকটা বিষ দাঁত যে জার্মানরা বেশ ভালভাবেই উপড়ে দিয়েছে। আজ যে একবার মিথ্যে মিথ্যেই তারা ফণা তুলে ফোঁস করে উঠবে সে সাধ্যই বা তাদের কৈ? তাই ভূমিকম্পের পরিবর্তে রেলের কামরার বাতাসে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে এক নব্বই বছরের বৃদ্ধের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস—যে দীর্ঘশ্বাস এক মৃত, প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিকের উদ্দেশ্যে আক্ষেপ করে বলছে, মঁশিয়ে ক্লেমেশো, আপনার কৃতকর্মের জন্যই আজ সমগ্র ফরাসী জাতিকে এই নিদারুণ অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। ফরাসীরা আপনাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না—ক্ষমা করবে না।

সমগ্র সন্ধিপত্রটা যখন পড়া শেষ হল, তখন সেটা অত্যন্ত মোলায়েমভাবে মেলে ধরা হল জার্মান বিজয়ী বীরের সামনে। উনিশ শ' উনিশে জার্মানীর মৃত্যুদণ্ডের দলিলের স্বাক্ষরকারী মার্শাল হেনরি ফিলিপ পেঁতা একুশ বছর পর সেই একই হাতে, একই আঙ্গুল দিয়ে ফরাসী জাতির মৃত্যুদণ্ডের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন, দিতে বাধ্য হলেন।

হায়রে ইতিহাস! মার্শালের কম্পিত হাতের প্রতি সামান্য ভ্রুক্ষেপ করার অবকাশও আজ আর তার হল না। একটু সহানুভূতি জানাবার জন্য এক পলকের সময়ও আর সে মহাকালের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে চুরি করে আনতে পারল না।

দুঃখ করে লাভ নাই, ইতিহাস কোনদিনই দুর্বলকে ক্ষমা করে না। আজ থেকে একুশ বছর আগে হের হারম্যান মুলার যখন কম্পিত হাতে জার্মানীর মৃত্যুদণ্ডের দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন তখনও ঠিক এমনই ভাবে তাঁর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসে ক্যাম্পেন বনের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সেখানে একজন মানুষ তো দূরের কথা একটা কুকুরকেও দেখা যায়নি

এতদিনকার দেনা যখন একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় মিটে গেল তখন আর ফ্যুয়েরার নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। আনন্দে উচ্ছ্বাসে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। বাচ্চা ছেলের মত, নিয়মকানুনবিহীন পদক্ষেপে অতি দ্রুত দলবলসহ নেমে এলেন কামরা থেকে; তারপর এগিয়ে গেলেন সেই জায়গাটায়, যেখানে তখনও জ্বলজ্বল করে ঘোষণা করে চলেছিল আগের প্রস্তর

ফলকটা—'এখানে এক স্বাধীন জাতির হাতে জার্মানীর গর্ব খর্ব হয়েছে।'

ঠিক সেইখানে—সেই প্রস্তর ফলকের গায়ে নিজের হাতে এক নতুন প্রস্তর ফলক লাগিয়ে দিলেন ফ্যুয়েরার এডলফ হিটলার। তাতে লেখা রইল, 'এখানে এক স্বাধীন জাতির হাতে ফ্রান্সের গর্ব খর্ব হয়েছে।'

ইউরোপীয় রাজনীতির যখন এই অবস্থা, তখন সুভাষচন্দ্রকে বাইরে ছেড়ে রাখাটা ইংরেজের কাছে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়নি। তাই তারা প্রথম থেকেই নানা ছলছুতোয় সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছিল। অবশেষে যখন এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে তখন এই বিদ্রোহী নায়কটিকে একবার গ্রেপ্তার করে আবার ছেড়ে দেওয়াটা সুবিবেচনার কাজ হবে না। অতএব তাঁকে যত রকম মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হোক।

সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝলেন। একবার যখন ইংরেজ তাঁকে জেলের মধ্যে আটকাতে পেরেছে তখন সহজে তাঁর মুক্তি নেই।

অথচ, ওদিকে ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমাগত ঘোরালো হয়ে উঠছে। মিত্রশক্তি একটার পর একটা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এমন এক চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, মাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া আর কোথাও তার পায়ের তলে মাটি নেই। সুতরাং এ অবস্থায় জেলের মধ্যে বসে বসে পচে মরাটা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন যদি বাইরে থাকা যেত, যদি ভারতের বাইরে চলে যাওয়া যেত, যদি রাশিয়া, জার্মানী, কিংবা ইতালী—এর যে কোন একটার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত, যদি এদের সাহায্যে একটা জাতীয় সৈন্য-বাহিনী গড়ে তোলা যেত, এবং সেই সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া [illegible]

দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে উঠত। আর একবার যদি কাঁপন ধরতই তা হলে তাকে আবার জোড়াতালি দেওয়া বৃটিশের সাধ্য হত না।

এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলতে তো আছে এই ভাবত। আব যেখানে যা কিছু এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিযে আছে, ইংরেজ নিজেও জানে, তা নিয়ে গর্ব কবাব কিছু নেই। সাবা ছুনিয়ায ব্রিটিশের এই যে বুক ফুলিয়ে চলা—সেতো ভাবতবর্ষ আছে বলেই না। যদি ভাবতে ওদেব সাম্রাজ্য না থাকত তা হলে ওদেব কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করত না।

সেই ব্রিটিশেব দর্পচূর্ণ হতে বসেছে জার্মাণীব হাতে। এ সময় যদি ভাবতবর্ষে ধাক্কা দেওয়া যায তা হলে দেখতে দেখতে সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠবে। ব্রিটিশ সিংহ মুহূর্তে পশুবাজ থেকে মেষ শাবকে পবিণত হযে যাবে।

দিন নেই, বাত নেই, সুভাষচন্দ্রের মাথায় সেই এক চিন্তা, কি কবা যায়; কিভাবে দুবন্ত সংগ্রাম শুরু করা যাবে, কিভাবে আমরা আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পেঁীছতে পারব।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয় হবেই এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েও বৃটিশ সবকার ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে না। সুতরাং ভারতবাসীকে নিজেদেব স্বাধীনতা নিজেদের চেষ্টাতেই আদায় করে নিতে হবে। অতএব ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে সকল শক্তি অংশগ্রহণ করেছে, ভারত যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে তারপক্ষে স্বাধীনতা আদায় করাটা অনেক সহজ হবে।

কিন্তু এ কাজ করবে কে? কে নেবে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের [illegible]

[illegible]

অসম্ভব। গান্ধীজীকে এ ব্যাপারে মোটেই বিশ্বাস করা চলে না। যার কাছে দেশ এবং দলের থেকে তথাকথিত অহিংসার নীতিই বড ; যিনি নীতির চুলচেরা বিচারে, কোন আন্দোলন শুরু হওয়ার পর নির্দ্ধারিত পথের বাইরে বিন্দুমাত্র পদচ্যুতি ঘটেছে এই অভিযোগে আন্দোলনের সাফল্যলাভের চরম মুহূর্তেও সে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন না, তাঁর উপর ভরসা করে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেবার অর্থ জেনে শুনে দেশবাসীকে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দেওয়া। না, সুভাষচন্দ্রের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

মহা চিন্তায় পড়লেন সুভাষচন্দ্র। যেভাবেই হোক একটা পথ তাঁকে বের করতেই হবে। এ সুযোগ একবার হারালে আর কোন দিন ফিরে পাওয়া যাবে না। আর কোনদিন ব্রিটিশ সিংহকে এমন মৃতপ্রায় অবস্থায় গলা টিপে ধরা যাবে না। তখন আফশোষে হাতের আঙ্গুল কামড়ান ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোন পথ থাকবে না।

চিন্তাটা সুভাষচন্দ্রের মাথায় আজ নয়, ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই এসেছিল। তিনি তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন, ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া যেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাতে যুদ্ধ লেগে যেতে খুব বেশীদিন লাগবে না। যে কোন সময় একজন আর একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। এখন অপেক্ষা করা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ভাল রকমের ছুঁতো খুঁজে বের করার জন্য। যুৎসই একটা ছুঁতো পেয়ে গেলেই শুরু হয়ে যাবে তুলকালাম কাণ্ড।

চতুঃশক্তির মধ্যে মিউনিক চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার খবর যেদিন ভারতবর্ষে এসে পেঁছিল সেদিনই সুভাষচন্দ্র বললেন, 'মিউনিক চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে শুধু চেকশ্লোভাকিয়ারই বিনাশের কারণ হবে না, যে মহাযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এ কাজ করা হল—তা খুব শীঘ্রই শুরু হবে।'

সুভাষচন্দ্রের অনুমান যে কত অভ্রান্ত ছিল পরবর্তী কালের ইতিহাসই তা তথাকথিত নেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ঊনচল্লিশের গোড়াতেই সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, এবার তৈরী হবার সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'মনে রাখতে হবে, ইংল্যাণ্ডের বিপদ মানেই ভারতের সুযোগ। কোনমতেই আমরা এ সুযোগকে অবহেলা করতে পারি না। সেটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বরং সকলে মিলে তার উলটো সুর গাইতে লাগল।

গান্ধীজী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'মানবিক দিক থেকে এ যুদ্ধে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বৃটিশ ও ফ্রান্সের দিকে। আমি লর্ড লিনলিথগোকে বলেছি, ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ভবন কিংবা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা সত্যিই অসম্ভব। সে কারণেই আমি ঠিক এই মুহূর্তেই ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবছি না। ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স যদি তাদের স্বাধীনতা হারায় তাহলে কি হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে?'

নেহরুও বললেন ঐ একই কথা, 'বৃটিশ এখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এখন যদি আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করি তাহলে সমগ্র বিশ্ববাসী আমাদের মুখে থুথু দেবে।'

ওদিকে কিন্তু তখন জেলখানায় বসে সুভাষচন্দ্র দিনরাত একটা কথাই চিন্তা করে চলেছেন। ঐ একটা প্রশ্নই তাঁকে বার বার নাড়া দিচ্ছে। এবার আমরা কি করব? আত্মহত্যা, না মুক্তি?

অনেক চিন্তা ভাবনার পর এক সময় তিনি নিজেই একটা সিদ্ধান্তে এলেন।

না, কারো ভরসায় থাকা চলবে না ; কারো অনুগ্রহলাভের জন্য অপেক্ষা করা হবে না। তিনি নিজেই এই দায়িত্ব পালন করবেন। নিজেই এগিয়ে যাবেন ভয়ঙ্করের পথে—সূর্যতোরণের সন্ধানে।

মনে পড়ল ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। অনেকদিন আগে একজনের অটোগ্রাফের খাতায় তিনি নিজেই তো লিখেছিলেন, 'বাঁধা রাস্তার বাইরে অজ্ঞেয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী-জীবন, সেই জীবন আমাকে বেশি করে টানে। জীবনে যন্ত্রণা থাকতে পারে, কিন্তু সুখও আছে ; অন্ধকার প্রহর থাকলেও রাতপোহান সকালও আছে। আমি আমার দেশবাসীকে ডাকছি—এই পথে এস।'

আর কোন দ্বিধা নয়, কোন প্রশ্ন নয়। এখন থেকে শুধু এক চিন্তা—যেভাবেই হোক, জেলখানার এই অন্ধকার ভেঙে তাঁকে বের হতেই হবে আলোর সন্ধানে। তাতে যদি জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয় তো, তিনি তাই নেবেন। কুছ পরোয়া নেহি। এ জীবন তো অনেক আগেই দেশমাতৃকার পায়ে সমর্পিত হয়েছে। সেই অশেষ করুণাময়ীর মনের ইচ্ছা যদি তাই হয় তো হোক—এ নিয়ে তাঁর চিন্তা করার কি আছে

যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল, অমনি শুরু হল কাজ।

সুভাষচন্দ্র কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন চিঠি লিখতে।

বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিনকে সম্বোধন করে লিখলেন নাতিদীর্ঘ চিঠি। সে চিঠিতে বললেন, প্রায় চার মাস ধরে তাঁকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে। যদিও, ইতিমধ্যে তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এবং আইন সভার অধিবেশন মাত্র কয়েকদিন পরেই শুরু হচ্ছে, কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া তাঁর শরীরের [illegible] জেলখানায় থাকলে স্বাস্থ্যের অবনতি ছাড়া [illegible]

নেই। সুতরাং তিনি আশা করেন, সবদিক বিবেচনা করে অচিরেই তাঁর মুক্তির আদেশ দেওয়া হবে।'

চিঠি লেখা শেষ হলে সুভাষচন্দ্র সহবন্দী নরেন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন, 'এমন একটা রোগের নাম করতে পার যে রোগ বাইরে থেকে ডাক্তার সহজে ধরতে পারে না?'

'স্যায়াটিকা।' নরেন্দ্রনারায়ণ অতি উৎসাহে বললেন, 'এ রোগ হঠাৎ ধরা কোন ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এপেনডিসাইটিসও প্রথম অবস্থায় ধরা যায় না।'

'ঠিক আছে, ওতেই হবে।'

হেসে জবাব দিলেন সুভাষচন্দ্র।

আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের দেহে নানা রকম রোগের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। তলপেটের ডানদিকের অসহ্য বেদনায় তাঁর দম বন্ধ হবার যোগাড় হল; তাছাড়া কোমরের যন্ত্রণার তো কোন কথাই নেই। সে এমন যন্ত্রণা যে দু'মিনিট সোজা হয়ে বসে থাকাও অসম্ভব।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন জেলের ডাক্তার। সঙ্গে জেলার মিঃ পাটনি।

অনেকক্ষণ ধরে বুক, পেট, কোমর, পিঠ টেপাটেপি করেও কিছুই বোঝা গেল না। ফলে দু'জনের মুখেই ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। দু'জনেই সিদ্ধান্তে এলেন, বড় ডাক্তার ডাকতে হবে। এ বড় কঠিন ব্যামো। একে সারানো যার-তার কাজ নয়।

কঠিন রোগই বটে! কিন্তু রোগটা যে আসলে কি সেটা সুভাষচন্দ্রই জানেন ভাল। আর কারো পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব [illegible] চেষ্টা করাটাও বাতুলতা।

[illegible] কেউ কেউ ইঙ্গিতে আভাসে কিছুটা বুঝতে পারলেন।

একদিন বিকেল বেলা জেলের মাঠে পায়চারী করতে করতে সুভাষচন্দ্র নরেন্দ্রনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি তোমাকে বাইরে যেতে বলা হয়, পারবে ?'

'বাইরে মানে ?'

নরেন্দ্রনারায়ণের কথার স্বরে বিস্ময়ের সুর স্পষ্ট।

'বাইরে, মানে জেলখানার বাইরে নয়, একেবারে দেশের বাইরে।'

'সে কি !'

'পারবে যেতে ?'

সুভাষচন্দ্রের গলার স্বর গম্ভীর। নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝলেন, কথাটা শুধুমাত্র কথার কথা নয়—সুভাষচন্দ্র তার কাছ থেকে সুচিন্তিত জবাব চাইছেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ একমুহূর্তও দেরী না করে জবাব দিলেন, 'নিশ্চয় পারব।'

'সংসার, স্ত্রী-পুত্র বাধা দেবে না ?'

'হয়তো দেবে। কিন্তু তা মানব না।'

'এ কাজ করতে গিয়ে বর্তমান, ভবিষ্যত সবটাই ডুবতে পারে, তার জন্য চিন্তা করবে না ?'

'না।'

'ভয় পাবে না ?'

'না।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করলেন সুভাষচন্দ্র। মনে হল, এক অদূর সম্ভাবনার দুয়ারের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর গলার স্বর একেবারে নীচু পর্দায় নামিয়ে এনে অত্যন্ত ধীর, অথচ দৃঢ়স্বরে বলে চললেন, 'আমি অনেক চিন্তা করে শেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি। আজ সমগ্র জাতির সামনে এক অপূর্ব সুযোগ দেখা দিয়েছে। কোন পরাধীন দেশের ভাগ্যে এমন সুযোগ

দৈবাৎ আসে। আমাদের জীবনে এ সুযোগ আর একবার এসেছিল, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে—সেই উনিশ শ' চৌদ্দ সালে। সে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সেদিন নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারীর মত লোকেরা। কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হতে পারেন নি।'

হঠাৎ গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্র নরেন্দ্রনারায়ণকে বললেন, 'তুমি হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে। আমাকে ওরা আপাতত ছাড়বে না। তাই প্রথম কাজের ভার তোমাকেই নিতে হবে।'

'কি কাজ ?'

নরেন্দ্রনারায়ণ জানতে চাইলেন।

'অনেক বিপদের কাজ। সম্পূর্ণ জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। একবার ঘর ছেড়ে বার হলে আর পিছনে তাকালে চলবে না।'

'কিন্তু কাজটা কি সেটা তো বলবেন।'

'তোমাকে রাশিয়া যেতে হবে।'

'এ্যাঁ !

নরেন্দ্রনারায়ণ যেন নিজের কান দুটোকেই আর বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি', সুভাষচন্দ্র বললেন, 'আজ নয়, অনেকদিন ধরেই আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। এর আগে একবার যাবার প্রায় সব ব্যবস্থাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ সন্দেহ হল, হয়তো সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর আমার পরিকল্পনা জেনে ফেলেছে। তাই যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। অবশ্য আর একজনকে পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেও বেঁকে বসল। ফলে আমাকে পরিকল্পনাটা আপাতত: মুলতুবি করে রাখতে হয়েছে।'

এতদিন পরে সেই মুলতুবি পরিকল্পনা আবার চালু হল।

দেখতে দেখতে রোগের ধাক্কায় সুভাষচন্দ্র কাহিল হয়ে পড়লেন। ভয় পেয়ে জেলার মিঃ পাটনি ফোন করলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। সেখান থেকে খবর গেল সুভাষচন্দ্রের দাদা ডাঃ সুনীল বোসের কাছে। খবর পেয়ে তিনি এসে হাজির হলেন জেলখানায়।

বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চলল রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য। কিন্তু তেমন কিছুই বোঝা গেল না। তবে এই না বোঝাটা যাতে বাইরে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেজন্য ডাঃ বোস সুভাষচন্দ্রকে একটা ইনজেকশন দিলেন। একেবারে সাধারণ গ্লুকোজ ইনজেকশন। হয়তো ছোটভাইয়ের আসল অসুখটা তিনি ঠিকই ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেটা কেউ যাতে ধরতে না পারে তারজন্যই এই কৌশল অবলম্বন। যাবার সময় জেলার পাটনিকে বলে গেলেন, 'অপারেশন ছাড়া এ রোগ সারবে না। তবে তার আগে খাইয়ে দাইয়ে দেহটাকে বেশ ভালরকমের চাঙ্গা করে তুলতে হবে। তা না হলে রোগীর পক্ষে অপারেশনের ধাক্কা সহ্য করা মুসকিল হবে।'

জেলার মিঃ পাটনি ডাঃ বোসের সঙ্গে একমত হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি সুভাষবাবুকে খাইয়ে দাইয়ে চাঙ্গা করে তুলবই।'

পাটনির কথা শুনে মনে মনে খুব একচোট হেসেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কদিন পরেই সে হাসির কারণ জানা গেল।

ছাব্বিশে নভেম্বর সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত: উনত্রিশে নভেম্বর থেকে মুক্তির দাবিতে তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন।

এই অনশনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ঐদিন সুভাষচন্দ্র বাংলার গভর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সেই চিঠির [illegible] চিরকালের জন্য লিখিত হয়ে গেছে। ঐ চিঠিতে সুভাষচন্দ্র [illegible]:

'গত ত্রিবিশে অক্টোবর উনিশ শ' চল্লিশ, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখেছি (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও ঐ চিঠির নকল পাঠান হয়েছে)। ঐ একদিনে এবং গত চৌদ্দই নভেম্বর আমি প্রেসিডেন্সী জেলের অধিকারিককে দু'খানা গোপনীয় চিঠি দি ছি। আমার অনুরোধে সে চিঠিও বাংলা সরকারের কাছে পাঠা হয়েছে। বর্তমান চিঠিতে আমার নিজের সম্পর্কে যা বলার তা তার পুনরুক্তি করব এবং আমার জ বনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক তে ক শাজ বাধ্য হলাম, তাও লিখিতভাবে দে ব।

আপনা দের দ্বারা আমার প্রতি অবিচারের বিন্দুমাত্র প্রতিকার হবে এমন দুরাশা আমার নেই। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে মা দুটো অনুরোধ জানাব। দ্বিতীয় অনুরোধটা থাকবে আমার চি র শেষের দিকে। আমার লেখা এ কের এই চিঠিখানা সরকারী মহাফেজখানায় সযত্নে র । বার ব্যবস্থা যেন হয়, এটাই আমার প্রথম অনুরোধ। ভবিষ্য ৎ আপনাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যারা আসবেন, আমার সেই সব স্ব দেশবাসী যাতে এই চিঠি দেখার সুযোগ পায় তার জন্যই এই অনুরোধ। তা ছাড়া এতে আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটা আবেদন রয়েছে এবং সে কারণে এটা আমার রাজনৈতিক জীবনের ইচ্ছাপত্র।

কোন রকমের যুক্তি কিংবা কারণ না দেখিয়েই উনিশ শ' চল্লিশের দোসরা জুলাই ভারতরক্ষা বিধানের এক শ' উনত্রিশ ধারায় আমাকে বাংলা সরকার গ্রেপ্তার করেন। পরবর্তীকালে সরকারী ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম শোনা যায় হাউস অব কমন্স-এ ভারত সচিব মিষ্টার এ্যামেরীর মুখে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, কলকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট বিলোপ করার আন্দোলন সম্পর্কেই আমাকে বন্দী করা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কার্যতঃ বঙ্গীয় বিধান সভায় এই উক্তি

অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের জন্যই আমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। সরকার এই মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই আন্দোলন উপলক্ষে বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, এম, এল, এ এবং আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। উনিশ শ' চল্লিশ সালের আগষ্ট মাসের শেষদিকে এই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতরক্ষা আইনের এক শ' উনত্রিশ ধারা অনুযায়ী আমাকে সাময়িকভাবে আটক রাখবার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে ছাব্বিশ ধারা অনুযায়ী আমাকে স্থায়ীভাবে আটক রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছাব্বিশধারা অনুযায়ী নতুন আদেশ জারী হবার পর আমাকে জানান হল যে, ভারতরক্ষা আইনের আটত্রিশ ধারানুযায়ী আমার বিরুদ্ধে দু'জন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার কারণ হিসেবে দেখান হয়েছে আমার তিনটে বক্তৃতা এবং আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় লিখিত আমার একটা প্রবন্ধ। দুটো বক্তৃতা আমি উনিশ শ' চল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিয়েছিলাম; তৃতীয় বক্তৃতাটা দিই এপ্রিলের গোড়ার দিকে। আগষ্ট মাসের শেষ দিকে ভারতরক্ষা আইনের একটি ধারা বলে আমাকে সরকার স্থায়ীভাবে আটকের ব্যবস্থা করলেন এবং ঐ আইনেরই অন্য একটি ধারা বলে বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনালে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এক অভিনব এবং অভূতপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন। শাসন বিভাগীয় হুকুম এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার এমন সম্মেলন এর আগে আমি দেখিনি। এ নীতি সুস্পষ্ট ভাবে বে-আইনী, অন্যায় এবং খোলা-খুলায় প্রতিহিংসাপরায়ণ।

এটা কারো দৃষ্টি এড়াবেনা যে, তথাকথিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অনেক পরে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধ প্রচারের জন্য পত্রিকাটির পাঁচশ টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে শাস্তিস্বরূপ আরো দু' হাজার টাকা জামানত জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অধিকন্তু পত্রিকাটির উপর এই আক্রমণ ঘটেছিল অত্যন্ত অতর্কিত ভাবে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পত্রিকাটিকে আগে থাকতে সতর্কও করা হয়নি।

সরকারী আচরণের মুখোস আরো নগ্নভাবে খুলে পড়ে, যখন দু'জন বিচারকের কাছে আমার জামীনের জন্য আবেদন করা হয়। সরকারী মুখপত্র দুটো আবেদনেরই তীব্র বিরোধিতা করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব ওয়ালি-উল ইসলাম আমার আবেদন মঞ্জুর করে মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, সরকার যদি ভারতরক্ষা আইনের ছাব্বিশ ধারানুযায়ী বিচারবিহীন আটক আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তাহলে তার এই আদেশ নিষ্ফল হবেই। এ থেকে একটা কথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সরকার একদিকে বিচার-বিভাগীয় মতামতের উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছেন, অন্যদিকে শাসন-বিভাগীয় আইন-প্রয়োগও অসম্ভব করে তুলেছেন। প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলি আরো আপত্তিজনক হয়ে উঠেছে এই কারণেই যে, তাঁরা এ সব ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নির্দ্দেশকে আদৌ আমল দিতে চান না।

দুজন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একই সময়ে আমার বিচারের ব্যবস্থা করে সরকার বিষয়টি আরো বেশ জটিল করে তুলেছেন। আমার একাধিক বক্তৃতার জন্য মামলা করাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে দু'জন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তা না করলেও চলত। কারণ, গত এক বছরে কলকাতাতেই আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। সাধারণ মানুষ তাই মনে করে যে, সরকার আমাকে শাস্তি দিতে

বদ্ধপরিকর এবং এই কারণেই একটা মামলা ফেঁসে গেলেও আর একটায় যাতে আমাকে সাজা দেওয়া যায় তারজন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যে কোন পক্ষপাতহীন মানুষের কাছে সরকারী আচরণ একান্ত হীন ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে হবেই। বিশেষ করে এটা আরো এই কারণে যে, তথাকথিত সরকার বিরোধী অনাচার অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদি সত্যই আমার আচরণ আইন বিরোধীই হয়ে থাকে, তাহলে সরকার সে সময়, যখন তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন তার প্রতিবিধান করলেন না কেন?

আমার একটা অনুরোধ আছে। ভারতরক্ষা আইনে বন্দী মুসলমান আর আমাদের মত লোকদের প্রতি এই সরকারী আচরণ একমুহূর্তের জন্যও কি একটু তুলনা করে দেখবেন? কোন কারণ বা কৈফিয়ত না দেখিয়ে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী কতজন মুসল-মানকে আজ পর্যন্ত মুক্ত করা হয়েছে, সে কথা সরকার জানাবেন কি? সাম্প্রতিককালের মুচিপাড়ার মৌলবীর ব্যাপারটা আজো সকলের মনে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের কি আজ এ কথাই মেনে নিতে হবে যে, এই সরকারের শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানের জন্য এক আইন আর হিন্দুর জন্য ভিন্ন আইন চালু হয়েছে? এবং একথাও কি স্বীকার করে নিতে হবে যে, মুসলমানের জন্য ভারতরক্ষা আইনের অর্থ ভিন্নতর হবে? যদি তাই হয়, সরকারী এই নীতি পরিস্কার করে জানিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

আমার এই বন্দীজীবনের জন্য ভারত সরকার দায়ী, বাংলা সরকার নন, এমনি একটা বিতর্কমূলক কথা উঠলেও উঠতে পারে। এর জবাবে আমি এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমার সম্বন্ধে যে মুলতুবী প্রস্তাব পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র উত্থাপন করেছিলেন তার জবাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে

বলা হয়েছিল, যেহেতু বাংলা সরকার আমাকে কারারুদ্ধ করেছেন, সেই হেতু কেন্দ্রীয় আইনসভায় আদৌ এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আমার মনে হয় বাংলা সরকারের মন্ত্রীও এ ধরণের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

এই সঙ্গে আমরা এ কথাও ভুলে যেতে পারি না যে, বর্তমানে আমরা 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীসভার সদাশয় আশ্রয়ে বাস করছি।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচন আর একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। [illegible] সদস্যরা—কেউ যদি বন্দীও থাকেন, তবে সে অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন কিনা এ প্রশ্নটি বড়। [illegible] নির্বাচিত থাক আর না থাক, প্রতিটি পার্লামেন্টের এটা একটা মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার অর্জন করা হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। এই সেদিন বোম্বাই সরকার একজন দণ্ডিত আসামীকে তাঁদের আইনসভায় যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু দণ্ডিত না হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আমাদের 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীরা সে অধিকার দিতে নারাজ।

সরকারের সমর্থনে হাউস অব কমন্সে ক্যাপ্টেন র‍্যামজের মামলা উল্লেখ করা হয়, আমি এ কথা বলতে চাই যে, ক্যাপ্টেন র‍্যামজের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। গুরুতর অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। অভিযোগগুলোর সব কথা আমাদের জানাও নেই। কাজেই কোন পক্ষের হয়ে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন র‍্যামজেকে বন্দী করা নিয়ে গ্রেটব্রিটেনে অবস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিষ্টার কেনেডি এবং আরও অনেকে নাকি বলেছেন যে, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে যদি ক্যাপ্টেন র‍্যামজেকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে কিংবা তিনি যদি সুবিচার থেকে বঞ্চিত হন। তবুও ক্যাপ্টেন র‍্যামজে হাউস অব কমন্স-এর একটা কমিটির মারফত তাঁর নথিপত্র পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন।

আমার বন্দী জীবন সম্পর্কে বিচার করতে হলে দুটি ব্যাপক প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে। প্রথমত, ভারত-রক্ষা-বিধান ন্যায়ানুমোদিত এবং জনমত-গ্রাহ্য কিনা; দ্বিতীয়ত, আইনের সিদ্ধান্ত আমার সম্পর্কে যথাযথ প্রযুক্ত হয়েছে কিনা। দুটোর উত্তরই নেতিবাচক।

ভারত-রক্ষা-বিধানের পেছনে কোন প্রকার নৈতিক সমর্থন নেই, কেন না ঐ বিধানের দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তদুপরি এই বিধান রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনে। একথা সর্বজনবিদিত যে, ভারতীয় জনগণের কিম্বা ভারতীয় আইন পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে নামানো এবং যুদ্ধরত দেশগুলির সামিল রূপে ঘোষণা করা হয়েছিল। অহরহ বলা হয় যে, বৃটেন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে রত হয়েছে; এই বিধান সেই সোচ্চার ঘোষণার পরিপন্থী। শেষ কথা, কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দল ভারতরক্ষা আইন বা বিধি কেন্দ্রীয় পরিষদে পাস করিয়ে নেবার সময় কোনটারই সমর্থক ছিল না। এই সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন বা বিধি ভারত-দমন-বিধান অথবা অনাচার রক্ষা আইন নামে অভিহিত করাই কি যুক্তি সঙ্গত ও অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে না?

বঙ্গীয় সরকারের তরফ থেকে যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, যেহেতু ভারত-রক্ষা-আইন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই হেতু প্রাদেশিক সরকার এর বিধি মেনে চলতে বাধ্য। বিধি-গুলি যে-ভাবেই বা যার দ্বারাই চালু হয়ে থাক না কেন, এর আগে অনেক যুক্তি দিয়ে আমি দেখিয়েছি যে, আমার বেলায় এই বিধির যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। অন্যায় ও অবিচার সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। একটি মাত্র কারণ আমি এই বিদ্বেষমূলক আচরণের পেছনে দেখতে পাই—তা হল, আমার প্রতি সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসা। কারণ? তা আমার অজ্ঞাত

আমার বিবেকের দুয়োরে আমি আজ বারবার করাঘাত শুনতে পাচ্ছি। জীবনে এই সংকট মুহূর্তে আমাকে পথ খুঁজে বার করতেই হবে। পারিপার্শ্বিকতার এই ঔদ্ধত্য কি মুখ বুঁজে স্বীকাব করে নেব? অথবা এই ন্যায়-নীতি বিগর্হিত অবিচারেব বিরুদ্ধে জানাব আমাব প্রতিবাদ? বিশেষ এবং একাগ্র চিন্তার পর আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেও গেছি। এদেব এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি নতি স্বীকাব কবব না। অন্যায় কবাব চাইতেও অন্যাযের কাছে মাথা নত কবা গুরুতব অপবাধ। কাজেই প্রতিবাদ আমাকে কবতেই হবে।

কিন্তু প্রতিবাদও কম হযনি। চিবাচবিত সর্ববিধ প্রতিবাদ জানান হয়েছে। জানান হযেছে সংবাদপত্রে, সভা-সমিতিতে। সবকাবেব কাছে আবেদন, দাবি, আইনানুগ প্রতিকাব-চেষ্টা,—বাকি নেই কিছুই। কিন্তু শাসন যন্ত্রকে টলান যায়নি। তার প্রাণে বিন্দু পবিমাণ বেখাপাতও কবেনি। একটি মাত্র পথ আজো খোলা আছে,—বন্দী জীবনেব শেষ অস্ত্র,—প্রায়োপবেশন বা অনশন।

যুক্তির অচঞ্চল আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষযটি আমি পর্যালোচনা করেছি। ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, দুটোই ভেবে দেখেছি সমান ভাবে। আমার মনে কোন প্রকাব ভ্রান্ত আশা নেই। আমি পরিপূর্ণ সচেতন। আমি জানি, আশু কিম্বা এই ক্ষণের কোন সুরাহা এতে ঘটবে না। শাসন কাঠামো এবং আমলাতান্ত্রিক আচরণ আমার অত্যন্ত জানা। এই মুহূর্তে আমার মনমুকুরে ভেসে উঠছে টেরেন্স ম্যাকস্যুইনীর আর যতীন দাসের শাশ্বত এবং [illegible] আলেখ্য। শাসনযন্ত্র নিষ্প্রাণ। ও টলে না। গলেও না। কিন্তু এর আছে জুয়ো বালাই। ও তাই আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমার জীবনের চারপাশে এক অসহ্য অবস্থা [illegible] [illegible] অন্যায় আর অবিচারের সঙ্গে আপোষ [illegible] [illegible] [illegible] করা আমার মূল [illegible]

আপোষের বিনিময়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু বরণ আমার কাছে শ্রেয়। সরকারের পাশব শক্তি আমাকে কারাগারে আটকে রাখতে চায়। আমার জবাব স্পষ্ট: মুক্ত কর আমাকে, নইলে এ জীবনে আমার প্রয়োজন নেই। আমি বাঁচব কিম্বা মৃত্যুই বরণ করে নেব, তার বিচার দায়িত্ব শুধু আমারই। আর কারো নয়!

আমি জানি, এই মুহূর্তে হয়তো কোন প্রত্যক্ষ ফল ফলবে না; কিন্তু কোন আত্মবলি আর দুঃখ-বরণ বৃথাও যায় না। সর্বদেশে আর সর্বকালে একমাত্র দুঃখ-বরণ আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়েই আদর্শ, সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠে। 'শহীদের রক্তের ওপরেই গড়ে ওঠে মন্দির'—শাশ্বত এই বাণী সার্থক হবেই।

নশ্বর জগৎ। সবই মরে যায়, আর যাবেও। কিন্তু আদর্শ ভাবধারা আর উর্দ্ধমুখী স্বপ্ন মরে না। আদর্শের প্রেরণায় ব্যক্তি বিশেষ হয়তো নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই অমৃত আদর্শ সহস্রের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে। এমনি করেই মৃত্যুর বুকের ওপর ফুটে চলে নবজীবনের নবতম ছন্দ। মৃত্যুবেদী হয়ে ওঠে নব সৃষ্টির প্রসূতি। আদর্শ, ভাবধারা আর স্বপ্ন যুগ থেকে যুগান্তরে রূপায়িত হয়ে ওঠে। আহুতি আর নির্যাতনকে সঙ্গী না করে কোন আদর্শইবা সার্থকতার সন্ধান পেল?

বহৎ আদর্শ আশ্রয় করে বাঁচা আর মরা,—জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি আছে? জীবন কোষের সমিধ দিয়ে অনির্বাণ করে রাখতে হবে প্রাণ যজ্ঞের হোমাগ্নি। অসমাপ্ত কর্মযোগ পূর্ণতা পাবে পরবর্তী জীবনে। মৃত্যুর বিনিময়ে যে জীবন উঠল ফুটে, তার ধ্রুববাণী পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে তার দেশ-জননীর শ্যামল বুকে। দিগ্‌বিদিকে। সাগর ডিঙিয়ে সুদূর ভিন্‌দেশের তটভূমি শুনতে পাবে সেই অমর বাণী। আদর্শের বেদীমূলে এমন মহান আত্মোৎসর্গের মধ্যেই না লুকিয়ে থাকে জীবনের মহত্তম অবলুপ্তি।

কে বলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সর্বহারা হতে হয়? মাটির পৃথিবীর কোলে টলে পড়েও আর জীবন কি ফুটে উঠবে না শতদল পদ্মের মত—যার মর্মকোষে ভরা থাকে অমৃতের ঝর্ণাধারা?

এই অবিনশ্বরতাই আত্মার প্রকৃত রূপ। ব্যক্তির মৃত্যুর বুকে জাতির জীবন ফুটে উঠুক। তাইতো এমন করে আজ মৃত্যু আমার কাম্য আর প্রিয় হয়ে উঠেছে। আমার জীবনের বিনিময়ে আমার স্বদেশ, আমার ভারতবর্ষ লাভ করবে অবিনশ্বর জীবন, পাবে স্বাধীনতা, পাবে অনন্ত ঐশ্বর্যের উপকার।

এইবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলব : একথাটা ভুলো না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেয় না যে, অবিচার আর দুর্নীতির সংগে আপোষ করবার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখ সেই শাশ্বত নীতি : জীবনকে পরিপূর্ণ করে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। আর মনে রেখ, সর্বোচ্চ ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে অবিরাম।

বর্তমান সরকারকে আমি বলে যেতে চাই : সাম্প্রদায়িকতা আর অবিচারের পথে আপনাদের ঐ উন্মাদ অভিযান সংহত করুন। আজো সময় আছে। আপনাদের পদক্ষেপ সংযত করুন। আপনাদের তৈরী মৃত্যুবাণে একদিন আপনাদের প্রাণ সংশয় হবে। বাংলার বুকে আর একটা সিন্ধু সৃষ্টি করবেন না।

আমার বলা শেষ। আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ আপনাদের কাছে, আমার অনশন নিয়ে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ যেন না করা হয়। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে আসুক শান্তির কোলে, এইটুকুই আপনাদের কাছে কামনা রইল। টেরেন্স ম্যাকসুইনী, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধী এবং উনিশ শ' ছাব্বিশে আমাদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশন সম্পর্কে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি আশা করব, এবারও অনুরূপ সিদ্ধান্তই

নেওয়া হবে। নতুবা আমাকে গায়ের জোরে খাওয়াবার চেষ্টা করলে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তা প্রতিরোধ করব এবং তার পরিণাম হবে আরও ভয়াবহ এবং বিপর্যয়কর।

আমি উনিশ শ' চল্লিশ-এর উনত্রিশে নভেম্বর থেকে অনশন শুরু করব।'

চিঠি লেখা শেষ হলে চিঠিটা তুলে দিলেন জেলার পাটনির হাতে, যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে জেলার চিঠিটা পাঠিয়ে দিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

বিকেলবেলা পাটনি এলেন ডঃ সুনীল বসুকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষ-চন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে।

ডঃ বসু সুভাষের নাড়ীর গতি থেকে শুরু করে ব্লাডপ্রেসার, বুক, পিঠ, জিভ—সবকিছুই পরীক্ষা করে দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর পাটনির দিকে চেয়ে বললেন, 'সুভাষ আগের থেকে অনেকটা সেরে উঠেছে দেখছি।'

'কিন্তু অবস্থার হঠাৎ অবনতি ঘটাটাও তো মোটেই আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়।'

পাটনি তার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

'কথাটা ঠিক।' ডাঃ বসু বললেন, 'ভাবছি, একটা ইনজেকসান দেব নাকি।'

'না।'

দৃঢ়স্বরে আপত্তি জানালেন সুভাষচন্দ্র।

'আপত্তিটা কোথায়?'

সুভাষের অসম্মতির কারণ জানতে চাইলেন ছোটদা সুনীলচন্দ্র

'না।'

সেই এক জবাব দিলেন সুভাষ

ছোটভাইকে ভাল করেই চিনতেন সুনীলচন্দ্র। তাই আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। নিজের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে বেরিয়ে এলেন সেল থেকে। সঙ্গে জেল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য এলেন পাটনি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন পাটনি। একটা চেয়ার টেনে বসলেন সুভাষচন্দ্রের সামনে। বললেন, 'একটা কথা বলতে এলাম মিষ্টার বোস।'

'কি কথা ?'

সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন।

'এ পথে না গেলেই কি নয় ?'

অনুরোধের সুরে কথাটা বললেন মেজর পাটনি।

সুভাষচন্দ্র জবাব দিলেন, 'আমার চিঠিতো আপনি পড়েছেন। তাতেই তো আমি সব কথা বলেছি।'

'তা ঠিক। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। এতে সরকারের মন হয়তো গলবে না। আসলে ওরা একবারে অন্য ধাতুতে গড়া।'

'কি জানি। তবে আমি যখন একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তখন শেষ পর্যন্ত তাতেই অবিচল থাকব।'

সুভাষচন্দ্রের জবাব শুনে পাটনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস সুরে বললেন, 'এদেশের দুর্ভাগ্য যে, আপনাকে এমন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হল।'

কথাগুলো বলে পাটনি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

উনত্রিশে নভেম্বর। সকাল বেলা।

পাটনি এসে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। জানতে চাইলেন, জোলাপ নেওয়া হয়েছে কিনা। উপদেশ দিলেন, নিয়মিত স্নান, ঘুমানো ইত্যাদি রুটিন মাফিক করার জন্য।

ঠিক বেলা দশটার সময় সুভাষচন্দ্র স্নান করলেন। স্নান সেরে কিছুক্ষণের জন্য এসে বসলেন দালানে। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

এভাবে চলল কয়েকদিন। শেষে ডাক্তাররা ভয় পেয়ে গেলেন। বার বার নাড়ির গতি মেলান চলল ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। ব্লাড-প্রেসার পরীক্ষা হল নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি দেখে মনে মনে দারুণ ঘাবড়ে গেলেন জেলার পাটনি। দুশ্চিন্তায় তার চোখে মুখে নেমে এল কালো মেঘের ছায়া। তিনি ব্যাপারটা জানালেন তার ওপরওয়ালাকে।

সুভাষচন্দ্রের মনে সন্দেহ হল, হয়তো ওরা এবার জোর করেই তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টা করবে।

কথাটা যেমনই মনে এল অমনই [illegible] টেবিলের উপর রাখা সাদা প্যাডখানা টেনে নিয়ে লিখতে বসলেন:

'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ।

এই চিঠিতেই আমি আপনাদের কাছে আমার শেষ আবেদন জানাব।

এর আগেই আমি আমাকে জোর করে না খাওয়াবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছি। সে চিঠিতে আমি একথাও জানিয়েছি যে, আমার অনুরোধ সত্বেও যদি সে চেষ্টা হয়ই, তবে আমি আমার সমগ্র শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হব। হয়তো এর পরিণাম হবে আরো ভয়াবহ।

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে লেখা আমার তিরিশে অক্টোবরের চিঠিতে এবং সরকারকে লেখা ছাব্বিশে নভেম্বরের চিঠিতে আমার বর্তমান অবস্থা আমি অত্যন্ত পরিস্ফুট করে উপস্থাপিত করেছি। জেল কর্তৃপক্ষের কানাঘুষো থেকে আমার মনে হয়েছে যে, আমার বেলায় জোর করে খাওয়াবার কল্পনা এখনো পরিত্যক্ত হয়নি। আমি এতে বিস্মিত হয়েছি।

ঐ দুটি চিঠিতে আমি যে সব যুক্তি দেখিয়েছি তার পুনরাবতাবণা কবা আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত করা ছাড়া আমার উপায়ও নেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাকে গায়েব জোরে খাওয়াবাব কোন প্রকার চেষ্টা করা সরকারেব তরফ থেকে সম্পূর্ণ বে-আইনা কাজ হবে।

সরকার, তাদের বিচারহীন, বে-আইনা এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক কাজের দ্বারা প্রথমত আমার জীবন দুর্বহ করে তুলেছেন, এবং এই অবস্থায় আমাকে জোর করে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার পিছনে তাদের নৈতিক অধিকাব কোথায়?

এ বিষয়ে সরকার আইনত বলপ্রয়োগ করতে পারেন, এমন কোন আইন আমার জানা নেই। সবকারের কোন বিশেষ বিভাগীয় বিধি আইনের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে যখন সেই সবকারই ব্যক্তিবিশেষেব মৌলিক অধিকাব ও স্বাধীনতা হরণ করে থাকে।

আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও যদি সত্যি সত্যি আমাকে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করাই হয়, তাতে আমার দেহ ও মনের ওপর যে আঘাত দেওয়া হবে, এবং আমি যে কষ্ট পাব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যারা এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে, তাদের প্রত্যেককে নাগরিক অধিকার ভঙ্গের এবং ঘৃণ্য অপরাধের অনুষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।

এতো গেল নীতিগত আপত্তি। অনশনের পূর্বে এবং অনশন শুরু করবার পর থেকে আমার দেহ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে জোর করে খাওয়াবার কথা চিন্তা করাও হবে অসঙ্গত। এই অবস্থায়, এ কথাটা অত্যন্ত পরিস্ফুট যে, বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখবার পরিবর্তে, বলপ্রয়োগ আমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। এবং এর

ফলে সাধারণ বিধি ও দণ্ড আইনের দায়িত্ব আরো বেড়েই যাবে।

এ সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনাদের গোচরে আনা সঙ্গত মনে করি। যদি আমার অসম্মতি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ করা আপনাদের সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে, এই অসহ্য, দীর্ঘ ও বিলম্বিত যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণের পথও আমাকে খুঁজে বের করতে হবেই। একমাত্র আত্মহত্যাই সেই পথ। আর এর সকল দায়িত্ব বহন করতে হবে সরকারকে। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতি সকল আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে, তারপক্ষে আত্মহত্যার সহস্র পথ উন্মুক্ত থাকবে। তার উপর কোন শক্তি তাকে বাধা দিতে পারবে না। আমি সব চেয়ে শান্তির পথ বেছে নিয়েছি। আমাকে এই পথ থেকে গায়ের জোরে সরাতে গেলে আমার মৃত্যুর দুয়োর রুদ্ধ হবে না। পথ হবে শান্তিহীন এবং আরো কষ্টকর। আমার এই অনশন সাধারণ উপোস নয়। এর পেছনে রয়েছে অনেক দিনের সতর্ক এবং নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত। আর আমি এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি পবিত্র কালী পূজোর দিনে। আমার এ অঙ্গীকার পূজোরই নামান্তর।

আগে অনেক বার আমি প্রায়োপবেশন করেছি কিন্তু এই অনশনের রূপ সত্যই সম্পূর্ণ পৃথক। এই প্রকার অনশন আমার জীবনে এই প্রথম।

শুধু খাদ্যই মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাকে সত্যি সত্যি বাঁচবার মত বেঁচে থাকতে হলে নৈতিক প্রেরণা চাই। চাই আধ্যাত্মিক প্রেরণা। এ থেকে বঞ্চিত করে তাকে দিয়ে কারো কারো স্বার্থ বা কূট-কৌশল চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু যথার্থ বাঁচা তাকে বলে না।

গত ছাব্বিশে নভেম্বরের চিঠিতে আমি আপনাদের বলেছি যে, আমার মাত্র দুটি অনুরোধ থাকল আপনাদের কাছে। ছাব্বিশে তারিখের চিঠিখানা আমার শেষ ইচ্ছাপত্র। সরকারী মহাফেজ

খানায় চিঠিখানা সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে আমার প্রথম অনুরোধ। আমাকে আমার আকাঙ্খিত সমাপ্তি-পথে যেতে দিন শান্তিতে, এই আমার দ্বিতীয় অনুরোধ। খুব বেশী কিছু কি চেয়েছি আমি?'

চিঠিখানা শেষ করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। দেখে মনে হল, কোন এক রণক্লান্ত সৈনিক নতুন সংগ্রাম শুরুর আগে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন

যথা সময়ে চিঠি পৌঁছে গেল বাইটার্সে। অথচ সেখান থেকে কোন রকম জবাব আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে চলেছে। যন্ত্রণায় সে বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু কে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে? কার এমন অতিরিক্ত সময় আছে হাতে?

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

সাহেবরা তো চিরকাল-ই লাটসাহেব। এমন ছোট খাটো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময়ই বা তাদের কৈ? এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গেলে কি আর দেশ শাসন করা যায়।

কথাটা সত্যি—সাহেবদের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা মোটেই মানায় না। তাছাড়া ওদের প্রেস্টীজ বলে তো একটা জিনিষ আছে। ওরা একবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একজন গোঁয়ার লোকের অন্যায় জেদের জন্য তো আর তা বদলানো যায় না। তাছাড়া অনশনের ভয় দেখিয়ে কেউ মুক্তি দাবি করলেই যে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে, এমন কথা কোন বাইবেলে লেখা আছে?

আর লেখা থাকলেই বা সে কথা শোনে কে। যতীন দাসের অনশনের সময়ও তো অনেকেই বলেছিল তাঁকে মুক্তি দিতে। কিন্তু সাহেবরা কি সেদিন কারো কথা এতটুকুও কানে তুলেছিল। বরং

জেদাজেদির লড়াইতে ওরাই শেষ পর্যন্ত জিতেছিল মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে লাভ হল এই যে, বেচারা যতীন দাসের আত্মাটাই একদিন বেপাত্তা হয়ে গেল।

সুতরাং সেই সাহেবের দল, সুভাষচন্দ্রের একটা হুমকী শুনেই যে ভয়ে একেবারে গুটিয়ে যাবে, এতটা আশা করা দিবা-স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং এর বদলে হক, নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে কিছুটা ভদ্র ব্যবহার, কিছুটা সহৃদয়তা আশা করাটা অন্যায় হবে না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি হল?

নাজিমুদ্দিন পরিচালিত সরকার সুভাষ বসুর অনশনের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁর চিঠির জবাব দেবার মত ভদ্রতাটুকু দেখাতেও রাজী হল না। ফলে এবারকার চিঠিতেও যে কোন রকম ফল হবে না সেটা সুভাষচন্দ্রও ভাল ভাবেই জানতেন। তবু তিনি চিঠিটা লিখলেন এই আশায় যে হয়তো জোর করে তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টা করা হলে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন এই ভয়েই সরকার তাঁকে জোর জবরদস্তি খাওয়াবার চেষ্টা থেকে বিরত হবেন।

ভিতরে ভিতরে কি ব্যাপার ঘটেছিল তা বাইরে থেকে সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু জানতে কারোই বাকী নেই যে, স্যার নাজিমুদ্দিন এবং জনাব ফজলুল হক—দু'জনেই তখন কলকাতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও সুভাষ বসুর চিঠি পাওয়ার পর রাইটার্সের দোতলার কোটাগুলোতে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী একত্রিত হয়েছিলেন, সুভাষ বসুর অনশন ঘটিত পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল এই আলোচনা। তর্ক-বিতর্ক,

যুক্তি-প্রতিযুক্তি, কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাতে। একদল মত দিলেন, কোন অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে না। তাতে যদি জেলের মধ্যে অনশন করে তাঁর মৃত্যুও ঘটে—সেও আচ্ছা; তবু তাঁকে বাইরে থাকতে দিয়ে নতুন করে ঝামেলা পাকাবার সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না।

আর একদল বললেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সুভাষচন্দ্রকে আর আটকে রেখে লাভ নেই। হঠাৎ যদি জেলের মধ্যে কিছু একটা হয়ে যায়—তা হলে জনতার রুদ্ররোষে কেউই নিস্তার পাবেনা। বরং এখন যদি তাঁকে কিছুদিনের জন্য বাইরে ছেড়ে রাখা যায় তা হলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসবে। তারপর, সুযোগ বুঝে একসময় আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেই চলবে। তা ছাড়া তার নামে তো অনেকগুলো কেস চলছেই। তার একটা না একটাতেও কি তাঁকে ফাঁসানো যাবে না?

দ্বিতীয় দলের মতামতটা অবশেষে সবারই মনঃপুত হল। কারণ, এতে ঝুঁকি কম। অর্থাৎ এই ফর্মূলায় সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না। অতএব……রিলিজ হিম……

খবরটা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সেলের সামনে প্রথম হাজির হলেন মেজর পাটনি।

তখন সুভাষচন্দ্র ঘুমচ্ছিলেন! অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পাটনি এসে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়। ইশারায় ডাকলেন নরেন্দ্র নারায়ণকে। বললেন, 'মিষ্টার বোস ইজ আন্‌কন্‌ডিশ্যনাল রিলিজড্।'

খবরটা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। ইচ্ছে হ'ল প্রচণ্ড চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দেন এই শুভ সংবাদ—সুভাষ আজ মুক্ত; সুভাষ আজ বিজয়ী।

কিন্তু না—এ উচ্ছ্বাসের সময় নয়—এ সময় সংযমের।

কথাটা মনে হতেই নিজেকে একেবারে সামলে নিলেন নরেন্দ্র নারায়ণ। অত্যন্ত শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালেন পার্টনির দিকে। বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

পার্টনি বললেন, 'আপনি আগে যান। ওঁকে প্রথম মানসিক ভাবে তৈরী করুন এ সংবাদ শোনার জন্য। তারপর আমি ঘরে ঢুকব। তা না হলে, হঠাৎ এমন একটা সংবাদ শুনলে উনি হয়ত শকড্ হতে পারেন।'

কথাটা সত্যি। এমন একটা আশাতীত সংবাদ, এমন অসামান্য সাফল্যের সংবাদ শুনে সাত দিনের অনশন ক্লিষ্ট দুর্বল হৃদযন্ত্রের হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠাটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে, বেড়ালের মত পা ফেলে ফেলে নরেন্দ্রনারায়ণ নিঃশব্দে গিয়ে বসলেন সুভাষচন্দ্রের পাশে, বিছানার এক কোণে।

সুভাষচন্দ্র তখন ঘুমচ্ছিলেন।

এ অবস্থায় গভীর ঘুম আসা মোটেই সম্ভব নয়; কারো তা আসেও না। সুভাষচন্দ্রেরও তা আসেনি। তাই নরেন্দ্রনারায়ণ পাশে এসে বসতেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ ঝুঁকে পড়লেন সুভাষের মুখের উপর। ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগলেন কপালে। শেষে মাথাটাকে নামিয়ে এনে, মুখের উপর অনেকটা ঝুঁকে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত অনুমানটাই যে সত্য হতে চলল।'

শুকনো গলায়, অস্ফুটস্বরে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'কি ?'

নরেন্দ্র নারায়ণ বললেন, 'সরকার আপনাকে বিনাশর্তে মুক্তি-দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'কি !'

সুভাষচন্দ্রের গলায় স্বরে প্রচণ্ড বিস্ময়

'সত্যি।'

কি যেন এক প্রবল আবেগে নরেন্দ্রনারায়ণের গলার স্বর ধরে এল তবু তিনি নিজেকে যতটা পারলেন সংযত করে নিয়ে বললেন, 'পাটনি এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

সুভাষচন্দ্রের সমস্ত দেহে এক প্রবল কাঁপুনী শুরু হয়ে গেল। তিনি নিজেকে সংযত করে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চললেন; তব্ এক অজানা আনন্দ, শিহরণ, বিস্ময়ে তার সমগ্র হৃদয় আন্দোলিত হয়ে উঠল। দু'চোখ ভরে এল জলে। শত চেষ্টা স্বত্বেও সে জল বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত গড়িয়ে পড়ল বালিশে–চাদরে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'এবার পাটনিকে ডাকি।'

'ডাকো।'

বিস্ময়াবিষ্টের মত জবাব দিলেন সুভাষচন্দ্র।

নরেন্দ্রনারায়ণের ইশারা পেয়ে পাটনি ঘরে ঢুকলেন। মাথাটাকে একটু হেলিয়ে অভিনন্দন জানালেন সুভাষচন্দ্রকে। তারপর বললেন, 'গেটে এ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করছে—আপনি তৈরী হয়ে নিন।'

কথাটা বলে পাটনি আর অপেক্ষা করলেন না; দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। হয়তো চোখের জলটা যাতে আর কারো কাছে ধরা পড়ে না যায় সেই জন্যই এত সতর্কতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষ্ট্রেচার এসে হাজির। কয়েকজন কয়েদি ধরাধরি করে সুভাষচন্দ্রকে শুইয়ে দিল ষ্ট্রেচারে। ধীরে ধীরে ষ্ট্রেচার এগিয়ে চলল জেল গেটের দিকে—অন্ধকার থেকে আলোর পথে।

পাটনি এগিয়ে এলেন নরেন্দ্রনারায়ণের কাছে। বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে মিষ্টার বোসের কাছে, জেল ছেড়ে যাওয়ার আগে আমি নিজের হাতে তাঁকে গ্লুকোজ খাইয়ে দিতে চাই। আপনি কি দয়া করে আমাকে এই অনুমতিটুকু আদায় করে দেবেন?'

পাটনির কথায় ভাববিহ্বল নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আপনি দাঁড়ান, আমি এখনই বলছি সুভাষবাবুকে।'

প্রস্তাব শুনে সুভাষচন্দ্র প্রথমে একচোট খুব হেসে নিলেন। তারপর পাটনির দিকে চেয়ে বললেন, 'কাম এ্যালোন মিষ্টার পাটনি, গিভ মি গ্লুকোজ ওয়াটার।'

সুভাষের আহ্বানে পাটনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। ষ্ট্রেচারে শায়িত মাথাটাকে বাঁ হাতের কনুই দিয়ে তুলে ধরে আস্তে আস্তে গ্লুকোজের জল ঢেলে দিতে লাগলেন সুভাষচন্দ্রের মুখে।

জল-পান শেষ হলে সুভাষচন্দ্র পাটনির হাত দুটো চেপে ধরলেন। বাষ্পরুদ্ধ গলায় পাটনির চোখ দুটোর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'আই স্যাল নট ফরগেট ইট মাই ফ্রেণ্ড, আই উইল রিমেববার ইউ ফর এভার।'

'থ্যাঙ্কস এ লট মিষ্টার বোস, থ্যাঙ্কস এ লট .....'

কথাটা শেষ হবার আগেই পাটনির চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে ; আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে গেট খুলে যায়। এ্যাম্বুলেন্সের চাকা গড়িয়ে চলে ধীরে পায়ে। সেদিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকে দু'জোড়া নিথর চোখ। পাটনি আর নরেন্দ্রনারায়ণ। দেখে মনে হয়, যেন কত জনমের এক পরমাত্মীয় চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। সে আর কোনদিন ফিরবেনা—আর কোনদিন তাঁর ফেরা হবে না। মাঝখানে জেগে রবে শুধু স্মৃতি...স্মৃতি...আর স্মৃতি।

ইতিমধ্যে ওদিকে আর একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

গান্ধীজী এতকাল ধরে বলে আসছিলেন, বৃটেন যখন জীবন মরণ সংগ্রামে রত সেই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদা হানিকর হবে।' সেই গান্ধীজীই অবশেষে একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার চাপে পড়ে তাঁর মত পাল্টাতে বাধ্য হলেন।

পনেরই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধে বৃটেনকে সহযোগিতার পূর্ববর্তী প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়ে মহাত্মাজীকে পুনরায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাল। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী কংগ্রেসের এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। এবং অক্টোবর মাসে ঘোষণা করলেন যে, তিনি বৃটিশ সরকারের যুদ্ধোদ্যমে বাধাদান করবেন বলে স্থির করেছেন। তবে এ বাধাদান কোন-ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে হবে না।

যেমন সিদ্ধান্ত—তেমনই কাজ। নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই গান্ধীজী পরিকল্পিত আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসহ শত শত লোক গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে গেলেন। তবে এবার একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করার মত হল এই যে, উনিশ শ' একুশ, এবং তিরিশ ও বত্রিশ সালে মহাত্মা পরিচালিত আন্দোলনে যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল—এবার তা আর দেখা গেল না।

অবশ্য প্রথম থেকেই এর পিছনে একটা অত্যন্ত গূঢ় রহস্য কাজ করছিল। যদিও দেশের আপমর জনসাধারণ আগের থেকে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন এবং স্বাধীনতাকাঙ্খী হয়ে উঠেছিল, তবু গান্ধীজী এই আন্দোলনকে তীব্রতর রূপ দেননি এই কারণেই যে, তার মনে তখনো একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজের মন গলাতে পারবেন আলোচনা টেবিলে বসবার জন্য। সেই উদ্দেশ্যেই, আন্দোলনের সময় জনসাধারণের মনে যাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত তিক্ততা সৃষ্টি না হয় সেদিকে তিনি সব সময় লক্ষ্য রেখে চলছিলেন। কারণ, তা না হলে আপোসের রাস্তা যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।

এই যখন পরিস্থিতি তখন জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সুভাষচন্দ্র হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। তিনি গান্ধীজীর কাছে অনুমতি চাইলেন তাঁকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে দেবার জন্যে।

গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, এ অবস্থায় সুভাষকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার অনুমতি তিনি দিতে পারবেন না।

ইতিপূর্বে অবশ্য আরো একবার গান্ধীজীর কাছে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এক প্রস্তাব এসেছিল। প্রস্তাবটি তুলেছিলেন জনৈক কংগ্রেস নেতা। তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছিলেন, অবশেষে মহাত্মাই যখন সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তখন আর মিছিমিছি সুভাষের সঙ্গে বিরোধ জিইয়ে রাখা হচ্ছে কেন? এ অবস্থায় তাঁর উপর থেকে কংগ্রেসের শাস্তিমূলক দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই হবে সমীচীন। তাতে বরং কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পাবে।

কোন রকম যুক্তি তর্ক ছাড়াই গান্ধীজী এককথায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন। বলেন, 'সে যতক্ষণ না তাঁর কৃতকর্মের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে ততক্ষণ তাঁর উপর থেকে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সত্যি, প্রাক্তন সভাপতির প্রতি কংগ্রেসের কি চমৎকার ন্যায্য ব্যবহার! অথচ বাপুজীর এই ন্যায় বিচার জহরলাল কিংবা প্যাটেলের বেলায় যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেটা সম্ভবতঃ 'তিনি নিজেও বলতে পারবেন না।

সে যাইহোক, গান্ধীজীর কথায় রাগ করে বসে থাকলে তো আর সুভাষচন্দ্রের চলবে না। তাঁকে যে করেই হোক পথ খুঁজে নিতে হবেই। এখন আর অপেক্ষা করার সময় নেই—প্রহর গোণারও অবকাশ নেই। এখন তাঁর সম্মুখে এক লক্ষ্য, এক চিন্তা

যে করেই হোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আঘাত হানতে হবেই। ভিতরে, বাইরে—দু'দিক থেকেই। এমন আঘাত—যে আঘাতের পর বৃটিশ সিংহ আর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না, আর ফোঁস করতে পারবে না—চিরকালের জন্য ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে তার উদ্ধত মেরুদণ্ড।

অবশ্য এ সিদ্ধান্তটা অনেক আগেই নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

তখন ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। সম্পূর্ণ ফ্রান্স চলে গেছে জার্মান বাহিনীর দখলে। ভিসিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্শাল পেঁতার সরকার।

সুভাষচন্দ্রের মনে তখন বার বার এই এক প্রশ্ন দেখা দেয়, এবারও কি আমরা প্রথম মহাযুদ্ধকালের মতই ভুল করব? আবারও কি আমরা মাতৃভূমির শৃঙ্খলপাশ মোচনের সুযোগ হেলায় অবহেলা করব?

অবশ্য সেবার চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি, তা নয়। যতীন্দ্রনাথ আর রাসবিহারী তাঁদের যৎসামান্য সঙ্গতিকে সম্বল করেই এগিয়ে এসেছিলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের শপথ নিয়ে; আর তাদের পিছু পিছু এগিয়ে এসেছিল মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের অকুতভয় বিপ্লবীর দল।

সে কথা আজ ভাবলেও গা শিঁউরে ওঠে।

তারিখটা আজ আর স্পষ্ট মনে নেই কারো। তবে সেটা যে উনিশ শ' চৌদ্দ সালের আগষ্ট মাসের একটা বৃষ্টি ভেজা রাত্রি ছিল তাতে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকার কথাই নয়।

রাস্তাটার নাম—ছাতাওয়ালা গলি। বউবাজার থেকে বেরিয়েছে। সেই সঙ্কীর্ণ গলিটার মধ্যে এক অতি জরাজীর্ণ ভাঙ্গা

কুঠুরীর অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে এসে একে একে হাজির হতে শুরু করলেন যুগান্তর, অন্যোন্নতি ও মুক্তিসংঘের নেতৃবৃন্দ।

প্রথমে এলেন নরেন ঘোষচৌধুরী, তারপর হরিদাস দত্ত। এরপর এলেন মানবেন্দ্রনাথ, অনুকূল মুখার্জী, শ্রীশ মিত্র, আশুতোষ রায়, সুরেশ চক্রবর্তী, নগেন দাস, বিমান চন্দ্র, জগৎপতি এবং সবশেষে এলেন শ্রীশ পাল।

শুরু হল সভা। শ্রীশ পাল উঠে সমবেত মৃত্যুভয়হীন মানুষগুলোর সামনে রাখলেন এক অসীম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। বললেন, 'অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায়ী কলকাতার রডা কোম্পানীর কেরানি শ্রীশ মিত্রের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, ঐ কোম্পানীর জন্য বহু টাকার অস্ত্রশস্ত্র কাস্টমস হাউসে আসছে। এ অস্ত্রগুলোর মধ্যে তিব্বতের দালাই লামার অর্ডার অনুযায়ী আসছে পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল, পঞ্চাশটি অতিরিক্ত স্প্রিং এবং পিস্তলের এমন ধারার পঞ্চাশটি খাপ যাদের সাহায্যে পিস্তলগুলোকে রাইফেলের মত করে ব্যবহার করা চলে। এ ছাড়া পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজও এই চালানে রয়েছে। এখন পর্যন্ত যতটা খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে, মালপত্রগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে—এখন অপেক্ষা করা হচ্ছে কেবলমাত্র কাস্টমসের ছাড়পত্রের জন্য। ছাড়পত্র পাওয়া গেলেই মালগুলো রডা কোম্পানীর ঘরে উঠবে। আমার মতে এটাই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। আমরা যদি একটু চেষ্টা করি তা হলেই এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার আমাদের হস্তগত হবে।'

শ্রীশ পালের কথা শেষ না হতেই মানবেন্দ্রনাথ বললেন, 'এটা একটা উন্মাদের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মৃদু হেসে শ্রীশ পাল বললেন, 'কথাটা ঠিক; যতক্ষণ না আমরা এই অভিযানে সাফল্য লাভ করতে পারছি ততক্ষণ এটা যে-কারো চোখেই পাগলামী বলে মনে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনারা এই পাগলামী নিয়ে থাকুন। আমি এর মধ্যে নেই।'

কথাটা বলেই উঠে পড়লেন মানবেন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গে নরেন ঘোষ-চৌধুরীও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমিও এর মধ্যে নেই, আমাকে মাফ করবেন।'

এভাবে দু'জন বিপ্লবী সভা ছেড়ে চলে যাবার পর আরো অনেকের মনেই দ্বিধা-সংশয় দেখা দিল। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বললেন না। অবশেষে সকলে মিলে শ্রীশচন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করলেন এই দুঃসাহসিক অভিযানের নেতৃত্বভার।

দিনরাত ধরে চলল মন্ত্রণাসভা। শ্রীশচন্দ্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা।

অবশেষে তৈরী হল এক নিখুঁত পরিকল্পনা। সম্পূর্ণ কাজটা সমাধান করার জন্য শ্রীশচন্দ্র বেছে নিলেন শ্রীশ মিত্র, খগেন দাস ও হরিদাস দত্তকে।

চব্বিশে আগষ্ট দুপুর বেলা ঠিক হল, অনুকুল মুখোপাধ্যায় মাল পাচারের জন্য একটা গরুর গাড়ী যোগাড় করে দেবেন; আর শ্রীশচন্দ্র যোগাড় করবেন সে গাড়ীর গাড়োয়ান।

গাড়ী আর গাড়োয়ান যোগাড় হলেই যে কাজ শেষ হয়ে গেল তাতো নয়। সে গাড়ীতে মাল তুলবে কে? তাছাড়া মালটা যে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে তারই বা তদারকী করবে কে?

লক্ষ্য যখন স্থির তখন কর্মীর কি অভাব হয়?

ঠিক হল, শ্রীশ মিত্র রডা কোম্পানীর গোরুর গাড়ীতে মাল তোলবার ফাঁকে এক সময় মাউজার পিস্তল এবং কার্তুজের বাক্স-গুলো বিপ্লবীদের গরুর গাড়ীতে তুলে দেবেন। আর সেই গাড়ীকে পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসবে হরিদাস দত্ত।

পরিকল্পনা যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হরিদাস দত্তকে নিয়ে শ্রীশ পাল চলে এলেন মাড়োয়ারী হোষ্টেলে—প্রভুদয়াল হিম্মৎ-সিংকার কাছে।

প্রভুদয়াল তখন মাড়োয়ারী ছাত্র নিবাসের একজন বোর্ডার। বিপ্লবীদের সঙ্গে তঁার আগে থাকতেই পরিচয় ছিল। তিনি সময়ে অসময়ে যতটা পারতেন তাদের সাহায্য করতেন।

এবারও সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন শ্রীশচন্দ্র। মতলব, রাতটা কাটাবেন প্রভুদয়ালের কাছে। পরের দিন সকালে হরিদাসকে গাড়োয়ানের সাজে সাজিয়ে পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে। সেখান থেকে শুরু হবে জীবন-মরণের পথ-যাত্রা।

পরদিন ছাব্বিশে আগষ্ট।

ঘুম থেকে উঠে যৎসামান্য জলযোগ সমাপন করে প্রভুদয়াল হরিদাস দত্তকে নিয়ে গেলেন একান্ত বিশ্বস্ত এক ক্ষৌরকারের কাছে। হুকুম হল, খুব ছোট করে একেবারে হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের মত হরিদাসের চুলগুলো ছেটে দিতে হবে।

হুকুম মাফিক কাজ হয়ে গেল মিনিট দশেকের মধ্যে। দেখতে দেখতে হরিদাসের পরণে উঠল কালো ফতুয়া, ময়লা একটা আট হাতি ধুতি, গলায় একখণ্ড পিতল ঝোলান কালো ফিতের মালা। এখন কার সাধ্য আছে যে তাঁকে বিহারী গাড়োয়ান নয়, হরিদাস দত্ত বলে সনাক্ত করে?

মার্কাস স্কোয়ার থেকে পায়ে হেঁটে ওরা এল ওয়েলিংটনে—মলঙ্গা লেনে। সেখানে অনুকূল মুখুজ্যেকে পাওয়া গেল যথানির্দিষ্ট স্থানে। তিনি আগে ভাগেই একখানা গরুর গাড়ী যোগাড় করে রেখেছেন।

মুহূর্তমাত্রও অপেক্ষা নয়। একলাফে হরিদাস দত্ত চড়ে বসলেন গাড়ীতে। মুচড়ে ধরলেন গরুর লেজ; হবৃর হবৃর করে মুখ থেকে

এক বিচিত্র আওয়াজ করে ছুটিয়ে দিলেন গরুর গাড়ী। যেই দেখল, সেই বলল, সত্যি, পাকা গাড়োয়ান বটে। দেখছ না কি তেজে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এরকম পাকা গাড়োয়ান আজকাল খুব কমই দেখা যায়।

যথা সময়ে শ্রীশচন্দ্র, খগেন দাস ও হরিদাস দত্ত গরুর গাড়ী সহ ডালহৌসী স্কোয়ারে উপস্থিত হলেন।

তখন বড়া কোম্পানীর অফিস ছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে ভ্যান্সিটার্ট রো-তে; আর কাস্টম অফিস ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের ঠিক উত্তর কোণে। এই দুটো বাড়ীর দূরত্ব ছিল খুবই সামান্য।

যাইহোক, যথাসময়ে হরিদাস দত্তের গাড়ী এসে দাঁড়াল নির্দিষ্ট স্থানে। কোম্পানীর ভাড়া করা অন্য ছ'খানা গাড়ীর সঙ্গে সে মিশে গেল অলক্ষ্যে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কাস্টমস অফিসের একেবারে গেটের কাছে।

ওদিকে কোম্পানীর কর্মচারী শ্রীশ মিত্র যথানিয়মে মাল খালাস করে নিলেন কাস্টমস অফিস থেকে। পূর্বপরিকল্পনা মত মাউজার পিস্তল, কার্তুজ ইত্যাদির বাক্সগুলো তোলা হল হরিদাস দত্তের গাড়ীটায়।

সব কটা গাড়ী ভর্ত্তি হয়ে গেলে বেশ ধীরে সুস্থে সেগুলো এগিয়ে চলল ভ্যান্সিটার্ট রো-র দিকে। এই শকট মিছিলের একেবারে পেছনে রইল হরিদাস দত্তের গাড়ী।

ভ্যান্সিটার্ট রো-র মুখে এসে ছটা গাড়ী বেঁকে গেল ডান-দিকে; শুধু একটি মাত্র গাড়ী এগিয়ে চলল সোজা—একেবারে পূর্ব মুখে।

গাড়ীর দু'দিকে পকেটের মধ্যে লোড করা ছ'ঘরার রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে উদাস পথিকের ভঙ্গীতে এগিয়ে চললেন শ্রীশ পাল এবং খগেন দাস।

ঢিমে-তেতালা চালে চলতে চলতে গাড়ী যখন মিশন রো-র মুখে এসে পৌঁছল পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ম্যাঙ্গো লেনের কাছ বরাবব আসতে শ্রীশ মিত্র এসে যোগ দিলেন তাদের দলে। সেখান থেকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, চাঁদনি চক্ হয়ে গাড়ী এসে পৌঁছল মলঙ্গা লেনে অনুকূল মুখার্জীর বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে একটা ফাঁকা জায়গাব সামনে।

যদিও জায়গাটা ফাঁকা—তবে লোহালক্করের কোন কমতি ছিল না সেখানে। তাছাড়া ও জায়গাটা যে জনমানবশূন্য তাও নয়; বরং বেশ কিছু উৎকলবাসী ওখানে জমিয়েই আস্তানা গেবে বসে ছিল অনেক দিন ধরে।

যাইহোক, হাতে হাতে সব মালপত্র নামিয়ে ফেলা হল কয়েক মিনিটের মধ্যে। তাবপর, ভাড়া মিটিয়ে দিলে, গাড়োয়ান যেমন চলে যায় খুশী মনে, হবিদাস দত্ত-ও সেভাবেই চলে গেলেন দেশোয়ালী গান গাইতে গাইতে। আর শ্রীশ মিত্র এবং শ্রীশ পালও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সবকিছু অনুকূল বাবুর দায়িত্বে রেখে দিয়ে।

ওরা সবাই চলে গেলে অনুকূল মুখার্জী গিয়ে হাজির হলেন কালিদাস বসুর বাড়ীতে। সেখান থেকে যোগাড় করে নিয়ে এলেন একটা ঘোড়ার গাড়ী। সে গাড়ীতে করেই দফায় দফায় ঐ বিপুল অস্ত্রসম্ভার সরিয়ে এনে গুদামজাত করা হল জেলেপাড়ার ভূজঙ্গ মোহন ধরের বাড়ীতে। সেখান থেকে আঠাশ হাজার আট শ' রাউণ্ড বুলেট এবং প্রচুর মাউজার পিস্তল সরিয়ে নিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়া হল বাঙলার বিভিন্ন গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার মধ্যে।

এটা সবারই জানা ছিল যে, যখনই রডা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সব মাল ঠিক মত পৌঁছয়নি জানতে পারবেন তখনই প্রথম সন্দেহ করবেন শ্রীশ মিত্রকে। সুতরাং আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে থাকা ভাল। তাই ঐদিনই বিকেলে শ্রীশ মিত্রকে নিয়ে রংপুর রওয়ানা দিলেন শ্রীশ পাল। সেখানে কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরী গ্রামে

ডাঃ সুরেন বর্ধনের কাছে তাঁকে রেখে পরদিনই তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়।

এরপর পাঁচ-ছ' দিন কেটে গেল ; কিন্তু এমন গুরুতর ব্যাপারটা যে কারো নজরে পড়েছে তা মোটেই বোঝা গেল না।

এভাবেই সাতটা দিন পার হয়ে গেল স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু তারমধ্যে কোথায় যেন একটা খটকা দেখা দিল রডা কোম্পানীর একজন অফিসারের মনে—শ্রীশ মিত্র তো কখনো বিশেষ কারণ ছাড়া এক নাগাড়ে এতদিন কামাই করেন না। তা হলে কি ভদ্রলোক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?

তাই বা কি করে হয়! অসুস্থ হলে তো একটা চিঠি দিয়েও জানাতেন। কিন্তু কৈ, তেমন কিছুতো জানাননি।

তবে ?

তবে কি অন্য কিছু ?

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সাহেবের—কোন অঘটন ঘটেনি তো ?

সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন কাস্টম অফিসে। জানতে চাইলেন, 'রডা কোম্পানীর নামে যে মাউজার পিস্তল ও কার্তুজের চালান এসেছিল তার কি হল ?'

কাস্টমস অফিস জবাব দিল, 'সেতো সাতদিন আগেই আপনাদের মাল—বাবু শ্রীশ মিত্র খালাস করে নিয়ে চলে গেছেন।'

'সে কি !'

বিস্ময় এবং আতঙ্কে সাহেবের বাকরুদ্ধ হয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠান হল লালবাজারে, পুলিশের সদর দপ্তরে।

খবর শুনে পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। দুর্ধর্ষ টেগার্ট সাহেবও আঁতকে উঠলেন আতঙ্কে—এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার নিয়ে ওরা যদি নেমে পড়ে পথে, যদি আক্রমণ করে সরকারী অফিসগুলো—তা হলে, তাহলে ওদের বাধা দেওয়া যাবে কিভাবে !

লালবাজারের শান্ত-শিষ্ট চেহারা এক মুহূর্তেই পাল্টে গিয়ে একেবারে বিপরীতরূপ ধারণ করল। শুরু হল ক্রমাগত জীপ আর টহলদারী ভ্যানের আনা-গোনা, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, হাঁকডাক। দলে দলে ঢাকা বেরিয়ে পড়ল শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ঢ্যাড়া পিটিয়ে তারা ঘোষণা করল, যে সব বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে এসেছে, সে সব বাড়ীর মালিক যেন অবিলম্বে তাদের নতুন ভাড়াটেদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নিজ নিজ এলাকার থানায় জানিয়ে আসেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে এমন আকস্মিক ব্যবস্থাবলম্বনে বিপ্লবীরা প্রথমে বেকায়দায় পড়ে গেলেন। কেননা তখনও তাদের হাতে একুশ হাজার ত্ব'শ' রাউণ্ড এমন কার্তুজ রয়েছে যা কোন নিরাপদ স্থানে রাখা যায় নি।

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর দল বেরিয়ে পড়ল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হল শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত—কিন্তু তেমন নিরাপদ আশ্রয় মিলল না একটাও।

অবশেষে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখা গেল। একজন বিপ্লবী খবর নিয়ে এলেন, বড়বাজারের বাঁশতলা এলাকায় এক মাড়োয়াড়ীর গুদাম খালি আছে। তিনি সেটা ভাড়া দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোক চলে গেল টাকা নিয়ে। ত্ব'মাসের অগ্রিম দিয়ে ঘর ভাড়া করা হল সেইদিনই।

আর দেরী করা যায় না—এখন কাজ শুরু করে দিতে হবে। কি জানি, বেশি দেরী হলে হয়তো পুলিশ মালের সন্ধান পেয়ে যাবে।

অতএব শুরু হয়ে গেল কাজ।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন অসম সাহসী যুবক ভুজঙ্গবাবুর ঘর থেকে বাক্সভরা বুলেট সরাবার কাজে লেগে পড়লেন।

জেলেপাড়া থেকে নিয়ে বাক্সগুলো সোজা যে বাঁশতলার গুদাম

ঘরে তোলা হল তা নয়। মাঝখানে সেগুলোকে আরো দু'তিন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্য।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এত সতর্কতা, এত চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু পুলিশকে সম্পূর্ণভাবে ধোঁকা দেওয়া গেলনা। বাঁশতলার গুদামে যখন মালগুলো স্থানান্তরিত করা হল তখন কিভাবে যেন ব্যাপারটা জোড়াবাগান থানার নজরে আসে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুদাম ঘরের উপব নজর রাখবার জন্য একজন পাঞ্জাবী মুসলমান কনষ্টেবলকে পাঠাল। কনষ্টেবলটিব নাম আলি হোসেন।

ব্যাপারটা শ্রীশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি দু'দিন পরে হরিদাস দত্তকে বললেন, ঐ গুদামের মালিককে যেন তিনি জানিয়ে আসেন যে কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ গুদামঘব ছেড়ে দেওযা হবে।

নেতার আদেশ অনুযায়ী যথাসময়ে বাঁশতলার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন হরিদাস দত্ত। বাড়ীর দারোয়ান শুকদেওকে জানালেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য।

শুকদেও হরিদাসবাবুর কথা শুনে ভাবে গদগদ হয়ে বলল, 'ঠিক আছে বাবু, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনই মাইজীকে খবর দিচ্ছি।'

বাড়ীর মালিক ছিলেন একজন বিধবা মহিলা। হরিদাসবাবু ভাবলেন, শুকদেওয়ের কথানুযায়ী তার সঙ্গে দেখা করে সবকিছু বুঝিয়ে বলাটাই হবে ভদ্রতার কাজ। তাই তিনি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ভদ্র-মহিলা নীচে নামলেন না তখন তাঁর মনে কেমন যেন সন্দেহ দেখা দিল। হঠাৎ বুকটা ধুক্ করে উঠল—শুকদেও আবার পুলিশের লোক নয়তো!

যেই চিন্তাটা মনে এল অমনি হরিদাসবাবু নিজের ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেললেন—না, এখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা

নয়—যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

দুর্ভাগ্য, হরিদাসবাবু গেট পেরিয়ে আসার আগেই সেখানে যমদূতের মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল আলি হোসেন।

সঙ্গে সঙ্গে শুকদেও চিৎকার করে উঠল, 'মিল গয়া সিপাইজী, ইয়ে তো বাবু আগয়ে।'

কোনরকম ভণিতা ছাড়াই আলি হোসেন সোজাসুজি হরিদাস বাবুকে বলল, 'আমার সঙ্গে থানায় চলুন।'

'কেন?'

জানতে চাইলেন হরিদাস দত্ত।

'সেটা থানায় গেলেই জানতে পারবেন।'

রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল আলি হোসেন।

'যদি আমি না যাই ...।'

দৃপ্ত স্বরে বললেন হরিদাসবাবু।

'তাহলে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।'

আলি হোসেনের গলার স্বরে ঔদ্ধত্যের ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'তাই নাকি!'

হরিদাসবাবু আলি হোসেনের মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকী হাসলেন। তারপর প্রশস্ত দৃষ্টিতে দেখলেন সামনের গলিটার দিকে। সেখানে একটা বাড়ী মেরামত হচ্ছে। তারই অনুসঙ্গ হিসেবে রাস্তার উপর স্তূপাকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে একগাদা বালি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি খেলে গেল হরিদাসবাবুর মাথায়। যেন পায়ে কিছু ফুটেছে এমন ভান করে তিনি নিচু হয়ে জুতো জোরা খুলে পায়ের গোড়ালী দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে আলি হোসেনের চক্ষু লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্য আলি হোসেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ফাঁকে হরিদাসবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলেন।

আকস্মিক ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আলি হোসেন এবার প্রাণ-পণে চিৎকার শুরু করে দিল, 'পাকড়ো, পাকড়ো ; ডাকু ভাগতা হ্যায়, পাকড়ো।'

আর দেখতে হল না। মুহূর্তের মধ্যে যেন ম্যাজিকের মত কোথা থেকে শত শত লোক ছুটে এল। সবার মুখে এক চিৎকার 'পাকড়ো শালেকো, ডাকু ভাগতা হ্যায়।'

অবশেষে জনতার হাতে 'ডাকু' ধরা পড়ল। আর তারাই মহাসমা-রোহে এই 'ডাকু'কে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল জোড়াবাগান থানায়।

খবর পেয়েই ছুটে এলেন টেগার্ট। তাকে অনুসরণ করল লোম্যান, ম্যাকলিওর প্রমুখ বাঘা বাঘা অফিসারের দল।

তারা এসে পৌঁছবার পর বিরাট একদল পুলিশ বাহিনী রওয়ানা দিল বাঁশতলা ষ্ট্রীটের গুদাম ঘর সার্চ করার জন্য। তালা ভেঙ্গে পুলিশবাহিনী সগর্বে ঢুকল ঘরের ভিতরে।

এক এক করে সব কটা বাক্স ভেঙ্গে ফেলা হল। কিন্তু আশ্চর্য, মাউজার পিস্তলগুলোর একটাও তার মধ্যে নেই ; শুধু পড়ে রয়েছে একুশ হাজার দু'শ' রাউণ্ড বুলেট।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গ্রেপ্তার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বন্দী হলেন অনুকূল মুখার্জী, কালিদাস বসু, গিরীন ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও আশুতোষ রায়।

শ্রীশ পাল, খগেন দাস ও শ্রীশ মিত্র বিপদের গন্ধ পেয়েই গা-ঢাকা দিলেন।

এতবড় একটা কেস ধরতে পেরে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল লালবাজারের বড় কর্তার দল। দিন নেই, রাত নেই, শুধু ঐ একটা কেস নিয়েই তারা পড়ে রইল। অন্য কোন চিন্তা এখন তাদের মাথায় রাখার স্থান নেই। সারাটা মাথা জ্যাম হয়ে আছে এক চিন্তায়—রডা, ... রডা ... রডা।

দীর্ঘ সাত মাস ধরে চলল 'রডা আর্মস্ কনস্পিরেসি' মামলা। অনেক প্রমাণ, অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের পর সন্দেহের অবকাশে একমাত্র হরিদাস দত্ত, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জী ছাড়া আর সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ছাড়া পেয়ে গেলেন। যে চারজন দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাদের দু' বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। একমাত্র হরিদাস দত্তর কাছে বুলেট পাওয়া গেছে এই অভিযোগে তাঁর প্রতি আরো দু' বছর বেশি কারাদণ্ডের আদেশ হল।

এভাবেই পবিসমাপ্তি ঘটল প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টার। তবু এ প্রচেষ্টা বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনকে অনেক এগিয়ে দিয়েছিল। এই 'রডা'র অস্ত্র হাতে পাওযার ফলেই পরবর্তীকালে অনেক বিপ্লবীই বহু দুঃসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেক বৈপ্লবিক 'অপারেশন'ই এই 'রডা'র অস্ত্রে সম্পন্ন হয়েছিল। সেদিক থেকে দেখলে 'রডা'র অস্ত্র লুণ্ঠনই বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে প্রথম সফল প্রচেষ্টা।

এরপরের ঘটনা ঘটল বালেশ্বরে; উনিশ শ' পনের সালে। নেতৃত্ব দিলেন বাঘা যতীন অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অনেকদিন ধরেই কলকাতার পুলিশ যতীন এবং তার দলবলকে খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে ফিরছিল। ফলে যতীনের দলও এখানে তেমন স্বস্তি বোধ করতে পারছিল না। তাই তাঁরা ঠিক করল কলকাতা ছেড়ে উড়িষ্যায় যাবে। সেখান থেকে পরিচালনা করবে তাদের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড।

প্রথমে গিয়ে উঠল কপ্তিপদায়। সেখান থেকে নীরেন আর মনোরঞ্জনকে পাঠিয়ে দিল তালদিহিতে—এক নতুন আস্তানায়।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, কি করে কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যায়, তাই নিয়ে।

উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সেখানে সমস্যাটা কোনদিনই বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই অনায়াসেই মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বের হয়ে এল—বালেশ্বরে একটা সাইকেল মেরামতির দোকান খুললে কেমন হয়? সেখান থেকে খুব সহজেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা যাবে।

যেমন কথা, তেমনই কাজ। দেখতে দেখতে রাতারাতি এক সাইকেল মেরামতির দোকান গজিয়ে উঠল শহরেব এক প্রান্তে; সখ করে দোকানের নাম রাখা হল—ইউনিভার্সাল এম্পোরিযাম।

দোকান নতুন হলে হবে কি, দিনবাত সেখানে সাইকেল মেরামতির কাজ চলতে লাগল পুরোদমে। পাঁচ সাতটি বাঙালী যুবক সাবা গায়ে কালিঝুলি মেখে সর্বক্ষণ সাইকেলেব পাংচার টায়ারে সলিউশন কিংবা হ্যাণ্ডেল ফিট অথবা চেন রিপ্লেসিং এ নিমগ্ন রইল।

বাঙলা দেশের বাইরে এই ছোট শহরে হঠাৎ এতগুলো বাঙালী যুবকের আগমন দেখে স্থানীয় পুলিশের মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ দেখা দিল। তারা সর্বক্ষণ দোকানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগল।

যথাসময়ে খবর চলে গেল উপর মহলে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শুরু হল কর্মচাঞ্চল্য—নানা জল্পনা-কল্পনা। শেষে একদিন হঠাৎ, একেবারে আকস্মিক, বালেশ্বরের ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট কিলবিকে সঙ্গে নিয়ে ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের সুচতুর অধিকর্তা ডেনহাম সাহেব হানা দিলেন ইনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে।

কিন্তু ততক্ষণে পাখী খাঁচা ছাড়া।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে সারাটা এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডেনহাম সাহেবের দল একটা ছোট কাগজের টুকরো ছাড়া আর কিছুই পেল না।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে খুব ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখলেন ডেনহাম। তারপর সেটা কিলবির হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, কিছু বুঝতে পারছেন কি না ?

ম্যাজিস্ট্রেট কিলবিও কাগজটা বার চার পাঁচেক উল্টে পাল্টে দেখলেন ; কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। শুধু একবার ঠোঁটটা উল্টে বললেন, 'হোয়াটস্ এ মিরাকল।'

'কিছু বুঝলেন না ?'

ডেনহাম জিজ্ঞাসা করলেন।

'না।'

জবাব দিলেন কিলবি।

'একটু চেষ্টা করুন।'

যেন কোন নিগূঢ় সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, এমনভাবে কথাটা বললেন ডেনহাম।

'আমি তো এখানে 'কপ্তিপদা' শব্দটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।'

কিলবি সহজ সুরে, অথচ বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন কথাটা।

'দ্যাটস্ এভরিথিঙ্গ।'

ডেনহাম ঐ শব্দটাকেই সমস্ত রহস্যের সূত্র বলে বোঝাতে চাইলেন।

কিলবির কাছে তখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। তিনি জানতে চাইলেন, 'কিভাবে ?'

'লেটস্ গো টু কপ্তিপদা।'

যেমন কথা তেমনই কাজ।

সন্ধ্যার দিকে ডেনহামের নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ-বাহিনী এগিয়ে চলল কপ্তিপদার দিকে। সঙ্গে এসে যোগ দিল বাংলা

পুলিশের স্বনামধন্য অফিসার জন টেগার্ট। আর কিলবিতো আগে থাকতে ছিলেনই।

রাত্রির অন্ধকারে পথ-ঘাট কাঁপিয়ে, গ্রাম-জঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চলল একপাল হাতি। পিঠে তাদের মহামান্য সওয়ারী—ডেনহাম, কিলবি, টেগার্ট আর একদল সশস্ত্র সিপাহী।

হাতির গলার ঘণ্টার আওয়াজে গ্রামবাসীরা সচকিত হয়ে উঠল। সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। সবার চোখে মুখে আজ এক জিজ্ঞাসা—এরা কোথায় চলেছে?

যদিও প্রথমে সবাই বেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা সবার কাছে খোলসা হয়ে গেল। সকলেই বুঝতে পারল, এরা ভারতমায়ের দামাল ছেলের দলকে ধরতে যাচ্ছে। ওরা সবাই বীরপুঙ্গব কিনা, তাই ওদের এত সাজ—এত বাহার।

যদিও তখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে—তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেই মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে দু'জন গ্রামবাসী ছুটল সাধুবাবাকে খবর দিতে।

কে এই সাধুবাবা?

কে আবার? যতীন মুখার্জী, আমাদের বাঘা যতীন। সেই তো ওখানে কদিন ধরে সাধুবাবা সেজে বসে আছে। এরমধ্যে গ্রামবাসীদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে বসেছে; তারাই ওর খাওয়া থাকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখানে ওর অভাবটা কিসের?

খবর পেয়েই যতীন মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হয়ে নিল। ঠিক করে ফেলল তাঁর ইতিকর্তব্য।

সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দিল তালদিহির দিকে।

হোক না কুড়ি মাইল পথ—তার জন্য কি বিপ্লবীর যাত্রা থেমে থাকবে। তাছাড়া ইতিমধ্যে সেখানে জ্যোতিষ পালও পৌঁছে গেছে। তাঁকে তো এ খবরটা দেওয়া চাই-ই।

কপ্তিপদায় যতীন এবং তাঁর দলবলের আশ্রয়দাতা ছিলেন মণীন্দ্র চক্রবর্তী। সুতবাং যতীন প্রথমে তাঁব কাছেই গেলেন।

চারপাশ একবাব ভাল কবে দেখে নিয়ে অতি সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়ালেন মনীন্দ্রবাবুব শোবাব ঘবের জানালাব ঠিক নিচে। আব কেউ যাতে বাইরে থেকে দেখে চিনে ফেলতে না পারে সেইজন্য সাবাটা মুখ ঢেকে নিলেন একটা পাতলা চাদর দিয়ে। তাবপর খুব আস্তে দু'বাব টোকা মাবলেন জানালাব কপাটে।

শব্দ পেয়েই হুড়মুড় করে জেগে উঠলেন মণীন্দ্রনাথ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জানলা খুলেই যতীনকে দেখে যেন ভূত দেখাব মত চমকে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'একি, এখনো তুমি পালাও নি?'

'না।'

দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন যতীন্দ্রনাথ।

'কেন?'

জানতে চাইলেন মণীন্দ্র চক্রবর্তী।

'আমি পালাব না।' বললেন যতীন্দ্রনাথ, 'আমি যুদ্ধ করব।'

'যুদ্ধ করবে!'

যেন আকাশ থেকে পড়লেন মণীন্দ্রবাবু।

'হ্যাঁ!'

জবাব দিলেন যতীন।

'কি ভাবে?'

জিজ্ঞাসা করলেন মণীন্দ্রনাথ।

'যেভাবে সবাই করে, সেভাবে।'

নির্লিপ্তের সুরে বললেন যতীন।

'আশ্চর্য !'

স্বগতোক্তি করলেন মণীন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে ! যে এ কথা শুনবে, সেই বলবে, আশ্চর্য ! এ ছাড়া আর কিই বা বলার আছে ? কি বলা যেতে পারে ? একদল পাহারা-সিপাই যেখানে পিস্তল, বন্দুক, কার্তুজ, মর্টার সঙ্গে করে, হাতির পিঠে চড়ে রণসাজে এগিয়ে আসছে নিতান্ত অস্ত্রহীন কয়েকজন ছন্নছাড়া মানুষকে শায়েস্তা করবার উদগ্র বাসনা নিয়ে, সেখানে কিনা এই নিরস্ত্র সন্ন্যাসী বলছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ! সত্যি আশ্চর্য ব্যাপারই বটে ! এটাতো নিতান্ত ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যে বদ্ধ পাগলের লক্ষণ !

হ্যাঁ, পাগল-ই তো। পাগল ছাড়া কে আর এমন মূর্খ আছে, যে সংসারের সব আনন্দ-উচ্ছ্বাস, সুখ-দুঃখ, কামনা বাসনাকে ত্যাগ করে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথের যন্ত্রণাকে হাসি মুখে বরণ করে নিয়ে চিরদিনের জন্য বেরিয়ে পড়বে নিরুদ্দেশের পথে ; চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝার ঘূর্ণাবর্তে !

সেই পাগল আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে মণীন্দ্রনাথের সামনে। সে যুদ্ধ করতে চায়।

'কিন্তু কি দিয়ে ?'

যতীন্দ্রনাথের কাছে সোজাসুজি উত্তরটা জানতে চাইলেন মণীন্দ্রনাথ।

'বন্দুক দিয়ে ঃ আপনার বন্দুকটা দিয়ে।'

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন যতীননাথ।

'বন্দুক দিয়ে ! তোমার কি মাথার ঠিক আছে ? ওদের দলে কতজন লোক আছে তুমি জান ? কত অস্ত্র আছে অনুমান করতে পার ?'

'পারি।'

যতীন্দ্রনাথ অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

'ছাই পার।'

মণীন্দ্রনাথ একরকম চিৎকাব কবেই বললেন কথাটা।

'আস্তে বলুন,' যতীন্দ্রনাথ বললেন,' অত জোরে কথা বলবেন না, পাড়াপড়শীরা জেগে পড়লে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে।'

'সেই ভাল,' মণীন্দ্রবাবু বললেন, 'পাড়াপড়শীরা তোমাকে ধরে পুলিশে দিলে তবু জানব যে মানুষটার জানটা বাঁচবে। কিন্তু ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে আব তোমার স্বশরীবে ইহলোকে থাকা হযে উঠবে না; তখন পরলোকে গিযেও পাগলামী কবেই কাটাতে হবে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এখন চটপট আপনার বন্দুকটা দিন তো।'

মণীন্দ্রবাবু বুঝলেন এমন জেদী লোকেব সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ও যা ঠিক কবেছে তা করবেই। তাই আর না কথা বাড়িয়ে ভিতর থেকে নিজের বন্দুকটা এনে দিলেন যতীন্দ্রনাথকে।

ওদিকে ডেনহাম সাহেবেব সাঙ্গোপাঙ্গের দল কপ্তিপদা পযন্ত হাতিব পিঠে চড়ে আসতেই ঘেমে নেয়ে একাকার। ওদের মাখনেব মত নরম-নাদুস দেহে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

সত্যি তো, এত কষ্ট কি আর সহা হয় আলালেব ঘরের দুলালদের। রাত নেই, বেরেত নেই—হাতির পিঠে চড়ে ছোটো ডাকাত ধরতে। যত সব পাগলের কাণ্ড।

সুতরাং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হল। ঠিক হল, এই গভীর রাত্রে আর 'ডাকাত' ধরতে এগোন হবে না। তার থেকে বরং রাতটা কপ্তিপদার ডাকবাংলোতে কাটানো যাক। তারপর সকালে উঠে দেখাযাবে, বাছাধনরা কি করে পালায়।

কিন্তু একি, চিড়িয়া যে খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে!

তা হলে? তা হলে এখন কি করা যায়?

হ্যাঁ, পাওয়া গেছে ; একেবারে মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে রটিয়ে দাও যে ওরা ডাকাত। ডাকাত পালিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ঢেড়ার আওয়াজ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রটে গেল সেই বার্তা—ডাকাত পালিয়েছে, সবাই সাবধান থাক। বাঙালী ডাকাত। দুর্ধর্ষ ডাকাত। ডাকাত যতীন্দ্রনাথ মুখুজ্যে।

শুধু সতর্কবাণী-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারও ঘোষণা করা হল, যে এই ডাকাতকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে দু' শ' টাকা দেওয়া হবে—নগদ দু' শ' টাকা।

অতএব সবাই বেরিয়ে পড় ডাকাত ধরতে।

এদিকে যখন ঢেড়া পেটা হচ্ছে, ওদিকে তখন যতীন্দ্রনাথের দল তালদিহি থেকে রওয়ানা দিয়েছে উল্টো মুখে বালেশ্বরের দিকে।

শেষে বালেশ্বরেও তাঁরা রইলেন না ; চলে গেলেন হরিপুরে। সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছলেন গোবিন্দপুরে। এই গোবিন্দপুরের গা ঘেঁষেই বয়ে গেছে এক নদী—নাম তার বুড়িবালাম।

বুড়িবালামের তীরে পেঁাছে পঞ্চ-পাণ্ডবের দল যেন অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। গায়ের জামা কাপড় খুলে সবাই ভিজে কাপড় দিয়ে গা ভিজিয়ে নিলেন। সঙ্গে একটা মোড়কের মধ্যে কিছু শুকনো রুটি আর গুড় ছিল ; তাই নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিলেন ওরা। এতক্ষণ পরে পেটে কিছু পড়ায় মনে হল যেন জীবনটা বাঁচল। তারপর ঢক ঢক করে, পেটে যতটা জায়গা ছিল, সবটা ভরিয়ে নিলেন বুড়িবালামের শীতল জলে।

আবার শুরু হল যাত্রা। সেই একঘেয়ে—ক্লান্তিকর যাত্রা।

অনেক কষ্টে পাওয়া গেল একটা নৌকো। এটাকে নৌকো না বলে ছোট ডিঙ্গী বলাই বোধ হয় ঠিক হবে।

যাইহোক, নেই মামার থেকে কানা মামাই ভাল। যা পাওয়া গেছে তাতেই উঠে পড়া যাক। এটাকে ছেড়ে দিলে হয়তো আর একটা না-ও পাওয়া যেতে পারে।

পাঁচজন লোক অতি কষ্টে শিষ্টে ঝুলিঝোলা নিয়ে কোন রকমে গিয়ে পোঁছলেন ওপারে। তারপর মাঝির ভাড়া মিটিয়ে সোজা হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন পশ্চিম দিকে—জঙ্গলের পথে।

পাঁচজন তাগড়া জওয়ান লোককে এমনভাবে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল মাঝির। সে কথাটা বলল দু'একজন পরিচিত গ্রামবাসীকে।

দেখতে দেখতে বেশ একটা বড় রকমের ভীড় জমে উঠল নদীর পাড়ে। সকলেই যার যার মনোমত বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগল।

ভীড়ের মধ্য থেকে একজন মধ্যবয়স্ক গ্রামবাসী হঠাৎ মন্তব্য করল, 'আচ্ছা, এরা সেই বাঙালী ডাকাত নয় তো?'

'তাও তো বটে।'

এক সঙ্গে অনেকগুলো গলা সোচ্চার হয়ে উঠল।

'আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

মধ্যবয়স্ক গ্রামবাসীটি তার সন্দেহের কথা খুলেই বলল।

'হতে পারে; কিছু আশ্চর্যের নয়।'

একজন বৃদ্ধ মন্তব্য করল।

দেখতে দেখতে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ছুটল চৌকিতে খবর দিতে। কি জানি, যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে হয়তো ডাকতগুলো বেপাত্তা হয়ে যাবে। তখন দৌড়ঝাপটাই হবে সারা—পুরস্কারের নামে ঠনঠন।

পঞ্চবিপ্লবী বুঝল, গ্রামবাসীরা তাঁদের সন্দেহ করেছে। তাছাড়া একদল লোকতো তাঁদের অনুসরণ করতে করতে একেবারে কাছেই চলে এসেছে। সুতরাং এখন এমন কিছু করা দরকার যাতে লোক-গুলো ভয়ে পালিয়ে যায়।

হঠাৎ মনোরঞ্জন একটা ফাঁকা আওয়াজ করল বন্দুকের। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। যে যেদিকে পারল

পালাল। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুক্ষণের মধ্যে আবার তারা আরো বেশি মাত্রায় একত্রিত হয়ে বিপ্লবীদের পিছু নিল। এগোতে এগোতে একেবারে গায়ের কাছে চ'লে এল।

একজন মাতব্বর গোছের লোক হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল চিত্তপ্রিয়র উপর। সম্ভবত' তখন তার মাথায় দু' শ' টাকার পুরস্কারের ঘোষণাটা দাপাদাপি করছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে জাপটে ধরবার আগেই মনোরঞ্জনের হাতের নিশানার শিকার হল বেচারা। মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রক্তে ভেসে গেল চারপাশ।

আর কোন সন্দেহ রইল না। এরাই সেই বাঙালী ডাকাত। তা না হলে এমনভাবে গুলিগোলা ছুড়বে কেন? ডাকাত ছাড়া কোন ভাল লোক কি এমন জুলুম করে? কখনোই না।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। সুতরাং এখন একমাত্র যে কাজ বাকি রইল, যেভাবেই হোক ওদের পাকড়াও করে নিয়ে যেতে হবে থানায়। তারপর পুরস্কারের টাকা নিয়ে সোজা স্যাকরার দোকানে। অনেকদিন ধরে বৌয়ের মুখ ঝামটা শুনতে শুনতে প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। এবার পুরস্কারের টাকা দিয়ে প্রথমেই একগাছি হার কিনে তারপরে অন্যকথা চিন্তা করা যাবে।

সবার মনেই উৎসাহ তখন আর বাধ মানতে চায় না। সবাই চাইছে, সেই প্রথম জাপটে ধরবে ওদের। এক প্যাঁচে কাত করে দেবে পাঁচজন ডাকাতকে। তাহলেই পুরস্কারের টাকাটা আপনি এসে ঢুকে পড়বে পকেটে তখন আর পায় কে তাকে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে একজন সদ্য বিবাহিত যুবক এত বেশি উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, সে নিজেকে আর কিছুতেই সামলে রাখতে পারল না। হঠাৎ বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল যতীন্দ্রনাথের উপর। কিন্তু কপাল মন্দ বেচারার, পলক ফেলতে না ফেলতেই একঝাঁক গুলি ফুটো করে দিল ওর লাশটাকে। দেখতে না দেখতে মৃত্যুর

কোলে ঢলে পড়ল তার দেহ। পুরস্কার না নিয়েই তাকে চিরকালের জন্য চলে যেতে হল পৃথিবী ছেড়ে।

এই দৃশ্য দেখে, এতক্ষণ যারা পুরস্কারের স্বপ্নে মশগুল হয়ে ছিল, তাদেব দিবাস্বপ্ন ছুটে গেল এক মুহূর্তে। প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পাবল দিল ছুট। মনে মনে বলল, থাক বাবা আমার পুরস্কার, আগে পিতৃদত্ত জানটা তো বাচুক ;

ভয় পেযে গ্রামবাসীবা পালিয়ে যাওয়ায় দম ছেড়ে বাঁচল পঞ্চবিপ্লবীর দল। উহঃ, কি বিপদেই না পডা গিযেছিল। এতগুলো লোক যদি সত্যি সত্যিই ধববে বলে পিছু তাড়া কবত তা হলে কি আর পালিয়ে নিস্তাব ছিল। আজ ওদেব হাতেই পিটুনী খেয়ে বেঘোরে দিতে হত জানটা।

হাটতে হাটতে এক সময় ওবা এসে পেঁাছল চাষখন্দে। সেখানে আবার নদী।

কিন্তু ঘাটে কোন নৌকো নেই। অথচ নদী পার না হয়েও কোন উপায় নেই। ওপারে যে তাদের যেতে হবেই।

অগত্যা পোটলা-পুটলিগুলো বেঁধে নেওয়া হল মাথায়। তারপর 'জয় ভারতমাতা'র নাম করে সবাই ঝাঁপ দিল জলে। মিনিট পনেবর মধ্যে সাঁতবে পাব হয়ে গেল নদী ; উঠল গিয়ে ওপারে।

কাছেই ছিল একটা উইয়েব ঢিবি। যতীন্দ্রনাথ বললেন, 'চল, ওখানে যাওযা যাক ; জায়গাটা বেশ নিবিবিলি। ওব আড়ালে বসলে বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না আমাদের। বেশ আরামে বিশ্রাম কবা যাবে।'

যতীন্দ্রনাথেব কথা অনুযায়ী সবাই গিয়ে বসল উই-ঢিবির পাশে। জামার বোতামগুলো খুলে ফেলল। শরীরটাকে এলিয়ে দিল মাটিতে।

উঃ, কি শান্তি।

কিন্তু না, শান্তি নেই ওদের কপালে . আরাম নেই ভাগ্যে।

হঠাৎ নদীর ওপারে দূর-পাল্লার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল সবাই বুঝল, ওরা কেবলমাত্র মামুলী পুলিশ নয়, একেবারে ফৌজ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

তা হলে এখন উপায়?

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' যতীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমরা হয়তো মরব ঠিকই, তবে তার আগে ওদের কয়েকজনকে মেরে যেতে চাই। জানি, এই সামান্য কাজটুকুতেই ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল কেটে যাবে না, তবে আমরা সেই শিকল ভাঙ্গার সংগ্রামে কিছুটা টান অন্তত দিয়ে যেতে পারব।'

যতীনের কথা শুনে বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন আর জ্যোতিষের। ওরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আক্রমন শুরু করার জন্য।

যতীন বললেন, 'আপাতত তোমরা একটু ধৈর্য ধরে থাকো। ওদের আগে এগিয়ে আসতে দাও কাছে। তারপর আমার নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে আক্রমণ।'

'ঠিক আছে।'

চারজন বিপ্লবীই একসঙ্গে তাঁদের নেতার আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন।

ওদিকে সিপাইয়ের দল এগিয়ে আসছে তো আসছেই। ওদের চলার কায়দা দেখতে মনে হল যেন কোন দিগ্বিজয়ী সৈন্য-বাহিনী এগিয়ে আসছে একটার পর একটা দেশ জয় করে। ওদের বাধা দেবার কেউ নেই; বাধা দেওয়া সম্ভব নয়।

দেখতে দেখতে মাউজার পিস্তলের নিশানার মধ্যে এসে গেল ডেনহামের সৈন্যদল। সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠলেন, 'ফায়ার।'

আর দেখতে হল না—মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল পাঁচটা পিস্তল—

দ্রুম···দ্রুম···দ্রুম...

এমন আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে গেল দিগ্বিজয়ীর দল। পর পর কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বহুলোক আহত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে গেল ঘরে। দেখতে দেখতে সমগ্র এলাকা পরিণত হল এক নতুন কুরুক্ষেত্রে। পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে চলল শত কুরুর লড়াই।

প্রায় দু'ঘণ্টা স্থায়ী হল এই ধর্মযুদ্ধ। মুষল ধারে বর্ষিত হল গুলি। কিন্তু ভারতমাতার দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত ধর্ম পরাজিত হল অধর্মের কাছে। বিপ্লবীদের গুলির ষ্টক ফুরিয়ে গেল অবিরত বর্ষণে

যুদ্ধরত অবস্থাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল চিত্তপ্রিয়র। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হলেন যতীন্দ্রনাথ। অক্ষত দেহে ধরা পড়লো মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ আর নীরেন।

হাসপাতালেই মৃত্যু হল যতীনের। সেদিনটা ছিল নয়ই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' পনের।

এর কদিন পরেই বিচার শুরু হল নীরেন, মনোরঞ্জন আর জ্যোতিষের। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা নাকি মৃত অপর দুই ব্যক্তির সঙ্গে একত্রিত হয়ে মহামান্য বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এবং এই ষড়যন্ত্রের ফলেই দু'জন নিরীহ গ্রামবাসী ও কয়েকজন রাজভক্ত সৈনিকের অমূল্য জীবন নষ্ট হয়েছে। অতএব এই গুরুতর রাজদ্রোহমূলক কাজের শাস্তিস্বরূপ সরকার বাহাদুর মাননীয় আদালতের কাছে এই তিনজন দুষ্কৃতকারীরই প্রাণদণ্ডাদেশ প্রার্থনা করছে।

মহাশক্তিধর ভারত সরকারের আবেদন অগ্রাহ্য করে, এমন দুঃসাহসী বিচারক কে আছে এই অভাগা দেশে? তাই, যখন মামলার রায় প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল, সরকারের আবদারই রক্ষিত হয়েছে আদালতের রায়ে। মনোরঞ্জন আর নীরেনের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। শুধুমাত্র জ্যোতিষের বেলায় দেখান হয়েছে কিছুটা দাক্ষিণ্য।

তাঁকে ফাঁসির দড়িতে লটকাবার হুকুম হয়নি—আদেশ হয়েছে দ্বীপান্তরে যাবার, চৌদ্দ বছরের জন্য।

এভাবেই একদিন যবনিকা পড়ল এক অগ্নিক্ষরা বিপ্লব প্রচেষ্টার ওপর। তবু সান্ত্বনার কথা এই, এ ঘটনা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের মনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল, তরুণদের অন্তরে নতুন করে জাগাল এক দুর্বার আকাঙ্খা—যে কোন মূল্যেই হোক এবার ভাঙতেই হবে শৃঙ্খল, অন্ধকারার রুদ্ধকক্ষ থেকে উদ্ধার করে আনতেই হবে ভারতমাতাকে।

শুধু এটাই নয়, আরো একটা দুঃসাহসী প্রচেষ্টা হয়েছিল এ সময়—অন্যখানে, অন্য এক মহাবিপ্লবীর নেতৃত্বে।

সে দিনটা ছিল উনিশ শ' পনের সালের একুশে ফেব্রুয়ারি

আগে থাকতেই ঠিক হয়েছিল, ঐ দিন চারদিক থেকে সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর। আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে দুষমনদের। তারপর তাদেরই মৃতদেহের ওপর উড়িয়ে দেবে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা।

যদিও নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট ছিল একুশে ফেব্রুয়ারী, কিন্তু প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল তার অনেক আগে।

তখন ইউরোপে সবেমাত্র শুরু হয়েছে সমর—প্রথম মহাযুদ্ধ।

জার্মানীর আকস্মিক আক্রমণে প্রায় সবকটা ইউরোপীয় রাষ্ট্র তটস্থ হয়ে উঠেছে। সকলেই তখন নিজের নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় মরণ বাঁচার সংগ্রামে নেমে পড়েছে। মহাপরাক্রান্ত ইংরেজও সে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাকেও দিনরাত চিন্তা করতে হচ্ছিল, কিভাবে জার্মানদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

কথায় আছে, কারো বা পৌষ মাস কারো বা সর্বনাশ। ইংরেজের বেলাও হল তাই। ইংরেজের পরাজয় মানেই তো

ভারতবাসীর জয়। সুতরাং এইতো সুযোগ। এখন যদি ইংরেজকে ভিতরে বাইরে, দুদিক থেকে ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহলে ব্যাটারা পালাবারও পথ পাবে না। এখানেই পিতৃদত্ত সাধের জানটা রেখে দিয়ে যেতে হবে বাছাধনদের।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কে নেবে এই মহাদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার? কারমধ্যে আছে সে দুঃসাহস, সেই অসীম সংগঠন প্রতিভা?

কেন, রাসবিহারী রয়েছে না। চন্দননগরের রাসবিহারী বসু। সেই তো নিতে পারে এই মহাবিপ্লবের দায়িত্ব—নেতৃত্ব।

কথাটা শুনে অনেকেই জানতে চাইল, কে এই রাসবিহারী? কি তাঁর পরিচয়? কি তাঁর অতীত ইতিহাস?

সে অনেক কথা, অনেক কাহিনী।

সবকিছু জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে পুরো দুটো বছর—অর্থাৎ উনিশ শ' বার সালের তেইশে ডিসেম্বর তারিখে।

সেদিন পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষ্যে সমগ্র দিল্লী নগরী উৎসবে উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে নবযৌবন প্রাপ্তা তরুণীর সাজে। যারা এর আগে কোনদিন হাজার বসন্ত অতিক্রান্তা চর্মসার শ্রীহীনা দিল্লীকে দেখেনি, তারা আজকের দিল্লীকে দেখে বুঝতেই পারবে না যে গতকাল পর্যন্তও এই নগরীর অঙ্গে অঙ্গে শত হানাদারের ধর্ষণের চিহ্ন কুৎসিৎ ইঙ্গিত হয়ে দৃষ্টিশক্তির মর্মমূলে মহাকালের ত্রিশূলের আঘাতের চরম যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করছিল।

চারিদিকে পতাকা-ফেষ্টুন, তোরণ-নহবৎ, শান্ত্রী-সিপাই, ঘোর সওয়ার-লাঠিয়াল এমন এক চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের অবতারনা করেছিল যে, তখন শয়নে-স্বপনে-জাগরণে প্রতিটি লোকের মনে শুধু এক ভাবনা, এক কল্পনা—কখন শোভাযাত্রা বের হবে, কখন বসবে দিল্লী দরবার।

অবশেষে নিষ্পলক প্রতীক্ষার অবসান হল। এক বিরাট বাদশাহী হাতির পিঠে সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বসিয়ে শুরু হল ঐতিহাসিক অভিষেক শোভাযাত্রা। পিছনে পিছনে এল বড় বড় রাজ কর্মচারী, দেশীয় ছোট-বড়-মাঝারী রাজা-মহারাজার দল আর পাত্র-মিত্র-অমাত্যের গুষ্টি।

সবাই চলেছেন দরবারে। দিল্লী দরবারে।

উদ্দেশ্য ?

মহাপরাক্রান্ত ইংল্যাণ্ড রাজের প্রতিনিধি হিসেবে, কলকাতা থেকে সদ্য উঠে আসা নতুন রাজধানীতে, নতুন বড়লাটের কর্মভার গ্রহণ। সে কারণেই এত আয়োজন; এত সমারোহ।

ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা এগিয়ে এল চাঁদনী চকে—পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছাকাছি।

সে কি ভীড়! সে ধাক্কাধাক্কি! কোথাও একটু তিল ধারণের জায়গা নেই—শুধু মানুষ, মানুষ, আর মানুষ।

এরই মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় কোনরকমে এক চিলতে জায়গা করে নিলেন লীলাবতী। মনে মনে বললেন, তবু রক্ষে যে, এখন শীতকাল—গরমের সময় হলে আর কথা ছিল না—ধাক্কাধাক্কি গুঁতগুঁতিতে এমনিই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। কি জানি, হয়তো বড়লাট বাহাদুরকে দেখাই হয়ে উঠত না। সত্যি ভাগ্যটা আমার ভালই বলতে হবে। তবু মেয়েমানুষ বলে দাঁড়াবার জায়গা পেলাম; পুরুষমানুষ হলে আর মাটিতে দাঁড়াতে হত না, শূন্যে ভেসে লাটসাহেবকে দেখতে হত।

ইতিমধ্যে পায়ে পায়ে শোভাযাত্রা চলে এসেছে একেবারে ব্যাঙ্কের সামনে। হ্যাঁ, ঐতো দেখা যাচ্ছে লাট বাহাদুরকে। ভদ্রলোক কেমন মেজাজে বসে আছেন তাকিয়া-ভর দিয়ে। মনে হচ্ছে, যেন স্বয়ং সম্রাট আকবর চলেছেন দেওয়ান-ই আম-এ।

কিন্তু একি, হঠাৎ একি হল !

ক্রু···ম· ·ম ·ম···ম···

কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না। এত ধোঁয়া কিসের?

সবলোক এমনভাবে দৌড়াচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

কে শোনে কার কথা? আগে আপনি বাঁচলে, তবে তো বাপের নাম। অতএব দৌড়োও।

শুধু কি মানুষ? মিছিলের হাতি, ঘোড়াগুলোও পর্যন্ত দৌড়োতে শুরু করল সোজা; যেদিকে দু'চোখ যায়। পায়ের তলায় মানুষ পিষে মরছে সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময় এখন নয়। পশু হলে হবে কি—ওদেরও তো জানের একটা দাম আছে।

কিন্তু হয়েছেটা কি?

বোমা পড়েছে; মারাত্মক বোমা। একেবারে প্রাণঘাতি বোমা।

ধোঁয়া সরে যেতে ব্যাপারটা আরো ভালকরে বোঝা গেল—একেবারে স্পষ্টভাবে।

বড়লাটের মাথায় বোমা পড়েছে। বোমার আঘাতে বেচারার পিঠের মাংস উড়ে গেছে; কাঁধের কাছে গর্ত হয়ে গেছে দু'ইঞ্চি পুরো। সেখান থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বোঝা যচ্ছে না শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবের লাটসাহেবী টিঁকবে কিনা।

দরবার যাক চুলোয়, এখন লাটসাহেবের জান বাঁচলে হয়।

তবু নিয়মরক্ষার জন্য একটা অনুষ্ঠান হল; সে অনুষ্ঠানে লাটসাহেবের প্রতিনিধি হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন একজন বে-লাট।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বোমাটা ছুড়লে কে?

এমন ঘটনায় রাগে-শোকে-অপমানে-লজ্জায় মাথা খারাপ হয়ে গেল সারাটা ব্রিটিশ জাতের। খোদ লণ্ডন থেকে আদেশ হল, যে করেই হোক আসামীকে পাকড়াও করতেই হবে। তা না হলে কারো ধরে আর মুণ্ড থাকবে না।

ছুটো-ছুটি পড়ে গেল চারদিকে। গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল যাকে তাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল জেরা— নির্যাতন।

এগিয়ে এলেন রাজা-মহারাজার দল। ঘোষণা করলেন, যে আততায়ীকে ধরিয়ে দেবে তাকে দেওয়া হবে প্রচুর পুরস্কার।

শুধু কি তাই? বড়লাটের উপর এই নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদে দিকে দিকে অনুষ্ঠিত হতে লাগল সভা-সমিতি আলোচনাচক্র। সে সব সভায় গরম গরম ভাষায় অগ্নিবর্ষণ চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

এ রকমই একটা প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল দেরাদুনে। সেখানে বন-বিভাগের কর্মচারী একজন বিশিষ্ট বাঙালী যুবক যে অগ্নিবর্ষী ভাষণ দিলেন তার কোন তুলনা হয়না। যুবকটি বললেন, 'মহাশক্তিধর সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিনিধি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বর্বর ও কাপুরুষোচিত আক্রমণ করা হয়েছে, সে আক্রমণকে নিন্দা করবার মত উপযুক্ত ভাষা আজো আবিষ্কৃত হয়নি। তবু সমগ্র জীবন ধরে আমার হৃদয়ে যতটুকু ঘৃণা সংগৃহীত হয়েছে তার সবটুকুই আমি আজ উজাড় করে দিচ্ছি সেই সব নীচ, কাপুরুষ বিপ্লবী নামধারী ডাকাতদের উদ্দেশ্যে, যারা সাহসের অভাবে ভিড়ের মধ্যে চোরের মত লুকিয়ে থেকে একজন মহৎপ্রাণ রাজ-পুরুষকে আক্রমণ করেছে। আমি দাবি করছি, যে করেই হোক, এই সব নীচ মনোবৃত্তির লোক-গুলোকে খুঁজে বের করা হোক; এবং সরকার বাহাদুর প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করুন যে, কোন অবস্থাতেই এ সব বদমায়েসদের প্রতি কোন রকম করুণা প্রকাশ করা হবে না। একমাত্র মৃত্যু-দণ্ডই হবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

সত্যি, একেবারে হাণ্ড্রেড পার্শেন্ট খাটি ইংলিশ মাইণ্ডেড বটে।

যে শুনল, সেই বলল, এমন রাজভক্ত আর হয় না।

খবরটা সাধারণ বিপ্লবীদের কানে পেঁছতেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, এমন দালালকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখাটা দেশের স্বাস্থ্যের

পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং প্রথম সুযোগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু সরাবে কে? তার জন্য তো ওপরওয়ালা নেতার অনুমতি চাই। নেতার অনুমতি না পেলে তো বিপ্লবীদের পক্ষে এক পাও এগোন সম্ভব নয়।

ওদিকে সারাটা দেশ জুড়ে তখন তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। যে করেই হোক, আততায়ীকে ধরতেই হবে।

চব্বিশে জানুয়ারী ঘোষণা করা হল, যে আততায়ীকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে একলক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু আশ্চর্য, একটা লোকও এগিয়ে এল না আততায়ীকে ধরিয়ে দিতে। বরং উল্টে সতেরই মে আবার একটা বোমা পড়ল লাহোরের লরেন্স গার্ডেনের পুলিশ ক্লাবে। এবারের টার্গেট—পাঞ্জাবের সহকারী কমিশনার মিঃ গর্ডন।

মাথা ঘুরে গেল সারাটা বৃটিশ রাজের। সবার মুখে এক প্রশ্ন, কে, কে রয়েছে এই ষড়যন্ত্রের পিছনে?

প্রশ্নটা শুনে অলক্ষ্য থেকে হাসলেন একজন। তিনি আর কেউ নন—সর্বকর্মের নিয়ন্তা স্বয়ং বিধাতা পুরুষ।

সব রহস্যের অবসান হল দীর্ঘ এক বছর পরে—উনিশ শ' তের সালের একুশে নভেম্বর।

কলকাতায় আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে, আগে থাকতে নির্দিষ্ট খবর পেয়ে, একদল পুলিশ এসে হানা দিল হঠাৎ। উদ্দেশ্য, বিপ্লবী অমৃত হাজরাকে গ্রেপ্তার করা।

'কিন্তু একি!' পুলিশ অফিসার চমকে উঠল, 'এযে বোমা তৈরীর কারখানা!

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল লালবাজারে—আরো পুলিশ পাঠাও,

আরো বন্দুক আনো। জায়গাটা বড় ভয়ঙ্কর ; এখানে যখন তখন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে—যখন তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে সব কিছু। তাছাড়া এখানকার লোকগুলোও খুব মারাত্মক। একজনই দশজনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা রাখে।

অতএব ছুটে এল আরো পুলিশ, আরো অফিসার, আরো গোয়েন্দা। সবাই মিলে ঘিরে ফেলল বাড়ীটার চারদিক। এখন এই ব্যূহ ভেদ করে একটা মশাও যে বাইরে যাবে, তেমন উপায় আর রইল না।

ধরা পড়লেন অমৃত হাজরা, চন্দ্রশেখর দে, দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদাচরণ গুহ প্রভৃতি অনেক প্রখ্যাত-অখ্যাত বিপ্লবী ; আর সেই সঙ্গে একটুকরো কাগজ।

তেমন কিছু নয়, নিতান্ত সাধারণ একটা কাগজ—তার উপর হিজিবিজি কয়েকটা দাগ কাটা। অথচ সেই কাগজটাকেই অতি যত্নে ভাজ করে পকেটে রাখলেন তদন্তকারী অফিসারটি।

ব্যাস এই ? তাছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি ?

কে বলেছে পাওয়া যায়নি ? বোমার খোলগুলো যে পাওয়া গেল, সেটা বুঝি কিছু নয় ?

হ্যাঁ, সেটাও একটা ব্যাপার বটে।

শুধু ব্যাপার নয়—ওইটাই আসল ব্যাপার। ঐ খোলটাই তো সব কিছু।

কেন ?

কেন আবার কি ? ও খোলটা যে দিল্লীতে বড়লাটের ওপর নিক্ষিপ্ত বোমার খোলের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ঐ খোল দেখেই প্রথমে সন্দেহ হয়েছে তদন্তকারী অফিসারের। সেইজন্যই তিনি খুব যত্ন করে তুলে নিয়েছিলেন হিজিবিজি দাগ

কাটা কাগজের টুকরোটা। বুঝেছিলেন, ও থেকেই অনেক রহস্যের কিনারা খুঁজে পাওয়া যাবে, অনেক অলিখিত প্রশ্নের জবাব মিলবে।

বাস্তবে হলও তাই। হিজিবিজি দাগগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা রহস্যময় আলোকবর্তিকা—একটা নাম।

তেমন কিছু হামবড়া নাম নয়; একেবারে সিধেসাধা নাম—আমীরচাঁদ।

'নিবাস?'

'দিল্লী।'

'পেশা?'

'শিক্ষকতা।'

'কোথায়?'

'সেণ্ট জোসেফ স্কুলে।'

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল দিল্লীতে গোয়েন্দা বাহিনীর সদর দপ্তরে—পাকড়াও এক্ষুনি লোকটাকে। দেখো, কোন মতে যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

খবর পাওয়ার পর এক মিনিটও লাগল না, যে যেমন পোষাকে ছিল সে তেমন পোষাকেই উঠে বসল গাড়ীতে, ড্রাইভারকে হুকুম দিল, 'চালাও জলদি।'

ছু'ঘণ্টা পরেই খবর এল কলকাতায়, 'হ্যালো ডেনহাম, গুড নিউজ। আমিরচাঁদকে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ছু'এক দিনের মধ্যে আরো কিছু নতুন সোর্স পাওয়া যাবে।'

'থ্যাঙ্ক উই মিকি।'

সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানালেন পুলিশের ডি, আই, জি, মিঃ ডেনহাম।

পরদিন এল আরো সুসংবাদ। দীননাথ তলোয়ার নামে আরো একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং সুখের কথা, লোকটা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে।

এই দীননাথ তলোয়ারের স্বীকারোক্তির সূত্র ধরেই পর পর গ্রেপ্তার করা হল বালমুকুন্দ, অবোদবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস, হীরাচাঁদ প্রভৃতি অনেককে। সেখান থেকেই জানা গেল, লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করেছিল কোন পুরুষ নয়, একজন মহিলা ; নাম তার লীলাবতী।

'কে এই লীলাবতী ?'

জানতে চাইল তদন্তকারী অফিসার। কিন্তু জবাব শুনে তার মুখ থেকে আর একটাও কথা বের হল না। কারণ, তিনি শুনলেন লীলাবতী নাকি আসলে মেয়েই নয় ; নিতান্তই এক সাদামাটা যুবক। অর্থাৎ একেবারে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি একজন পুরুষ।

'কে সে ?'

'বসন্ত বিশ্বাস !'

হ্যাঁ, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে বসন্ত বিশ্বাসই সেদিন এক সুবেশা তরুণীর সাজে সজ্জিত হয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দোতলার করিডোরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিঃশব্দে ; মেয়েদের ভিড়ের মাঝে। তখন তাঁর বুকের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল এক চরম উত্তেজনায়—প্রচণ্ড আনন্দে।

মাত্র কয়েক মিনিট; আর মাত্র কয়েক মিনিট পরেই তাঁর হৃদয়ের সব কামনা, সব বাসনা চরম পরিপূর্ণতার আনন্দলোকে পৌঁছে যাবে ; ব্রিটিশ সিংহের সব গর্ব ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। এত সমারোহের দরবার ; এত উচ্ছ্বাসের শোভা যাত্রা ; এত ঐশ্বর্যের অহঙ্কার—সব-কিছু নিষ্প্রভ হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। শুধু পড়ে থাকবে এক গর্বিত সাম্রাজ্যবাদী শোষকের ছিন্নভিন্ন মাংসের পিণ্ড আর বিস্ফোরিত কলিজাটা।

হ্যাঁ, ওতেই আনন্দ—ওতেই হবে সব পাওয়া ; সব ঋণ শেষ ! সব দেনা পাওনার অবসান।

লীলাবতী তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের

সামনে লর্ড হার্ডিঞ্জকে নিয়ে শোভাযাত্রা পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়লাটকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছিলেন কলকাতার কারখানায় তৈরী মারাত্মক বোমাটা। আর সেই আঘাতেই লাটসাহেবের জীবনটাই লাটে ওঠবার যোগাড় হয়েছিল।

সেই লীলাবতী, বৃটিশ রাজকে অনেক লালাদর্শন করাবার পর আজ ধরা পড়েছেন—লীলাবতীরূপে নয়, বসন্ত হাজরার মূর্তিতে।

কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন থেকে গেল, আসল পরিকল্পনাটা কার? কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল এমন দুঃসাহসিক প্ল্যান? কে সে?

সে উত্তরও পাওয়া গেল একদিন; অতি ভয়ঙ্কর উত্তর—'রাসবিহারী'।

'রাসবিহারী!'

চমকে উঠল ব্রিটিশরাজ—শেষে কিনা ব্রুটাস-ই।

হ্যাঁ, ব্রুটাস-ই বটে। এই সেদিনও লোকটা বড়লাটকে দেখে কত কুর্নিশ, কত আদাব জানাল; ভাল ভাল কথা বলল শোক-সভায়। আর সে ই কিনা গোপনে গোপনে এমন মারাত্মক পরিকল্পনাটা তৈরী করেছে! সত্যি, মানুষকে বাইরে থেকে দেখে এতটুকু চেনা যায় না। কে বলবে, যে এমন লোকও শেষ পর্যন্ত বেইমানী করতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটল দেরাদুনে। যে ভাবেই হোক লোকটাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! পুলিশ এসে দেখে বাংলোর দরজা জানালা হাঁ করে খোলা; ভিতরে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। শিকারী আসবার আগেই শিকার টের পেয়ে সরে পড়েছে খাঁচা ছেড়ে! যাবার সময় একটা কাগজের টুকরোও ফেলে যেতে ভোলে নি।

কিন্তু তাই বলেতো আর পুলিশকে বসে থাকলে চলবে না। যে করেই হোক পাকড়াও করতে হবে বদমাসটাকে। তা না হলে সমগ্র ব্রিটিশ রাজের প্রেষ্টিজ পাংচার হয়ে যাবে যে।

অতএব ঘোষণা করা হোক পুরস্কার। দশ-বিশ টাকা নয়, মোট সাড়ে সাত হাজার টাকার পুরস্কার। যে ধরিয়ে দেবে রাসবিহারীকে, তার হাতে তুলে দেওয়া হবে কড়কড়ে সাড়ে সাত হাজার টাকার নোট।

শুধু কি তাই? একদঙ্গল রাজা মহারাজা মিলিতভাবে ঘোষণা করলেন, যে মহৎ দেশপ্রেমিক ঐ খুনেটাকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে তারা দেবেন নগদে একলক্ষ টাকা।

সত্যিই তো, এ না হলে আর রাজভক্তিটা দেখানো যাবে কি করে? তা ছাড়া, এসব না করলে সম্রাটই বা আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখবেন কোন ভরসায়?

শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম—যেখানেই সামান্যতম সূত্র পাওয়া গেল সেখানেই গিয়ে হাজির হল পুলিশ। দেরাদুন, দিল্লী, লাহোর, বেনারস, অমৃতসর, পাটনা, কলকাতা, চন্দননগর ডায়মণ্ডহারবার—কোথাও আর খোঁজার বাকি রইলনা।

একদিন খবর পেল গোয়েন্দা দপ্তর যে, বেনারসে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে রাসবিহারী।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ফাষ্ট অফিসার থেকে লাষ্ট অফিসার পর্যন্ত সবাই। আগে থাকতেই বাড়ীটার চারদিক ঘিরে ফেলল এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। প্রত্যেকের চোখে তীক্ষ্ণ চাহনী; যেন কোন মতে একটা মশাও উড়ে যেতে না পারে বাড়ীর বাইরে।

সবরকম আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সমাপনের পর ফাষ্ট অফিসার গিয়ে ধাক্কা দিলেন বাড়ীর গেটে! বললেন, 'তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। এক বৃদ্ধ উড়ে ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন দোর গোড়ায়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই।'

'চাই রাসবিহারীকে।'

ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন অফিসারটি।

'ভিতরে আসুন, তিনি উপরের ঘরে বিশ্রাম করছেন।'

বেশ শান্ত স্বরে জবাব দিলেন উড়ে ঠাকুরটি।

সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল সিঁড়ির মুখে। সবাই হুড়মুড় করে উঠে গেল দোতলায়। এমন কি যারা বাইরে পাহারায় ছিল তারাও ঢুকে পড়ল ভিতরে। সবারই মনের এক ভাব, এখন আর বাইরে পাহারা দেওয়ার দরকার কি ; আসামীকে তো বাড়ীর মধ্যেই পাওয়া গেছে হাতেনাতে।

কিন্তু একি, সব কটা ঘরই যে ফাঁকা। তা হলে কি মিথ্যে কথা বলল ঠাকুরটা ? ঠিক আছে, ডাকো ব্যাটাকে, মিথ্যে কথা বলার মজাটা টের পাওয়াচ্ছি।

একজন ছুটে গেল রান্না ঘরে—উড়েটাকে ধরে আনার জন্য।

কিন্তু কোথায় উড়ে ? রান্না ঘর যে ফাঁকা। তবে কি……! বুকটা ধুক করে উঠল অফিসারের—তবে কি ঐ উড়ে ঠাকুরটাই…!

হ্যাঁ, তাই। পুলিশের দল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই টুপ করে সরে পরেছে ঠাকুরটা। অর্থাৎ স্বয়ং রাসবিহারী।

আর একদিনের কথা।

কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরে খবর এল, রাসবিহারী নাকি চন্দননগরে তাঁর নিজের বাড়িতে এসে উঠেছেন। যদি এই মুহূর্তে সেখানে হানা দেওয়া যায় তাহলে আসামীকে একেবারে বামাল ধরা যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটল চন্দননগরে।

ওদিকে চন্দননগরের লোকাল পুলিশও হাজির হল নির্দিষ্ট বাড়ীটির সামনে। সবার মনে তখন এক প্রতিজ্ঞা, এবার আর কোন ছাড়ান-ছোড়ন নেই—বাছাধনকে ধরে কোমরে দড়ি পরিয়ে তবে বিশ্রাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেই ফিরে আসতে হল স্বস্থানে। কারণ, রাসবিহারী নেই। একটু আগেই তিনি বেরিয়ে গেছেন বাড়ী থেকে।

কি ভাবে?

খুব সহজ ভাবে; একেবারে সাধারণ পোষাকে; সামান্য মেথরের সাজে। সঙ্গে ছিল দুটো অমূল্য সম্পত্তি—একটা বালতি আর একটা ঝাটা।

এভাবেই চলল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

রাসবিহারীর তখন কত নাম; কত বিভিন্ন পরিচিতি। কখনো তিনি ফ্যাটবাবু, কখনো চন্দ্রনাথ, কখনো সতীন্দ্রচন্দর, কখনো সতীশচন্দর। কখনো তিনি উড়ে, কখনো মাড়োয়ারী; কখনো পাচক, কখনো মেথর। এই বিচিত্র মানুষটিকে সেই বহুরূপীর মেলা থেকে চিনে বার করবে এমন সাচ্চা জহুরী তখন সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একটা নেই। তাই দিনের পর দিন তারা ছুটে চলেছে মরিচিকার পিছনে—আলেয়ার মায়ায়।

এদিকে, এত বিপদ সত্বেও রাসবিহারী কিন্তু কখনোই একটা মুহূর্তও নষ্ট করেননি অতীত স্মৃতি রোমন্থনে। প্রতিটা সেকেণ্ড, প্রতিটা মিনিট—একটা মাত্র চিন্তাই তাঁকে পাগল করে রেখেছিল—তা হল মাতৃভূমির শৃঙ্খলমুক্তি।

সেটা উনিশ' শ' চৌদ্দ সাল। ইউরোপে সবেমাত্র শুরু হয়েছে যুদ্ধ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

জার্মান বাহিনীর দাপটে ইংরেজের তখন ল্যাজে-গোবরে হবার মত অবস্থা। সে ঘর সামলাবে, না বাইরে দেখবে—সেটাই কিছুতে ঠিক করে উঠতে পারছে না।

'এই হল সুযোগ।' রাসবিহারী বললেন, 'এ সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। যেভাবেই হোক, এ সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।'

'কিন্তু কি করে?'

প্রশ্ন করলেন একজন সহযোগী।

'আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে; ভিতরে-বাইরে, সিভিল-মিলিটারী সর্বক্ষেত্রে। একসঙ্গে গর্জে উঠতে হবে সারাদেশের মানুষকে। বাঙালী, বিহারী, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী কেউ বাদ গেলে চলবে না; কেউ বসে থাকলে হবে না। আমাদের ঢুকতে হবে মিলিটারীর মধ্যে, সরকারী অফিসে, থানায়, আদালতে। জাগিয়ে তুলতে হবে সকলকে; দীক্ষিত করতে হবে মাতৃমুক্তির মন্ত্রে। তা হলেই আসবে মুক্তি—সফল হবে বিদ্রোহ।

দেখতে দেখতে খবর চলে গেল কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ পাটনা, কানপুর, লাহোর, পেশোয়ার, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কাবুল, বার্লিনে।

ডাক পেয়ে ছুটে এলেন সবাই রাসবিহারীর কাছে; বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে।

শুধু দেশে বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই নয়, সুদূর আমেরিকা থেকেও ছুটে এলেন বিপ্লবীর দল। তাছাড়া বার্লিন থেকে সমর্থন জানালেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অম্বাপ্রসাদ, অজিত সিং-এর দল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল আলোচনা বৈঠক; যুক্তি, প্রতিযুক্তি; তর্ক, বিতর্ক। অবশেষে গৃহীত হল সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত: আমরা বিদ্রোহ করব।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিল্লীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পড়ল সন্ত বাসাখা সিং-এর ওপর। দামোদর স্বরূপ গেলেন এলাহাবাদে, হৃদয়রাম জলন্ধরে আর হরিধন হারার ও পিয়ারা সিংকে পাঠানো হল কোহাটে।

জব্বলপুরের জন্য নির্বাচিত হলেন নলিনী মুখার্জী, বিভূতি হালদার; এবং প্রিয়নাথের উপর দায়িত্ব পড়ল বেনারসের, আর বিশ্বনাথ পাঁড়, দিল্লা সিং ও মঙ্গল পাণ্ডে ভার নিলেন রামনগর-সিক্রোল সেনানিবাসের।

পিংলে ও কর্তার সিংকে বলা হল মীরাট, আম্বালা, ফিরোজপুর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘুরে ঘুরে সংগঠন তৈরী করার জন্য। আর গুলাব সিং ও হরনাম সিংকে পাঠানো হল বান্নুতে। বাংলায় রইলেন বাঘা যতীন।

শুধু তাই নয়, গাঁয়ের দিকে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্যও লোক নিযুক্ত হল। মুলা সিং হলেন সেই সংগঠনের চালক।

ঠিক হল, সদর দপ্তর হবে লাহোরে। সেখানে থাকবেন সর্বাধিনায়ক রাসবিহারী বসু আর বিনায়ক রাও কাপলে। এই বিনায়কই হবেন যোগাযোগের সর্বময় কর্তা। তিনি নিয়মিত প্রতিটি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন—খবরাখবর আদান প্রদান করবেন। এবং সব রকম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সর্বদা জানাবেন সর্বাধিনায়ককে।

কিন্তু অসুবিধে দেখা দিল সদর দপ্তরের স্থান নিয়ে।

পুলিশের কড়া নির্দেশ, লাহোর শহরে কোন অপরিচিত লোককে ঘর ভাড়া দেওয়া চলবে না। যে এই আদেশ অমান্য করবে তাকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সে জীবনে আর কখনো এমন বেয়াদবি করতে সাহস পাবে না। ফলে, কেউই স্বামী স্ত্রী ছাড়া একা কোন অবিবাহিত পুরুষকে ঘর ভাড়া দিতে রাজী নয়।

মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন রাসবিহারী, এখন কি করা যায়?

উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সেখনে একটা না একটা পথ আবিষ্কৃত হবেই। রাসবিহারীর ক্ষেত্রেও তাই হল।

এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট বিপ্লবী রামশরণ দাসের স্ত্রী। বললেন, 'এই ছোট ব্যাপার নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ; আমি আপনার স্ত্রী পরিচয়ে থাকব। আপনি বাড়ী যোগাড় করুন।'

'সে কি ?'

ভদ্রমহিলার প্রস্তাব শুনে চমকে উঠলেন রাসবিহারী।

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে বলুন,' ভদ্রমহিলা রাসবিহারীকে বললেন, 'আপনারা দেশের জন্য এতটা করছেন আর আমি এইটুকু করতে পারব না ?'

ভদ্রমহিলার কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল রাসবিহারীর। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বৌদি, আপনার মত মহিয়সী নারী যেন এদেশের ঘরে ঘরে জন্মায়।'

পরদিনই একটা বাড়ী পাওয়া গেল। রাসবিহারী স্বস্ত্রীক সে বাড়ীতে উঠে এলেন বাক্স পেটরা সহ। সবাই জানল, এ বাড়ীতে এক নব বিবাহিতা দম্পতি এসেছেন কর্মব্যপদেশে।

এভাবেই ওরা ছ'মাস ছিলেন ঐ বাড়ীতে। কিন্তু ওদের আচার-ব্যবহার দেখে কেউ কখনো ভাবতেও পারেনি যে ওরা আসল স্বামী-স্ত্রী নয়। বরং ওদের মধ্যে এত মিল দেখে অনেকেই অবাক হয়ে বলেছে, সত্যি কি সুখী দম্পতি ওরা।

ওদিকে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বেশ আশাব্যাঞ্জক খবর আসা শুরু করল। ময়মনসিং ও রাজসাহীতে বিপ্লবীদের রণকৌশল শিক্ষাদানের কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া সাঁওতাল বাহিনী সংগঠিত করার কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

বিদেশ থেকে খবর এল ; খুব ভাল খবর। বার্মা, মালয় ও

সিঙ্গাপুরে সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তাছাড়া বার্লিন থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের দল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ কাবুলে এসে পৌঁছেছেন। সেখানে তাঁরা অপেক্ষা করছেন পরবর্তী নির্দেশের জন্য।

যথাসময়ে নির্দেশ গেল সব কেন্দ্রে—তৈরী হও; চরম মুহূর্ত এগিয়ে এসেছে। এবার 'জয়, ভারতমাতাকী জয়' বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুষমনদের উপর। কোনরকম দ্বিধা করলে চলবে না, কোনরকম দয়া দেখালে হবে না। প্রতিটি পদক্ষেপে হতে হবে নির্মম—নিষ্ঠুর। বাগে পেলেই শেষ করে দিতে হবে শত্রুকে—কেড়ে নিতে হবে সব হাতিয়ার।

ঠিক হল, বিদ্রোহ শুরু হবে একুশে ফেব্রুয়ারী ভোররাত্রে।

কিন্তু হঠাৎ সবকিছু গোলমাল পাকিয়ে গেল দুটো বেইমান কুত্তার জন্য।

এই কুত্তা দুটোর একটার নাম কৃপাল সিং, অন্যটায় নবাব খান; ওরা দু'জনে মিলে একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হল গোয়েন্দা বাহিনীর সদর দপ্তরে। সবকিছু খুলে বলল বড়কর্তাকে। শেষে চলে আসবার আগে পুরস্কারের টাকাটা নগদ দিয়ে দেবার অনুরোধটা করতেও ভুলল না।

এই বেইমানীর খবর পেয়েই রাসবিহারী তাঁর পরিকল্পনা বদলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কেন্দ্রে নির্দেশ চলে গেল—বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ বদলে গেছে; ওটা একুশের বদলে উনিশে ফেব্রুয়ারী শুরু হবে। সবাই ঐদিন আগের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাতেও কোন ফল হল না। আঠার তারিখ মধ্য-রাত্রিতে ইংরেজ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় সেনাদের উপর।

দেখতে দেখতে বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়েক হাজার সৈন্যকে গ্রেপ্তার

করা হল। কোথাও বিনা বাধায়; কোথাও আবার রীতিমত লড়াই করে।

যেমন ফিরোজপুর ক্যানটনমেণ্টে।

ওখানকার সেনাবাহিনী কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে চাইল না ইংরেজ সেনাবাহিনার কাছে। ফলে শুরু হল লড়াই; তুমুল লড়াই। দেখতে দেখতে পঞ্চাশজন ভারতীয় সৈন্য মারা গেল ইংরেজদের মেসিনগানের গুলিতে।

শুধু সেনাবাহিনার উপরই যে আঘাত এল তা নয়—বিপ্লবীদেরও ধরপাকড় করা শুরু হল পূর্ণদ্যমে। লাহোর শহরে তখন এমন একটা বাড়ী ছিল না, যেখানে বিপ্লবীদের খোঁজে পুলিশ বাহিনী হানা দেয়নি।

দেখতে দেখতে বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলেন বিভিন্ন স্থানে। উদ্ধার করা হল বহু অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, প্রচার-পুস্তিকা এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা।

কিন্তু রাসবিহারী?

হায় রে ইংরেজ, এবারও তোমরা তাঁকে ধরতে পারলে না; এবারও সে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে গেল! এরপর তোমরা লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? ছ্যা, ছ্যা, রামো!

ওদিকে তখন সিঙ্গাপুরে ভীষণ উত্তেজনা। একুশ তারিখ সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে আক্রমণ—তুমুল আক্রমণ। তবে একতরফা।

ভারতীয় বাহিনী একতরফা আক্রমণ চালিয়ে ঘায়েল করে ফেলেছে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে। মারের চোটে তারা সবশুদ্ধ স্যারেণ্ডার করেছে। এখন হাত জোর করে জীবন ভিক্ষা চাইছে

এতদিনকার অধস্তন ভারতীয় অফিসারদের কাছে। বলছে, 'তোমরা আর যাই কর, আমাদের প্রাণে মের না।'

একদল এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল জার্মান বন্দীশিবিবেব লৌহ কপাট। মুক্ত করে দিল জার্মান কয়েদিদের।

অন্যদল গেল সৈন্যবাহিনীব উচ্চপদস্থ অফিসাবদের কোয়াটারের দিকে। সেখান থেকে তাদের বন্দী কবে নিয়ে আসা হল নতুন বন্দীশিবিরে।

এভাবে চলল সাতদিন। সাতদিন ধরে সিঙ্গাপুরেব আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে রইল এক আওয়াজে, 'জয় ভারতমাতা কী জয়।' ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেল ফ্ল্যাগ ষ্ট্যাণ্ড থেকে, সেখানে উড়ল নতুন পতাকা—স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নিশান।

কিন্তু তারপর ?

তারপর আবার যে কে সেই। ভারতীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করল ইংরেজেব কাছে ; করতে বাধ্য হল। কারণ, ওদিক থেকে এই সাতদিনেও কোন নির্দেশ এল না, কোন আশার বাণী শোনা গেল না।

অবশেষে শুরু হল ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ; উনিশ শ' পনের সালের সাতাশে এপ্রিল।

দফায় দফায় বিচার চলল বেশ কিছুদিন ধরে।

প্রথম দফার বিচারে প্রাণদণ্ড হয়ে গেল কর্তার সিং, পিংলে, বড় সুরেইন সিং, জগৎ সিং, হরনাম সিং, বখশীশ সিং, ছোট সুরেইন সিং-এর।

দ্বিতীয় দফায় মৃত্যুদণ্ড পেলেন উত্তম সিং, ইসার সিং, রুর সিং, রঙ্গ সিং ও বীর সিং। আর তৃতীয় দফায় ফাঁসির হুকুম হল বলবন্ত সিং, হরনাম সিং, অরুর সিং, বাবুরাম ও মৌলভী আবদুল্লা প্রভৃতি পঞ্চবিপ্লবীর।

শুধু তাই নয়, সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকেও অনেক দেশপ্রেমিক সৈনিককে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকে দেওয়া হল। সেদিন সুসভ্য ইংরেজের এই অসভ্য আচরণ করতে এতটুকু বিবেকে বাধে নি। অবশ্য ওরা যে তারজন্য কোন যুক্তি দেখান নি সেকথা ওদের চরম শত্রুও বলতে পারবে না। যাই বল, ওদের এ গুণটুক চিরকালই ছিল; আজও আছে। যে কোন বিষয় ওরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে। এবারও সেই যুক্তিই দিল—আ ম্যাটার অব ইনডিসিপ্লিন।

সত্যিই তো, অবাধ্যতা কি বরদাস্ত করা যায়? কখনোই না।

কিন্তু রাসবিহারীর কি হল? তাঁর যে কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা কি একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল?

না, বেপাত্তা নন; তাঁর 'পাত্তা' পাওয়া গেছে। তিনি এখন জাপানে আছেন—বেশ বহাল তবিয়তে। প্রতিদিন খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন।

কথাটা বোধহয় ভুল বলা হল। সত্যি কি রাসবিহারী এরপর আর কোনদিন ঘুমিয়েছিলেন? ঘুমোতে পেরেছিলেন? স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কি তাঁর চোখের পাতা দুটোকে কখনো এক হতে দিয়েছিল?

মনে হয়—না। হয়তো আজো তিনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন, একদিন ভারত স্বাধীন হবে; আবার তিনি ফিরে যাবেন তাঁর স্বদেশে; বুকভরে নিশ্বাস নেবেন দেশের বাতাসে; প্রাণভরে পান করবেন মাতৃভূমির অমৃতধারা।

কিন্তু এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে কে? কার বজ্র আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ইংরেজের কারাগার? কে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনবে বন্দিনী ভারতমাতাকে? কে, কে সেই দুঃসাহসী পুরুষ?

কেন, সুভাষ। সুভাষকে কি এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায় না? সে ই-কি পরবে না এ অসাধ্য সাধন করতে?

হ্যাঁ, সুভাষ। শুধুমাত্র সুভাষের দ্বারাই সম্ভব হবে এই অসাধ্য সাধন করা। একমাত্র সেই পারবে লক্ষ্যে পৌঁছতে; জয়কে ছিনিয়ে আনতে।

আসলে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে; উনিশ শ' চল্লিশের জুন মাসে।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর সুভাষচন্দ্র একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'প্রথমতঃ যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয় হবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েও বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে না এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের লড়াই করতে হবে। তৃতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত যদি তার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যে-সব শক্তি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়ছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তবে সে স্বাধীনতা লাভ করবে। সুতরাং এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত।'

কিন্তু কে শুনবে তাঁর কথা?

কংগ্রেস? সোস্যালিষ্ট? কমিউনিষ্ট?

গান্ধীজী ছয়ই সেপ্টেম্বর দেখা করলেন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার শেষে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্বেও, বৃটেনের বিপদের সময় ভারতের উচিত তার সঙ্গে সহযোগিতা করা।'

গান্ধীজীর কথা শুনে দেশবাসী তাজ্জব। সবার মুখে এক জিজ্ঞাসা, 'তাহলে এতদিন ধরে যে বলা হচ্ছিল, যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের মূল্য লক্ষ্য—সেটা কি শুধু কথার কথা?'

শুধু গান্ধীজীই নন, নেহরুও এগিয়ে এলেন বৃটিশকে সমর্থন জানাতে। অথচ এই নেহরুই উনিশ' শ' সাতাশ থেকে আটত্রিশ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সবকটি যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব রচনায় সব থেকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হলেন, এবং জনসাধারণ যখন তাঁর কাছ থেকে আরো বেশি যুদ্ধ-বিরোধী বক্তব্য আশা করছিল তখন তিনি জনসাধারণকে যুদ্ধের সময় বৃটিশকে বিব্রত না করার পরামর্শ দিলেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের এই যখন অবস্থা, তখন জনসাধারণ সমাজতন্ত্রী দলের কাছ থেকে নতুন কিছু কথা শুনতে পাবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রীরাও তাদের এতদিনকার গরম গরম বুলি, গরম গরম প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে তারাও শুর শুর করে ঢুকে পড়ল গান্ধী-নেহরুর ছত্রছায়ে। এবং 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' নীতিকে আশ্রয় করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের থেকেও উচ্চস্বরে বৃটিশের বিপদে তাদের বিব্রত না করার জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ দিতে লাগল।

আর কমিউনিষ্ট? তারা যে তখন ঠিক কি নীতি নিয়ে চলছিল তা তারা নিজেরাই ঠিকমত বুঝে উঠতে পেরেছিল কিনা সেটাই ছিল একটা গবেষণার প্রশ্ন।

চারদিকে এই যখন অবস্থা, তখন সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, তাঁর পক্ষে দেশে থেকে একমাত্র জেলে পচে মড়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যেভাবেই হোক তাঁকে দেশত্যাগ করে বিদেশে যেতে হবে। সেখান থেকে অস্ত্র এবং লোকবল সংগ্রহ করে ঝাপিয়ে পড়তে হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর। তাহলেই, একমাত্র তাহলেই আমরা স্বাধীনতার চরম লক্ষ্যে পেঁছিতে পারব। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নেই—কোন উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কাজ। সুভাষচন্দ্র ডেকে পাঠালেন দেশ-দর্পন পত্রিকার সম্পাদক সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবকে।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন সর্দার তালিব। বললেন, 'বলুন বসুজী, কি সেবা করতে পারি আপনার ?'

সুভাষচন্দ্র হেসে কাছে বসালেন তালিবকে। তারপর কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই সোজাসুজি বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

সুভাষচন্দ্রের মুখ থেকে এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা শুনে তালিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন, এই তো শেরকা-বাচ্চার মত কথা। সারা ভারতে সুভাষবাবু ছাড়া আর কোন নেতার হিম্মৎ আছে যিনি এই মুহূর্তে বলতে পারেন, আমি বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করে ব্রিটিশকে আক্রমণ করব! ভারতকে স্বাধীন করব।

'কুছ পরোয়া নেহি,' তালিব সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'আপনি একটুও চিন্তা করবে না; ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার উপর ছেড়ে দিন; আমি আপনার যাবার ব্যবস্থা করে দেবই।'

তালিবের কথায় সুভাষচন্দ্র খুব খুশী হলেন। মনে মনে বললেন, এই জন্যই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম তালিব সাহেব। আমি জানতাম, আপনার পক্ষেই সম্ভব হবে এমন দুঃসাহসিক কাজ সমাধা করা।

সুভাষচন্দ্রকে কথা দিয়েছেন তালিব। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, কাকে বিশ্বাস করে তিনি বলবেন কথাটা ?

বলা যায় না, দিনকাল যা পড়েছে, তাতে যে কেউ যখন তখন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আজকাল বিশ্বাসঘাতকতা করতে আগের মত আর লোকের চোখের পর্দায় আটকায় না।

দিন নেই, রাত নেই—শুধু চিন্তা, চিন্তা আর চিন্তাই করে চলেছেন তালিব।

তবু প্রশ্ন থেকে যায় কথাটা কাকে বলবেন? কি ভাবে বলবেন?

দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না চোখের পাতায়। সব সময় ভয়, যদি কোন রকমে এ পরিকল্পনা বাইরে প্রকাশিত হয়ে পরে, যদি সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হয়ে যান, তবে তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন না কারো কাছে। সবাই তাঁকেই দোষারোপ দেবে এরজন্য। বলবে, ঐ সর্দারটার বেইমানীর জন্যই সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হলেন।

ভাবতে ভাবতে একসময় হঠাৎ একজন অতি পরিচিত মানুষের মুখ ভেসে উঠে সর্দারের চোখে। আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন তালিব, হ্যা, এই লোকটাই পারবে যোগাযোগের সূত্র বের করে দিতে; এর দ্বারাই সম্ভব হবে সঠিক গাইডকে খুঁজে বের করা।

ভদ্রলোকের নাম সর্দার বলদেও সিং। থাকেন জামসেদপুরে। সেখানে একটা ছোট খাটো ব্যবসা করেন তিনি। সে ব্যবসায় যা দু'পয়সা রোজগার হয়, তার মধ্যে বেশির ভাগটাই ব্যয় করেন বিপ্লবীদের পেছনে; দেশের কাজে। সুতরাং এমন লোককে পরিকল্পনাটা বললে তিনি যে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েই একাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন তাতে কোন সন্দেহই নেই!

যথাসময়েই কথাটা বললেন সর্দার তালিব বলদেও সিংকে। প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন বলদেও সিং। মনে মনে বললেন, এই তো চাই। তা না হলে আর লোকে শের-কা বাচ্চা বলে কেন সুভাষবাবুকে?

'কিছু চিন্তা করবেন না,' বললেন বলদেও সিং 'পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির একজন পলাতক কর্মী থাকেন এখানে। সীমান্ত

প্রদেশের অনেক এলাকাই তাঁর নখদর্পণে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে মনে হয় তিনি আমাদের উপকারে আসতে পারেন।'

'কিন্তু লোকটা যে বিশ্বস্ত, তার প্রমাণ কি?'

নিজের মনের সন্দেহের কথা খুলেই বললেন সর্দার তালিব।

'ভদ্রলোককে আমি অনেক দিন ধরেই জানি', বলদেও সিং বললেন, 'তিনি অনেক দিন ধরে আমার বাড়ীতেই আত্মগোপন করে আছেন। আপনি তো আমাকে ভালভাবেই জানেন, কোন লোকের সম্পর্কে সবকিছু না জেনে আমি কখনোই তাঁকে বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে।'

সর্দার তালিব আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। কারণ তিনি বলদেও সিংকে ভালভাবেই জানেন; এমন লোক যখন একটা লোককে বিশ্বাস করেছেন তখন তাঁকে অবিশ্বাস করার মত মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না।

'তাহলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কখন সাক্ষাৎ হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসা করলেন নিরঞ্জন সিং।

'আপনি চাইলে এখনই সাক্ষাৎ হতে পারে।' বলদেও বললেন, 'তিনি এ বাড়ীর ভিতরেই আছেন।'

'ঠিক আছে, ডাকুন তাঁকে।'

সর্দার বলদেও সিং বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সর্দার তালিব।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন বলদেও সিং; সঙ্গে তাঁর একজন পাঞ্জাবী যুবক।

সর্দার তালিবের সঙ্গে যুবকটির পরিচয় করিয়ে দিলেন বলদেও সিং। বললেন, 'এর নাম সর্দার আচ্ছর সিং চিনার। এর কথাই আমি আপনাকে বলেছিলাম।'

প্রস্তাব শুনে সর্দার আচ্ছর সিং আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন,

'এর থেকে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? বোসবাবুর মত লোক বাইরে যাবেন, সে কাজে আমি যদি যৎসামান্যও সাহায্য করতে পারি তো নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমি আমার যতটা সম্ভব চেষ্টা করব এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য।'

আচ্ছর সিং-এর কথা শুনে মনে মনে খুব খুশী হলেন সর্দার তালিব। হ্যাঁ, এ রকম একজন উৎসাহী যুবকের কথাই তো তিনি ভাবছিলেন এতদিন। এমন দুঃসাহসী একজনকেই তো তিনি খুঁজছিলেন প্রতিমুহূর্তে। ভালই হল, আচ্ছর সিংকে এ কাজের জন্য পাওয়া গেল।

ঠিক হল, প্রথমে যোগাযোগ করা হবে পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির সঙ্গে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে, এমন দুঃসাহসিক কাজের দায়িত্ব তারা নিতে পারবেন কিনা?

খবর পাঠান হল লাহোরে; কীর্তি কিষাণ পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে। বলা হল, সব দিক বিবেচনা করে জানাও, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তোমরা নিতে পারবে কিনা?

প্রস্তাব শুনে বৈঠকে বসলেন দলের প্রথম সারির নেতারা। রুদ্ধকক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল আলোচনা। এই প্রস্তাবের ভাল মন্দ সবদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন বার বার। তারপর সবাই একযোগে রায় দিলেন—ঠিক আছে, আমরা রাজি।

খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতায়—কমরেড রামকিষণকে ভার দেওয়া হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করার জন্য। সে-ই এবার থেকে তোমাদের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ রাখবে। তাকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে পার, সে আমাদের পার্টির একজন বিশ্বস্ত কর্মী।

খবর পেয়ে আনন্দে নেচে উঠল সর্দার তালিব-এর হৃদয়। মনে মনে বললেন, হে ভগবান, শেষ পর্যন্ত তুমি আমার মুখরক্ষা করেছ।

ওরা যদি রাজী না হত তাহলে আমি আর মুখ দেখতে পারতাম না বোসবাবুর কাছে।

খবর পেয়ে আর দেরী করলেন না তালিব। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন এলগিন রোডের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখা করলেন সুভাষ-চন্দ্রেব সঙ্গে। সব খবর বললেন তাঁকে।

তালিবের মুখ থেকে সব কথা জানার পর সুভাষচন্দ্র স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললেন। তবু আর একবার সাবধান করে দিতে ভুললেন না তালিবকে। বললেন, 'দেখবেন, কোন সূত্রে যেন খবরটা বাইরে না বেরোয়। বুঝতেই পারছেন, এখন যুদ্ধের বাজার; সারাটা সময় পুলিশ আমাকে চোখে চোখে রেখেছে।'

'চিন্তা করবেন না বোসবাবু,' তালিব বললেন, 'আমি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তাদের থেকে বিশ্বাসযোগ্য লোক আর এদেশে একটাও পাবেন না।'

'সে বিশ্বাস আপনার উপর আছে বলেই তো আমি অন্য কাউকে ডাকিনি; ডেকেছি আপনাকে।'

সুভাষচন্দ্রের কথায় আনন্দে, উচ্ছ্বাসে বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় তালিবের। উত্তেজনায় জল এসে যায় চোখে। সত্যি, সুভাষবাবু এতটা বিশ্বাস করেন তাকে! শেষ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের দাম তিনি রাখতে পারবেন তো?

ওদিকে, দিন সাতেক পরেই রামকিষেন এবং আচ্ছর সিং চিনার যাত্রা করেন পেশোয়ারের পথে। উদ্দেশ্য, মর্দান জেলার চাল্লা ঢের গ্রামের ভগৎরাম তলওয়ারের সঙ্গে দেখা করা। কারন, সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ী এলাকার প্রায়-সব পথ ঘাটই তাঁর চেনা। তাঁকে গাইড হিসেবে পেলে অনেক সমস্যারই খুব সহজ সমাধান হয়ে যাবে দেখতে দেখতে।

ভগৎরাম কীর্তি-কিষাণ পার্টির একজন গোপন সভ্য। তাছাড়া সে ফরোয়ার্ড ব্লকেরও একজন বিশিষ্ট কর্মী। শুধু কি তাই? ভগৎরামের

জন্মই তো এক বিপ্লবী বংশে। ওর দাদা ছিলেন শহীদ হরিকিষেণ ; পাঞ্জাব গভর্ণর হত্যা মামলার বীর বিপ্লবী। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যাবেই তাতে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই।

রামকিষেণ এবং আচ্ছর সিং যথাসময়ে এসে পোঁছলেন চাল্লা ঢের-এ। এ এলাকার সবাই ভগৎরামকে চেনে। তাই তাঁর ঘর খুঁজে বের করতে ওদের তেমন অসুবিধে হল না।

রামকিষেণ এবং আচ্ছর সিং-এর পরিচয় পেয়ে ভগৎরাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কি করে যে অতিথি সেবা করবেন তা যেন আর ঠিকই করে উঠতে পারছেন না। কখনো নিজের হাতেই বাতাস করেন ওদের ; আবার কখনো তাকিয়াটা এগিয়ে দেন হেলান দেবার জন্য। ওর আদর আপ্যায়নে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন রামকিষেণ আর আচ্ছর সিং। বললেন, 'এভাবে যদি আপনি আমাদের লজ্জা দেন তা হলে আমরা এ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হব।'

'ঠিক আছে সর্দারজী, মাফ চাইছি।' ভগৎরাম বললেন, 'তবে কিনা বুঝলেন, আপনারা হলেন আমার মেহমান। আপনাদের আদর আপ্যায়নে কোন রকম ত্রুটি ঘটলে ওপরওয়ালাতো আমাকে মাফ করবেন না।'

'ঠিক আছে, বলে দেব ওপরওয়ালাকে ; উনি আপনাকে মাফ করে দেবেন।'

রামকিষেণের কথা শুনে তিনজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলেন।

এবার শুরু হল কাজের কথা। সুভাষবাবু দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে চান ; তাঁর পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

'সুভাষবাবু! শের-কা-বাচ্চা?'

ভগৎরাম উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, সুভাষবাবু।' রামকিষেণ বললেন, 'তাঁকে কাবুলে পৌঁছে দিতে হবে। পারবেন?'

'কেন পারব না?'

উল্টে রামকিষেণকেই প্রশ্ন করলেন ভগৎরাম।

'কি ভাবে?'

জানতে চাইলেন রামকিষেণ।

'যেভাবে সবাই গেছেন—বাবা গুরমুখ সিং, বাবা ঈশ্বর সিং—সেভাবেই সুভাষবাবুও যাবেন।'

বললেন ভগৎরাম।

তারপর বিশদ আলোচনা হল বিভিন্ন পথ ও সেগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে। এর মধ্যে দুটি প্রধান পথকে ঠিক করা হল, একটিকে অপরটির বিকল্প হিসেবে। সে দুটি পথ হল: প্রথমতঃ, পেশোয়ার-কাবুল রোডের লরি ড্রাইভার আবাদ খাঁর মারফত, দ্বিতীয়তঃ, কীর্তি কিষাণ পার্টির প্রাক্তন কর্মী ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নওজোয়ান ভারত সভার প্রাক্তন সভাপতি সানোয়ার হোসেন মারফত।

অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আবাদ খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে অনুরোধ করা হবে, তিনি যেন সরাসরি মোটর পথে সুভাষচন্দ্রকে কাবুলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন; এবং তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁর মতে অন্য যে পথ নিরাপদ বলে মনে হবে সে পথেই তিনি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাবেন।

তিরিশে জুন রামকিষেণ, আচ্ছর সিং এবং ভগৎরাম পেশোয়ার এলেন আবাদ খাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেখানে তাদের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা হল। ভগৎরাম বললেন, 'সুভাষবাবুর

পক্ষে সরাসরি সড়ক পথে যাওযাটা ঠিক হবেনা। ওতে, বিপদের সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাব থেকে উপজাতি এলাকাব মধ্য দিয়ে গেলে বিপদেব আশঙ্কা অনেকটা কম থাকবে।'

আবাদ খাঁ ভগৎবামকে সমর্থন জানালেন। বললেন, 'আমাবও সেই মত। যদিও উপজাতি এলাকাব মধ্য থেকে পাযে হেটে যেতে বোসবাবুব খুব-ই কষ্ট হবে তবু তাঁব পক্ষে সে পথে যাওযাটাই হবে নিবাপদেব।'

অবশেষে তাই ঠিক হল। সুভাষচন্দ্র উপজাতি এলাকাব মধ্য থেকেই পাযে হেটে সীমান্ত পাব হবেন।

সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছব সিং বওযানা দিলেন কলকাতাব দিকে। পথে একবাব তিনি নামবেন অমৃতসবে—কীর্তি কিষাণ পার্টিব নেতাদেব সঙ্গে আলোচনাব জন্য। তাবপব যাবেন সোজা কলকাতায—সেখানে সুভাষচন্দ্রকে বুঝিযে বলবেন সম্পূর্ণ পবিকল্পনাটা।

এদিকে পেশোযাবে একটা বাডী ভাডা নেওযা হল কিসাখানি বাজারের ভিতব। সেখানে থেকে গেলেন ভগৎবাম আব বামকিষেণ। ওখানে বসেই তাঁবা যাওয়াব সমস্ত বকম ব্যবস্থা পাকাপাকি কবে ফেললেন। এখন বাকী বইল কেবল সুভাষচন্দ্রেব এসে পেঁছান।

হঠাৎ সবকিছু গোলমাল হযে গেল একটা ঘোষণায। উনত্রিশে জুন সুভাষচন্দ্র ঘোষণা কবলেন, তেশবা জুলাই তিনি হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসাবণের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু কববেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পেঁাছেছেন আচ্ছর সিং। হাওড়া ষ্টেশন থেকে সোজা চলে এলেন এলগিন রোডেব বাড়ীতে। দেখা কবলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। বললেন সমস্ত ব্যবস্থার কথা।

শুনে সুভাষচন্দ্র মনে মনে খুব বিচলিত হলেন। তবু আচ্ছর সিংকে বললেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না—কর্মসূচী তৈরী রাখুন; এখন না হোক, ক'দিন পরে আমি ঠিক-ই যাব। এখানে থাকলে কিছুই করতে পারব না—একমাত্র জেলে পচে মরা ছাড়া।'

সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে কর্মসূচী আপাততঃ স্থগিত রাখা হলেও ঠিক করা হল, এই পরিকল্পনা পরে কার্যকরী করতে গিয়ে যাতে কোন রকম অসুবিধেয় পড়তে না হয় তারজন্য আগে থাকতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হোক।

কীর্তি কিষাণ পার্টির নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে নির্দেশ এল, কমরেড রামকিষেণ যেন এই মুহূর্তে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে পেঁছে তাঁর একমাত্র কাজ হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা।

নির্দেশ পেয়েই রামকিষেণ রওয়ানা দিলেন কাবুলের পথে। প্রায় মাসখানেক পর সেখান থেকে তাঁর চিঠি এল যে, তিনি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন রকম সাড়াই পাচ্ছেন না। এর কারণ হয়তো এই হতে পারে যে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চিঠি পেয়ে পরদিনই রওয়ানা দিলেন আচ্ছর সিং। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তিনিও কোনরকম সফলতা অর্জন করতে পারলেন না এ কাজে।

অবশেষে রামকিষেণ এবং আচ্ছর সিং নিজেরাই এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন আফগানিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ায় যাবেন। সেখানে গিয়ে সরাসরি রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন। তা হলে, হয়তো এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন কাবুল ছেড়ে। সন্ধ্যার দিকে গিয়ে পৌঁছলেন রুশ-আফগান সীমান্তে আমুর নদীর তীরে। মাথার ওপরে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে নিলেন। উদ্দেশ্য, সাঁতরে পার হয়ে যাবেন নদী। ওপারে গিয়ে উঠবেন এক নতুন সূর্যের দেশে—যে দেশ দুনিয়ার মেহনতি মানুষের মুখে প্রথম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যদিও আচ্ছর সিং সাঁতরে গিয়ে উঠলেন ওপারে কিন্তু রামকিষেণ পৌঁছতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। আমুরের রাক্ষসী গ্রাসে ভারতমায়ের এক দুঃসাহসী সন্তান চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন; চলে গেলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাতৃভুমির মঙ্গল কামনা করতে করতে।

এর পর বেশ কিছুদিন চাপা পড়ে রইল এই পরিকল্পনা; অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হয়ে রইলেন সুভাষচন্দ্র।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর বাড়ীতে ফিরেই ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকলেন সুভাষচন্দ্র। সেখানে আলাপ আলোচনার পর আলাদা ভাবে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট নেতা মিয়া আকবর শা-কে। তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন তিনি। অবশেষে অনুরোধ জানালেন, নতুন করে আবার কোন যোগাযোগ করা যায় কিনা, সেটা চেষ্টা করে দেখতে।

পরদিনই আকবর শা ফিরে গেলেন পেশোয়ারে। সেখান থেকে চাল্লা ঢের গ্রামে গিয়ে দেখা করলেন ভগৎরামের সঙ্গে। তাঁকে খুলে বললেন সবকিছু। বললেন, 'আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় এ দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করা। সুতরাং আপনাকেই নিতে হবে এ কাজের দায়িত্ব।

রাজী হলেন ভগৎরাম। বললেন, 'চলুন, পেশোয়ারে গিয়ে দেখা যাক সেখানে আবার পুরান যোগাযোগগুলো ফিরে পাওয়া যায় কিনা।'

পরদিন পেশোয়ারে এসে পৌঁছলেন আকবর শা আর ভগৎরাম। সেখানে খুঁজে বের করলেন আবাদ খাঁ-কে। তাঁকে বললেন সবকিছু। ঠিক হল, আগের বারের পথ ধরেই যেতে হবে

সুভাষচন্দ্রকে। অর্থাৎ শাবকাদা হয়ে কালডাব উপত্যকা অতিক্রম করে কুড়া মেল থেকে লালপুরা সড়ক। এ পথ ধরেই যেতে হবে সুভাষচন্দ্রকে—পৌঁছতে হবে স্বর্যতোবণের দ্বারপ্রান্তে।

পরিকল্পনা ঠিক করে কলকাতায় ফিরে এলেন আকবর শা। সবকিছু বুঝিয়ে বললেন সুভাষচন্দ্রকে।

এবার শুরু হল আর এক তৎপরতা ; আর এক প্রস্তুতি।

সুভাষচন্দ্র জেলখানায় বসেই তাঁর বাইরে যাবার পরিকল্পন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন হেমচন্দ্র, সত্যরঞ্জন বক্সি, মণীন্দ্রকিশো রায় প্রভৃতি প্রথম সারির নেতারা।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তিদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের কারণে সত্যরঞ্জ বক্সিকেও মুক্তি দিতে বাধ্য হল ইংরেজ সরকার। এতে যে মণিকাঞ্চ যোগ ঘটল তারই ফলস্বরূপ, একদিন ইংরেজের সব জারিজুরি, সব বাহাদুরীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে এলগিন রোডের কারাগার থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। তখন একমাত্র মাথা চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার রইল না ব্রিটিশের।

এদিকে ইতিমধ্যে পাঞ্জাব থেকে কীর্তি কিষাণ পার্টির তিনজন বিশ্বস্ত কর্মী এসে হাজির হয়েছেন কলকাতায়। তাঁরা উঠেছেন মট লেনের একটা সাধারণ পাঞ্জাবী হোটেলে।

খবরটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার সদর দপ্তরে। সেই অনুযায়ী সত্য বক্সি বিনয় সেনগুপ্ত, ওরফে সর্বানন্দ সেনকে বললেন, 'তুমি এখনি মট লেনের পাঞ্জাবী হোটেলটায় চলে যাও। সেখানে চার নম্বর ঘরে তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে পাবে। তাঁদের কাছে আমাদের কোর্ড ওয়ার্ডটা বলবে। তা হলেই তাঁরা তোমাকে প্রয়োজনীয় সব কথাই বলবেন।'

নির্দেশ অনুযায়ী যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলেন বিনয়বাবু। হোটেলে ঢোকার মুখে একবার চারপাশ দেখে নিলেন--কেউ অলক্ষ্যে তাকে দেখছে না তো ?

না কেউ নেই। সুতরাং এবার সোজা ঢুকে গেলেন ভিতরে। গেটের মুখেই ম্যানেজারের ঘর। সেখান থেকে হেঁড়ে গলায় একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই ?'

আকস্মিক প্রশ্নে বেশ হকচকিয়ে গেলেন বিনয়বাবু। সত্যিই তো, লোকগুলোর নাম না জেনে এভাবে আসাটা তো মোটেই ঠিক হয়নি।

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'চার নম্বর ঘরে যাব। নতুন তিনজন সর্দারজী এসেছেন আজ সকালে, ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওঃ,' সর্দারজী বললেন, 'ঠিক আছে, চলে যান দোতলায় ; সিঁড়ি থেকে উঠেই বাঁদিকের প্রথম ঘরটাই চার নম্বর কামরা।'

'ধন্যবাদ।'

শব্দটা কোন রকমে উচ্চারণ করেই বিনয়বাবু এগিয়ে গেলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই পেয়ে গেলেন চার নম্বর ঘর। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

খুব আস্তে টোকা মারলেন দরজার ওপর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন জবাব পাবার জন্য। কিন্তু কোন আওয়াজ পেলেন না, কিম্বা কেউ এগিয়ে এসে খুলে দিলনা কপাটটা।

আবার ধাক্কা দিলেন দরজায় ; তবে এবার একটু জোরে।

'কে ?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এল বেশ গম্ভীর স্বরে।

'দরজাটা খুলুন।'

বিনয়ের সুরে বললেন বিনয়বাবু।

'কাকে চাই?'

জানতে চাইলেন ভিতরের কণ্ঠস্বর।

কি জবাব দেবেন? মনে মনে উত্তর খুঁজতে লাগলেন বিনয় সেন। সত্যিতো, কাকে চান তিনি?

শেষে জবাব দিলেন, 'আপনাকে চাইছি।'

খট করে খুলে গেল কপাট দুটো। সামনে দণ্ডায়মান এক ছ'ফুট লম্বা উন্নতশির সর্দারজী।

'নমস্কার।'

বিনয়বাবু অভিনন্দন জানালেন সর্দারজীকে।

'নমস্তে।

প্রতি-নমস্কার জানালেন সর্দারজী।

'ব্লক ফরোয়ার্ড '

কোড ওয়ার্ড উচ্চারণ করলেন বিনয়। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজী জাপটে ধরলেন তাঁকে।

এমন আকস্মিক আপ্যায়নে বেশ ঘাবড়ে গেলেন বিনয় সেনগুপ্ত। তারপর যখন বুঝলেন যে এটা ধস্তাধস্তি নয়, আনন্দ-আলিঙ্গন, তখন নিজেও একচোট হাসলেন ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলল আলোচনা। বিভিন্ন সুবিধে অসুবিধে-গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করলেন সকলেই। শেষে ঠিক হল, চার পাঁচ দিন পরে কলকাতা থেকে একজন লোক পাঠান হবে লাহোরে। তাঁকেই জানিয়ে দেওয়া হবে চূড়ান্ত সময় নির্দেশিকা।

যথাসময়ে একজন বিশ্বস্ত লোক গেল লাহোরে। পরনে তার সুট-বুট-হ্যাট-টাই। মুখে চোস্ত ইংরেজী বুলি ।

ষ্টেশন থেকে নেমে টাঙ্গাওয়ালাকে দিলেন একটা ঠিকানা। বললেন, 'এই হোটেলে নিয়ে চল।'

ঠিকানাটা দেখে টাঙ্গাওয়ালার চক্ষু ছানাবড়া। বারবার দেখতে লাগল সাহেবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

'অমন করে কি দেখছ?'

ঝাঁঝাল সুরে টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন ভদ্রলোক।

'সাহেব,' টাঙ্গাওয়ালা বলল, 'ও হোটেলে আপনার মত লোকেরা থাকে না। ওটাতো দেশোয়ালী হোটেল।'

'ও, তাই নাকি?' একটু চিন্তায় পড়লেন ভদ্রলোক, 'তাওতো বটে!' ডান হাতের তর্জনিটা কয়েকবার ঠুকলেন কপালে; যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু ভাই, ওখানে যে আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক থাকেন; তার সাথে দেখা না করে তো অন্য কোথাও উঠতে পাবছি না। তাতে হয়তো উনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।'

'ঠিক হায় সাব, চলিয়ে, হাম আপকো ওহি হোটেলমে পহুঁছা দুঙ্গা।

আর কোন আপত্তি করল না টাঙ্গাওয়ালা। সাহেবকে নিয়ে রওয়ানা দিল দেশোয়ালী হোটেলের পথে।

মুস্কিল হল খাওয়ার টেবিলে।

হোটেলটা সম্পূর্ণই মুসলমানী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। এর খদ্দেররাও সবাই মুসলমান। তাই খাদ্যতালিকাও যে মুসলমানী রুচি অনুযায়ী হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি?

টেবিলে বসতেই বেয়ারা সাজিয়ে নিয়ে এল থালা। একেবারে সাধারণ মুসলমানী খানা। তন্দুরী, গাই-গোস্ত, সালাদ আর ফিরনি।

সমস্যায় পড়লেন ভদ্রলোক। এখন কি করবেন?

মনের মাঝে শুরু হল দ্বন্দ্ব—কোনটা আগে? ধর্ম না দেশ? দেশ না ধর্ম? কোনটা?

বেশ কয়েকবার কথাটা ভাবলেন ; বেশ কয়েকবার।

অবশেষে জবাব পেলেন,—পরিষ্কার জবাব। সোজাসুজি অন্তরের নির্দেশ—দেশই আগে।

আর কোন দ্বিধা নয় ; কোন প্রশ্ন নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য গো-মাংস কেন, ইঁদুরের মাংস খেতে হলেও তিনি রাজী। এ তাঁর অন্তরের নির্দেশ।

দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল থালা, ফিরনির বাটিটাকে চেটে-পুটে, ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে উঠে পড়লেন টেবিল ছেড়ে।

এভাবেই কাটল তিন দিন। এরমধ্যে কীর্তি পার্টির কয়েকজন কর্মী এসে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। বুঝিয়ে বললেন সব পরিকল্পনা। কে, কোথায় সুভাষচন্দ্রকে গ্রহণ করবেন, কার কি ডিউটি সবকিছু জানিয়ে দেওয়া হল তাঁকে।

খবর নিয়ে ভদ্রলোক তৃতীয় দিনেই রওয়ানা দিলেন লাহোর ছেড়ে। কলকাতায় এসে পৌঁছলেন দু'দিন পর।

কলকাতায় পৌঁছেই তিনি দেখা করলেন বিনয় সেনগুপ্তের সঙ্গে। একটা চিঠিও দিলেন তাঁর হাতে। বুঝিয়ে বললেন সব কিছু।

যথাসময়ে খবর পৌঁছল সত্য বক্সির কাছে, আর দেরী করলে চলবে না। সব রকম প্রস্তুতি শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা রওয়ানা দেবার।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যদিকে। এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর টাকার। টাকা না হলে কীর্তি কিষাণ পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগা-যোগ রেখে এই পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। হয়তো দেখা যাবে, মাঝ পথেই অর্থাভাবে যোগযোগ সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

সত্যবাবু ডেকে পাঠালেন বিনয় সেনগুপ্ত, যতীন গুহ এবং কামাখ্যা রায়কে। বললেন, 'যে করেই হোক প্রচুর টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। একদিন অন্তর একদিন কমপক্ষে পাঁচ শ' টাকা করে লাগবে।'

এত টাকা কোথায় পাওয়া যায়? মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন বি. ভি-র নেতৃবৃন্দ।

বিনয় সেনগুপ্ত গেলেন উজ্জ্বলা মজুমদারের কাছে। বললেন, 'একটা মারাত্মক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। এটাকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ আমরা বহু চেষ্টা করেও সে অর্থ যোগাড় করতে পারছি না। সেইজন্যই তোমার কাছে এলাম।'

আবার মারাত্মক পরিকল্পনা! কথাটা শুনে আনন্দে নেচে উঠল চিরবিদ্রোহিনী উজ্জ্বলা মজুমদারের বুকটা। বললেন, 'বলুন, আমি এ ব্যাপারে আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'তুমি মেয়েদের কাছ থেকে কিছু গহনা যোগাড় করে দাও।'

'শুধু এইটুকু!' প্রস্তাবটায় যেন তেমন খুশী হলেন না উজ্জ্বলা দেবী। বললেন, 'আমাকে কি আর কোন কাজে লাগবে না আপনাদের?'

'প্রয়োজন হলে নিশ্চয় বলব।'

সান্ত্বনা জানালেন বিনয়বাবু।

দু'দিনের মধ্যেই কিছু গহনা যোগাড় হল। একাজে সাহায্য করার জন্য উজ্জ্বলা মজুমদারের সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় এগিয়ে এলেন আরো দু'জন বিদ্রোহিনী নারী। তাঁরা হলেন, সুবালা সেন ও উষা সেন।

তখন বি. ভি-র একনিষ্ঠ কর্মী কমেট দাসগুপ্ত কাজ করতেন নাথ ব্যাঙ্কে। তাঁর মাধ্যমে সেই গহনাপত্রগুলো ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়ে তুলে আনা হল কিছু টাকা। কিন্তু তবুও অর্থের অভাব রয়েই গেল। কারণ যতটা প্রয়োজন তার সিকি ভাগও এতে পাওয়া গেল না।

টাকা চাই ; আরো টাকা। দিনরাত এই এক চিন্তাই বিনয়বাবুর সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন করে রইল। টাকা না হলে যে সুভাষচন্দ্রের যাত্রা আটকে যাবে। সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। এত দিনকার সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল—কাকার কাছে গেলে হয় না ?

বিনয়বাবুর কাকা থাকেন জামসেদপুরে।

ভদ্রলোক মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার। কাজ করেন টাটা কোম্পানীতে। তাঁর এক বন্ধু আছেন—নাম শৈলেশচরণ দাশগুপ্ত। পরিচিত জনেরা তাঁকে ডাকেন পঞ্চাবাবু বলে।

পঞ্চাবাবুও মস্ত বড় অফিসার। তিনিও কাজ করেন টাটাতে। ভদ্রলোক প্রচণ্ড সুভাষ ভক্ত। সুভাষ বোসের জন্য সব কিছু করতে তিনি এক কথায় রাজী। সুভাষচন্দ্রের একটু সেবা করতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

পঞ্চাবাবু শুধু বিনয়বাবুর কাকার-ই বন্ধু নন ; বিনয়বাবুর মামার সঙ্গেও তাঁর প্রচণ্ড হৃদ্যতা। সুতরাং আর কালবিলম্ব নয়। বিনয় সেনগুপ্ত সেদিনই চলে গেলেন জামসেদপুরে। উঠলেন গিয়ে মামার বাড়ীতে। সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। অনুরোধ করলেন, পঞ্চাবাবুকে ধরে এই অর্থ সমস্যার সমাধান করে দিতে হবেই।

বিনয়বাবুর মামা গিয়ে দেখা করলেন পঞ্চাবাবুর সঙ্গে। একথা সে কথার পর বললেন আসল কথাটা—টাকা চাই ; সুভাষচন্দ্রের বাইরে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন।

কথাটা শুনেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন পঞ্চাবাবু। বললেন, 'আমি রাজী। সুভাষবাবুর জন্য আমি সবকিছু করতে রাজী।'

বিনয়বাবুর মামা উত্তেজনায় পঞ্চাবাবুর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'এদেশে এখনো আপনার মত লোক আছে বলেই কিছুটা আশার আলো রয়েছে ; না থাকলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যেত।'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না,' পঞ্চাবাবু বললেন, 'এই সামান্য কাজটুকু যদি না করি তা হলে নিজেকে মানুষ বলে ভাবব কি করে ?'

কথাবার্তা এক রকম পাকা হয়ে গেল। পঞ্চাবাবু টাকা দেবেন—যতটা তাঁর সাধ্যে কুলোয় তিনি তা করবেন। তবু একটা অনুরোধ, বিনয়ের সঙ্গে একবার তিনি দেখা করতে চান। এমন ছেলেকে চোখে দেখলেও যে শান্তি।

পরদিন বিনয় সেনগুপ্ত দেখা করলেন পঞ্চাবাবুর সঙ্গে। বুঝিয়ে বললেন সব পরিকল্পনা। আপাততঃ একদিন পর একদিন পাঁচ শ' টাকা করে লাগবে। যতদিন না নিষেধ করা হচ্ছে এতদিন এ টাকা দিয়ে যেতে হবে তাঁকে।

পঞ্চাবাবু রাজী হলেন বিনয়ের প্রস্তাবে। বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি আপনাকে পাঁচ শ' টাকা দিচ্ছি। এরপর আপনাকে আর আসতে হবে না। আমাকে ঠিকানা দিয়ে যান। আমার লোক সেই ঠিকানায় একদিন পর একদিন পাঁচ শ' টাকা দিয়ে আসবে।'

যে কথা সেই কাজ। যতদিন পর্যন্ত না নিষেধ করা হল তত-দিন পঞ্চাবাবু পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে যেতে লাগলেন, একদিন পর একদিন। এ রুটিনে কোন রকম ভুল ত্রুটি হল না ; টাকা নেই বলে টাকা পাঠান গেল না—একথা কখনো শুনতে হল না বি, ভি-র নেতাদের। সত্যি, এ টাকা না পেলে হয়তো শেষ পর্যন্ত মধ্য পথেই পরিত্যাগ করতে হত সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পরিকল্পনা।

বিনয়বাবুর মামা ঠিকই বলেছিলেন, এদেশে এখনো পঞ্চাবাবুর

মত লোক আছে বলেই আজো কিছুই আশার আলো রয়েছে, না থাকলে চারদিক অন্ধকার হয়ে যেত।

এদিকে সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে চলেছেন নিজেকে। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা একেবারে কমিয়ে দিলেন। শেষে একদিন বললেন, এর পর আর কারো সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন না। এখন থেকে নিজেতেই নিজে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন।

বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা। নিয়ম হল, বাইরের লোক তো নয়ই; এমন কি বাড়ীর লোকজনও আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। অবশ্য মা প্রভাবতী দেবীর জন্য তাঁর ছেলের ঘরের দ্বার সব সময়-ই থাকবে উন্মুক্ত।

ঘরের একপাশে পাতা হল একখানা বাঘের চামড়া। তার সামনে রাখা হল গীতা, চণ্ডী আর জপের মালা। দিনরাত ধুনুচি জ্বালিয়ে তাতে দেওয়া হতে লাগল সুগন্ধি ধুপ। তারই মধ্যে বসে সুভাষচন্দ্র সারাদিন জপ করে চলেন; করেন আরতি।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার মনে জাগে এক প্রশ্ন; তা হলে কি সুভাষের মনে আবার জেগেছে বৈরাগ্যের নেশা? আবার কি সে বিবাগী হবে?

নতুন নতুন উপসর্গ শুরু হয়। হুকুম আসে, এবার থেকে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় রেখে দিতে হবে খাবার; পর্দার বাইরে। খাওয়া শেষ হলে আবার সেখান থেকেই সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে শূন্য থালা। কেউ পর্দা উঠিয়ে দেখতে পারবে না, ভিতরে কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা হলে তার আর নিস্তার নেই।

যেমন হুকুম, তেমনই কাজ। ঠাকুর পর্দার বাইরে খাবার রেখে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে খাবার চলে যায় ঘরের ভিতরে।

তারপর যথাসময়ে শূন্য থালা চলে আসে পর্দার বাইরে। সেখান থেকে ভৃত্য সরিয়ে নিয়ে যায় এঁটো বাসন।

প্রতিদিন একটু বেশি রাত করে আসেন মেজদাদা শরৎচন্দ্র। মাঝে মাঝে মেজ বৌদিদি বিভাবতী দেবীও আসেন সঙ্গে। কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে যান নিজেদের বাড়ীতে—উডবার্ণ ষ্ট্রীটে।

এ সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা দেখে সেপাই শান্ত্রীর দল প্রথম প্রথম বেশ কড়া নজর রাখা শুরু করল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তাদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিল। সবাই মনে মনে ভাবল, লোকটা তো প্রায় রাজনীতি ছেড়েই দিয়েছে; হয়তো দু'চারদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন—এখন আর ওর ওপর এত নজর রাখার প্রয়োজনটাই বা কি!

অবশেষে আসে সেই বহু প্রতিক্ষিত রাত্রি। উনিশ শ' এক-চল্লিশের সতেরই জানুয়ারীর গভীর রাত।

আগে থাকতেই আকবর শা-কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। ক'দিন রেখেছিলেন নিজের কাছে—নিজের বাড়ীতে।

দর্জিকে খবর দেওয়া হল বাড়ীতে আসার জন্য। আকবর শা-র কাছে তেমন জামা কাপড় নেই; জামা কাপড়ের অভাবে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে। সুতরাং কয়েকটা পাজামা, আচকান, মেরজাই ও টুপি বানাতে হবে। তাছাড়া এক জোড়া নাগরাই কেনাটাও খুব জরুরী।

দু'দিনের মধ্যেই তৈরী হল সব। বাক্সবন্দী হয়ে চলে এল এলগিন রোডের বাড়ীতে। বোসবাড়ীর মেহমানের জামা কাপড়—এ কি আর দেরি করে দিলে চলে!

জামা-কাপড়-টুপি-নাগরাই এসে গেলে আকবর শা বেশ ফিটফাট হয়ে বের হলেন বাড়ী ছেড়ে। সবাই জানল, তাঁর জন্য

এ বাড়ীতে দর্জি এসেছিল ; তাঁর জন্যই ছুটে এসেছিল জুতোর কারবারী।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছিল অন্য। জামা কাপড় এবং জুতা ও টুপি সবকিছুই আনান হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের জন্য। আকবর শা ছিলেন কেবলমাত্র উপলক্ষ্য। বাইরে থেকে যাতে আসল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে না পারে তার জন্যই এই অভিনব ব্যবস্থা।

শুধু তাই নয়, যদিও সুভাষচন্দ্রের ঘরে অন্য কারো যাওয়া ছিল একেবারে নিষিদ্ধ, তবু শরৎচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ডঃ শিশির বসু মাঝে মাঝে যেতেন তাঁর ঘরে। অবশ্য সুভাষচন্দ্রই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন।

ব্যাপারটা যাতে কারো চোখে বিষদৃশ হয়ে দেখা না দেয় সেইজন্য সুভাষচন্দ্র নিজেই অপরকে শুনিয়ে বলতেন, 'শিশিরটা রেডিওর সংবাদ ধরতে খুব ওস্তাদ।'

ভাবটা এই, যেন শিশিরকে একমাত্র রেডিওর খবর ধরে দেবার জন্যই ভিতরে ডেকে পাঠান হতো।

কিন্তু আসল ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেটা জানতেন মেজদাদা শরৎচন্দ্র। তাঁর সহযোগিতা এবং বুদ্ধি না পেলে সুভাষচন্দ্র কোন দিনই এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে পারতেন না ; করা সম্ভব ছিল না।

অন্ধকার রাত্রির সর্পিল ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে, ঠিক একটার সময় বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সিঁড়িটার ধার ঘেঁষে দাঁড়ায় এসে একটা পুরান অষ্টিন গাড়ী। গাড়ীটার নেমপ্লেটে নাম্বার লেখা বি, এল, এ সাত-এক-ছয়-নয়। গাড়ীর মধ্যে নিঃশব্দে বসে প্রহর গোনেন এক দুঃসাহসী ড্রাইভার—ডঃ শিশিরকুমার বসু।

সুভাষচন্দ্র বেরিয়ে আসেন ঘর ছেড়ে। দুয়ার পেরোতেই তাঁর

মনে জাগে মায়ের কথা। ভাবেন, যাবার আগে শেষ বারের মত দেখে নেবেন মাকে; পায়ের ওপর মাথাটা ছুঁইয়ে নেবেন একবার। ওতেই হবে—ওতেই তিনি মনে মনে অনেক শক্তি পাবেন।

কিন্তু না। পায়ে মাথা ছোঁয়াতে গেলে মার যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়? যদি তিনি জেগে ওঠেন? যদি তিনি তাঁর ছুটো বাহু দিয়ে তাঁর আদরের সুবিকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তোকে আমি যেতে দেব না। তখন? তখন কি হবে? কিভাবে মার বাহুবন্ধন ছিন্ন করে তিনি যাবেন? কিভাবে সাড়া দেবেন সুদূরের আহ্বানে?

না, আর যাওয়া হল না। দূর থেকেই মনে মনে প্রণাম করলেন মাকে। মনে মনেই বললেন, মা জননী, ক্ষমা কোরো অধম সন্তানকে। আমি তোমাব থেকে আজ দূরে চলে যাচ্ছি—অনেক দূরে। জানিনা, আব কোনদিন ফিবে আসতে পারব কিনা তোমার কোলে; আর কোনদিন তোমায় দেখতে পাব কিনা ছু'চোখ ভরে। তবে এটা জেন, চিরকাল আমাব মন লুটিয়ে থাকবে তোমার ঐ পায়ের ওপর মাথা নত করে। প্রতি মুহূর্তে তোমার চিন্তাই আমার হৃদয়ে বিরাজ কববে শক্তি হয়ে।

সুভাষচন্দ্রের ছু'চোখ ভরে আসে জলে। তবু নিজেকে কোন রকমে সম্বরণ করে ধীর পদক্ষেপে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। এসে উঠলেন অপেক্ষমান গাড়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল গাড়ী। দারোয়ান গেট খুলে দিল। সে জানল না, এই শতাব্দীর সব থেকে ছুঃসাহসিক কাণ্ডটা ঘটে গেল তার চোখের সামনে; মৌলবী জিয়াউদ্দিনের বেশে এই মাত্র ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন সুভাষচন্দ্র; দেশবরেণ্য বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু।

গাড়ী ছুটে চলেছে হু হু করে—সোজা, একেবারে সোজা। হাওড়ার পোল পেরিয়ে, রেল ষ্টেশনকে পিছে ফেলে বেলুড়, বালী,

উত্তরপাড়া, কোন্নগর, চন্দননগর ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে বি, এল, এ সাত হাজার এক শ' উনসত্তর। তাকে যেতে হবে অনেক দূর— অনেকটা পথ।

গাড়ীর গতি বেড়ে চলে—দ্রুত, আরো দ্রুত। পিছে পড়ে থাকে ব্যাণ্ডেল, বর্ধমান, আসানসোল ; এগিয়ে আসে বরাকর ব্রীজ— বরাকর নদী।

মুহূর্তের মধ্যে পিছে সরে যায় বরাকর ; দূরে দেখা দেয় এক নতুন জনবসতি—এক নতুন শহর।

হ্যা, ওখানেই যেতে হবে। আজকের মত ওখানেই যাত্রা বিরতি। ওখানেই কাটাতে হবে সারাটা দিন।

দেখতে দেখতে শহরটা এগিয়ে আসে। মনে হয় এক সময় হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপর এসে পড়বে বাড়ীঘরগুলো।

না, অতদূর আর এগোতে হল না : গোবিন্দপুর ছাড়িয়ে কিছুটা এসেই বাঁদিকে ঘুরে গেল গাড়ীটা। তারপর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়ে থেমে গেল পথের মাঝে।

জায়গাটার নাম বারারি। এখানেই থাকেন শরৎ বসুর বড় ছেলে ডঃ অশোক বসু। ঐ তো সামনেই তাঁর বাংলো দেখা দেখা যাচ্ছে।

গাড়ী থেকে নেমে পড়েন জিয়াউদ্দিন। তিনি আর এখন সুভাষচন্দ্র নন—ইনসিওরেন্সের এজেন্ট মৌলবী জিয়াউদ্দিন খাঁ।

শিশির বসু গাড়ী নিয়ে এগিয়ে যান। কি জানি, বাড়ীর সামনে গাড়ী থেকে দু'জনে একসঙ্গে নামলে কেউ হয়তো সন্দেহ করতে পারে। তার থেকে এই ভাল—জিয়াউদ্দিন এদিকে ওদিকে দু'একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে খুঁজে নিক ডাঃ অশোক বসুর বাড়ীটা। তাতে কারো মনে কোন রকম সন্দেহ দেখা দেবার প্রশ্নই উঠবে না।

সকাল তখন ছ'টা বেজে পনের। একটু আগেই কলকাতা

থেকে গাড়ীতে করে এসে পৌঁছেছে সেজভাই শিশির। সঙ্গে ওর লটবহর কিছুই নেই ; এমনিই এসেছে দাদার কাছে দু'টো দিন ছুটি কাটিয়ে যাবে বলে।

ডাঃ অশোক বসু তখন সবেমাত্র স্বস্ত্রীক ব্রেকফাষ্টের টেবিলে বসেছেন। এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন মৌলবী জিয়াউদ্দিন। ইংরেজী কায়দায় শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন দুজনে দুজনের সঙ্গে। বাড়ীর লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে ডাঃ বসু বললেন, 'জিয়াউদ্দিন সাহেব ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বেশ একজন প্রভাবশালী এজেন্ট। আজকের দিনটা আমাদের বাড়ীতেই তিনি থাকবেন।'

অজানা অচেনা লোক, তার উপর বিধর্মী; সুতরাং থাকবার জায়গা হল বাইরের ঘরে। সেখানেই তাঁর প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হল।

মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে দু'একবার কুশল খবর নিয়ে গেলেন ডাঃ বসু। গিন্নিকে বললেন, 'দেখো, ভদ্রলোকের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়।'

মৌলবী সাহেব বললেন, সেই রাত্রেই তাঁকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং সন্ধ্যার সময়-ই বেরিয়ে পড়া দরকার বাড়ী থেকে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই মৌলবী সাহেব বেরিয়ে পড়লেন ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে। যে করেই হোক আজকের ট্রেন তাঁকে ধরতেই হবে। অতএব একটু আগে বের হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মৌলবী সাহেব চলে যাবার পর অশোক ছোট ভাইকে বললেন, 'চল, তোর গাড়ীটাতে করে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসা যাক। কাজের চাপে আর অনেক দিন বেড়ান হয়ে ওঠেনি।

দাদার কথায় শিশির এক পায়ে খাড়া। বলেন, 'ঠিক আছে চলো ; সঙ্গে বৌদিও যাবেন।'

চাকর-বাকরকে বাড়ী দেখতে বলে তিনজনে বেড়িয়ে পড়লেন গাড়ী নিয়ে। সবাই জানল, বাবু ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেছেন সুতরাং ফিরে আসতে তো একটু দেরী হবেই।

খুব মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে গাড়ি। অন্ধকার রাত্রি—দুর্গম পথ। এ পথে জোরে গাড়ী চালান উচিৎ হবে না। তাই এই ধীর গতি ; এমন সতর্ক যাত্রা।

পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন মৌলবীসাহেব। অপেক্ষা করছেন তিনি অশোকের জন্য ; শিশিরের জন্য।

গাড়ী এসে থামে বিরাট অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায়। ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন মৌলবী জিয়াউদ্দিন। দরজা খুলে ধরেন ডা অশোক বসু। গাড়ীতে চড়ে বসেন সুভাষচন্দ্র।

চমকে ওঠেন অশোকের স্ত্রী। স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি ব্যাপার ?'

'চুপ !' মুখে আঙ্গুল দিয়ে খুব নিচু গলায় অশোক স্ত্রীকে বলেন, 'রাঙা কাকাবাবু।'

রাঙাকাকাবাবু ! বিস্ময়ে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে-শিহরণে সারাটা দেহ কেঁপে ওঠে শ্রীমতী বসুর। এ যে স্বপ্ন। এ যে নাটকের থেকেও নাট-কীয় ঘটনা ! মনে মনে রাগ করেন তিনি, এতক্ষণ কেন ওঁকে সে কথা বলা হয়নি ? এখন যাবার সময় এ কথা বলে লাভ কি ? রাঙাকাকা-বাবু তাঁর বাড়ীতে এলেন, অথচ তিনি একটু মন দিয়ে তাঁর চরণ-সেবা করতে পারলেন না ! নিজের হাতে দু' একটা ভাল মন্দ রেঁধে খাওয়াতে পারলেন না। এর থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে ? এর থেকে আফশোষের আর কি আছে দুনিয়ায় ?

তবু সব কিছু সহ্য করতে হয় মুখ বুঝে—সব বেদনা, সব আঘাত।

রাঙাকাকাবাবু চলে যাচ্ছেন—কোথায়, কে জানে আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা, তাও কেউ বলতে পারে না। এই মুহূর্তে তাঁকে অশ্রু দিয়ে পুজো করা ছাড়া আর কিইবা করার আছে তার?

এক সময় গাড়ী এসে পেঁছিয় গোমো ষ্টেশনের কাছে।

ষ্টেশন থেকে কিছুটা দূরে একটা গাছের আড়ালে গাড়ীটাকে দাঁড় করান হল। গাড়ীর মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন চারজন যাত্রী। সবার চোখে মুখে উদ্বেগ; আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা।

একটু পরেই গাড়ী আসবে। সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা কবলে চলবে না। এবার এগোতে হবে। সাড়া দিতে হবে অনিশ্চিতের ডাকে।

একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অন্ধকারে কারো চোখের জলই স্পষ্ট করে দেখা যায় না। তবু নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে উপলব্ধি করা যায় আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা।

পকেট থেকে একটা গান্ধী টুপি বের করেন সুভাষচন্দ্র। সেটা শিশিরের হাতে দিয়ে বলেন, 'ফেরবার পথে এই টুপিটা পরে নিও; পথে খুব ঠাণ্ডা লাগবে।'

শিশিরের চোখের জল আর বাঁধ মানতে চায় না। মনে হয়, এখনি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলবেন তিনি। কি আশ্চর্য এক মানুষ! নিজে যাচ্ছেন যে দেশে সে দেশে ঠাণ্ডায় মানুষের শরীরের হাড় কেঁপে ওঠে, অথচ নিজের কথা চিন্তা না করে তিনি কিনা চিন্তা করছেন আর একজনের কথা!

এখানেই সুভাষচন্দ্রের স্বভাবের বিশেষত্ব। এই উদারতা, এই মহত্ব যদি না থাকত তাঁর চরিত্রে, তাহলে সমগ্র দেশবাসী এমনভাবে পাগল হয়ে উঠত না তাঁর জন্য; মেনে নিত না তাঁকে নেতা হিসেবে। এই গুণ আছে বলেই না তিনি আজ সমগ্র ভারতবাসীর চোখের মনি; তাদের প্রিয় সুভাষবাবু।

আর দেরী করা যায় না ; সময় হয়ে এসেছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ট্রেণের আলো। ট্রেণ এসে পড়ল বলে। এবার যেতেই হবে।

ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে বললেন, 'আমি চলি, তোমরা ফিরে যাও।' তারপর অশোকের স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'বৌমা, আমি যাচ্ছি, জানিনা তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা। তবে শরীরের দিকে নজর রেখ। সময়মত খাওযা-দাওয়া করবে। আর দেখ, হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা লেগে না যায়। সব সময় গবম জামা কাপড় পরে থাকবে। এবার যেমন শীত পড়েছে তাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাওয়াটা মোটেই আশ্চর্যেব ব্যাপাব নয।'

কি কথা। কি নির্মম বাক্যবান। শ্রীমতী বসুব মনে হল, যেন তার পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে এই মুহূর্তে। এত ভার তিনি সইতে পারবেন না ; এত স্নেহের আঘাত তার হৃদয় গ্রহণ করতে পারবে না।

কথাগুলো শেষ করে ধীর পায়ে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। দূরে গাছতলায়, একটা নিস্তব্ধ মোটরের মধ্যে রুদ্ধ-শ্বাসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনটি ছায়ামূর্তি। ওদের হার্টের ওঠানামা দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। তখন এক একটা মিনিট মনে হচ্ছে যেন এক একটা ঘণ্টা।

এমনি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে কেটে গেল আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে দিল্লী-কালকা মেল ছেড়ে গেছে। দেখতে দেখতে দূবে, বহুদূরে, গার্ডের গাড়ীর রেড লাইটটাও এক সময় মিলিয়ে গেল। তখন সবাই নিশ্চিত হলেন, রাঙাকাকাবাবু ট্রেন ধরতে পেরেছেন। ষ্টেশনে তাঁকে কোনরকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।

তিনজনেই যখন স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সব কিছুই পূর্বপরিকল্পনা মত ঠিক ঠিক ঘটেছে তখন মোটরে ষ্টার্ট দিলেন শিশির ; ফিরে এলেন বারারির বাংলোতে।

ট্রেন ছুটে চলেছে, দিল্লী-কালকা মেল। নিস্তব্ধ রাত্রির প্রগাঢ় শান্তিকে ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে চলেছে যন্ত্রদানব। তার হৃদয় নেই, নেই কোন অনুভূতি; সে শুধুই লোহা; একটা নিস্প্রান লোহার কাঠামো মাত্র।

যদি যন্ত্রদানবের হৃদয় থাকত, যদি অনুভূতি থাকত, থাকত স্পর্শকাতরতা, তা হলে প্রতিমুহূর্তে তার হৃদয় স্পন্দিত হতো শিহরনে, সমগ্র কাঠামোটা কেঁপে কেঁপে উঠত উল্লাসে।

সুভাষ চলেছেন; ভারতবাসীর হৃদয়মাতান নায়ক সুভাষ। সারাটা দেশ এখন নিদ্রায় অচেতন—স্বপ্নে বিভোর। কেউ জানে না কি ভয়ঙ্কর বার্তা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আগামীদিনগুলোতে সূর্য্যের মুখ দেখার অপেক্ষায়।

কেউ জানেনা বললে ভুল হবে, কেউ না কেউ তো জানেই। অশোক, শিশির, শরৎচন্দ্র, সত্যরঞ্জন, বিনয়, আকবর শা, ভগৎরাম, আবাদ খাঁ—এঁদের বিনিদ্র চোখে তো ঘুম নেই। এঁরা তো সুভাষের মতই রাত জেগে বসে আছে উৎকণ্ঠায়, দুশ্চিন্তায়!

দুশ্চিন্তা! কথাটা মনে হতেই সুভাষের হাসি পেল। কিসের দুশ্চিন্তা? কার জন্য দুশ্চিন্তা? সে তো মরতে যাচ্ছে না—মারতে যাচ্ছে। আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাইছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে। তারপরই তো হবে তমসার অবসান, প্রতিক্ষার সমাপ্তি। দু'শ বছর ধরে হিমালয়ের গিরিকন্দরে লুক্কায়িত ক্লান্ত সূর্য্যটা তখন হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে নির্বাসন থেকে, ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলবে-শিকলগুলোকে; শুরু করবে তার নতুন পথপরিক্রমা—নবীনের যাত্রা।

গাড়ীটা একটা ষ্টেশনে থামতে একজন নতুন যাত্রী উঠলেন কামরায়। একজন শিখ ভদ্রলোক।

বুকটা ধুক করে উঠল সুভাষের—গোয়েন্দা নয়তো?

ভদ্রলোক বিছানা সুটকেসটা ঢুকিয়ে দিলেন চেয়ারের তলায়। নিচু হয়ে বসতে গিয়ে সুভাষের পায়ে গা লেগে গেল। বললেন, 'সরি।'

'থ্যাঙ্কস।'

ধন্যবাদ জানালেন সুভাষচন্দ্র।

বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে, কোটের বোতামগুলোকে খুলে বেশ আরাম করে বসলেন সুভাষের একেবারে মুখোমুখী। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'হোয়ার ইজ ইওর ডেষ্টিনেশন?'

'রাওয়ালপিণ্ডি।'

জবাব দিলেন সুভাষচন্দ্র।

'আপ উধারকা হি রহনেবালে হ্যায়?'

এবার উর্দুতে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'জী নেহী,' বিশুদ্ধ উর্দুতে বললেন সুভাষ, 'আসলিয়তমে মুলুক হ্যায় মেরা লখনউ; কাম করতা হু ইনসিওরেন্স অর্গানাইজারকা: ইসলিয়ে হরবকত্ ইধার উধার সফর কর না পড়তা হ্যায় মুঝকো।'

'আপকা তসরিফ?'

নাম জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'লোগ মুঝে জিয়াউদ্দিন কহতে হে। মৌলবী জিয়াউদ্দিন'

উত্তর দিলেন সুভাষ।

এভাবেই চলল আলাপ; বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর দুজনেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

পেশোয়ার সিটি ষ্টেশনে ঘণ্টা বেজে উঠল। ফ্রন্টিয়ার মেল আসছে। শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। কুলির ডাক, মানুষজনের চিৎকারে কানে তালা পড়ার উপক্রম।

এই ভীড়ের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে ষ্টেশনের এক কোনায় লাঠি হাতে, চোস্ত পাঠান বেশে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না—এই প্রৌঢ় লোকটির মনে তখন কি ঝড় বয়ে চলেছে, কি আলোড়ন ঘটে যাচ্ছে।

নির্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। দৃষ্টি তাঁর স্থির—অপলক।

ঐ আসছে, প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে যন্ত্রদানবটা। মনে হচ্ছে হুড়মুড় করে এখনি এসে পড়বে ঘাড়ের উপর; দলে-পিষে-মথিত করে দিয়ে যাবে সবাইকে। ও চলে যাবার পর পড়ে থাকবে কয়েকটা হাড় আর কুঁচি কুঁচি মাংসের টুকরো।

কিন্তু না, দৈত্যটা আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। বোধ হয় ও হাঁফিয়ে উঠেছে, আর পারছে না বয়ে নিয়ে যেতে এত ভার।

সত্যি তো, এ ভার বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা! এতবড় একটা হৃদয়ের ভার সহ্য করা কি যার তার কর্ম! হোক না যন্ত্র-দানব, তবু ওর ভার বইবার ক্ষমতারও তো একটা সীমা আছে! সুভাষচন্দ্রের মত এত বড় মানুষটার ভার ও সইবে কতক্ষণ?

গাড়ী এসে থামল প্লাটফর্মে। এতক্ষণ ধরে ষ্টেশনের এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা পাঠান ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন ট্রেনের কাছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা উঠে গেলেন একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায়।

আকবর শা।

হ্যাঁ, আকবর শা-ই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন ষ্টেশনের এক কোণায়। প্রোগ্রাম তাঁর আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে। সুভাষচন্দ্র আসবেন এই গাড়ীতে। নামবেন পরের ষ্টেশনে; পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্টে। তবু সব ব্যবস্থাটাই যে ঠিক-ঠাক আছে এটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যই আকবর শা-কে গাড়ীতে উঠতে হল এ

ষ্টেশন থেকে। অন্ততঃ সুভাষচন্দ্রের মনের উৎকণ্ঠা তো এ থেকে কিছুটা কমবে।

গাড়ী এসে পেঁছিল ক্যান্টনমেণ্টে। এবার নামতে হবে। আবার এক নতুন পথে শুরু করতে হবে যাত্রা। এ পথ ভয়ঙ্করের—এ পথ মুক্তির।

ধীরে ধীরে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলেন সুভাষ। একটা কুলি এসে দাঁড়াল সামনে। কুলির মাথায় মালপত্রগুলো দিয়ে কালো শেরওয়ানিটা হাতের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন ইদানিং ভারত ইতিহাসের সব থেকে বিতর্কিত পুরুষ; সব থেকে প্রবল ব্যক্তিত্ব।

আগে আগে চলেছেন আকবর শা; পিছনে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র। বাইরের কোন লোক বুঝতে পারবে না যে, এ মানুষ দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে—এরা একে অপরকে চেনেন।

গেট পার হলে সামনেই টাঙ্গা-ষ্ট্যাণ্ড। সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েক ডজন টাঙ্গা। সবাই ডাক দিচ্ছে, 'আইয়ে সাব, মতিবাগ, রোহল সেরাই, বাজুরি গেট, কিসাখানি বাজার।'

ভীড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এল একটা টাঙ্গা। সুভাষচন্দ্রের সামনে এসে থামল। চালক জিজ্ঞাসা করল, 'কাহা যানা হায় সাহাব?'

'তাজমহেল হোটেল যায়েঙ্গে।'

উত্তর দিলেন জিয়াউদ্দিন।

'বৈঠিয়ে।'

আহ্বান জানাল টাঙ্গাওয়ালা।

'কিতনা লেওগে?'

জিজ্ঞাসা করলেন সুভাষচন্দ্র। আগে থাকতে দর-দাম করে নেওয়াটাই ভাল ; পরে ঝগড়া-ঝাটি করাটা মোটেই ঠিক নয়।

টাঙ্গাওয়ালা বলল, 'আপ আপনা বিচার সে দে দেনা সাহাব।'

সুভাষচন্দ্র উঠে বসলেন টাঙ্গায়। কুলির ভাড়া মিটিয়ে দিলে সে চলে গেল সেলাম ঠুকে। টাঙ্গা চলতে শুরু করল।

কিছু দূরে আর একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। আকবর শা এগিয়ে গেলেন সেদিকে। উঠে বসলেন টাঙ্গায়। সহিসকে বললেন, 'তাজমহেল হোটেল কা সামনাওয়ালি গলি মে চলো।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল টাঙ্গাওয়ালা। মুখে বিভিন্ন রকমের শব্দ করতে লাগল রাস্তার লোকজনকে হুশিয়ার করে দেবার জন্য। ভাবটা, এরপর যদি কেউ টাঙ্গা চাপা পড তখন কিন্তু আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না তোমরা।

টাঙ্গা থামল এসে তাজমহল হোটেলের গেটে। সুভাষচন্দ্র ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লেন টাঙ্গা থেকে। হোটেলের একজন বয় এগিয়ে এসে তুলে নিল মালপত্রগুলো। টাঙ্গাওয়ালা চলে গেল সেলাম জানিয়ে।

সুভাষচন্দ্র হোটেলের দরজায় পা রাখতে যাবেন এমন সময় তাঁর গা ঘেষে বেরিয়ে গেল একটা টাঙ্গা—খুব জোরে, বেশ দ্রুতগতিতে।

সুভাষচন্দ্র একবার তাকিয়ে দেখলেন টাঙ্গার আরোহীকে। আকবর শা। বেশ মেজাজে পা উঠিয়ে বসে রয়েছেন টাঙ্গায়। দেখে মনে হল, যেন নবাববাহাদুর চলেছেন সান্ধ্য ভ্রমণে।

ঘণ্টা দুই পরের কথা। সুভাষচন্দ্র তখন সবে স্নান সেরে জামা কাপড় পাল্টে এসে বসেছেন ঘরে ; এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত।

'কৌন হায় ?'

জিজ্ঞাসা করলেন সুভাষচন্দ্র।

'ম্যায় হু জনাব ; দরওয়াজা খুলিয়ে।'

বাইরে থেকে জবাব এল।

পুলিশের লোক নয়তো! হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এল সুভাষচন্দ্রের। পর মুহূর্তে ভাবলেন, কপালে যা আছে হবে ; এত ভাবনা করলে চলে না।

এগিয়ে এসে খুলে দিলেন কপাটটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর।

'কাকে চাই?'

গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন সুভাষচন্দ্র।

'আপনাকে জনাব।'

উত্তর দিলেন আগন্তুক।

'আমাকে! কে আপনি?'

আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলেন সুভাষ।

'আমার নাম আবদুল মজিদ খাঁ। মুসলিম লীগ নেতা আবদুল কোয়ায়ুম খাঁ আমার বড় ভাই।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন মজিদ খাঁ।

বুকটা ধুক করে উঠল সুভাষচন্দ্রের। কোয়ায়ুম খাঁর ভাই! মুসলিম লীগের লোক! অর্থাৎ সরকারের গোয়েন্দা!

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে রূঢ় স্বরে বললেন, 'তা আমার কাছে কি প্রয়োজন?'

'আমি শুধু আপনাকে জানাতে এসেছি যে সবকিছু ঠিক আছে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

'কি ঠিক আছে?' বেশ ঝাঁঝাল স্বরে বললেন সুভাষচন্দ্র, 'ঠিক আছে মানে কি? কি চিন্তা করব না?'

সুভাষচন্দ্রের মেজাজ দেখে ঘাবড়ে গেল মজিদ খাঁ। তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না, বোসবাবু কেন এমন রূক্ষ ব্যবহার করছেন তার সঙ্গে। কি তার অপরাধ?

হঠাৎ মনে হল বোসবাবু তাকে সন্দেহ করেননি তো? তবু নিজেকে যতটা পারলেন সংযত করে নিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না সুভাষবাবু। যদিও আমি কোয়ায়ুম খানেব ভাই, তবে মুসলিম লীগেব সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আপনাবই পার্টির সভ্য। আমাদের প্রেসিডেণ্ট আকবর শা-ই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে এ খবর জানাতে যে, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে; আপনি কাল সকালে তৈরী হয়ে থাকবেন। আপনাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

এতক্ষণে মন গলল সুভাষের। বললেন, 'ঠিক আছে ভাই, আমি তোমাকে বুঝতে পাবিনি, সেজন্য দুঃখিত। আকবব শা-কে বলে দিও, কাল সকালে আমি তৈরী হয়ে থাকব। সে যেন কোন রকম দুশ্চিন্তা না করে।'

সেলাম জানিয়ে চলে যায় মজিদ খাঁ। সুভাষচন্দ্র ভিতব থেকে খিল এটে দেন দরজায়।

পরদিন সকালে, যথানির্দিষ্ট সময়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে হাজির হলেন একজন যুবক। ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মী হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে যুবকটি বললেন, 'আকবর শা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। বাজুরি গেটের ভিতর আমরা একটা নূতন আস্তানা ঠিক করেছি; সেখানে আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

সুভাষচন্দ্র যুবকটির সঙ্গে বেরিয়ে এলেন হোটেল ছেড়ে। এসে উঠলেন মিঁয়া ফিরোজ শাহ-র বাড়ীতে।

বিকেল চারটের সময় সেখানে এলেন ভগৎরাম। সুভাষচন্দ্রকে দেখে অভিবাদন জানালেন, 'নমস্তে' বলে।

সুভাষচন্দ্র প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'নমস্তে।'

ভগৎরামকে দেখে সুভাষচন্দ্রের প্রথমে মোটেই ভাল লাগল না। লোকটা একে রোগা; তার উপর আবার বেঁটে। শরীরের শ্রীছাঁদ বলতে কিছু নেই। দেখলেই মনে হয়, সবসময় কিছু না কিছু একটা মতলব ভাঁজছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পার্টির কাজে কতদিন ধরে আছেন?'

'একেবারে বচপন থেকে,' ভগৎরাম বললেন, 'আমাদের পরিবারের সবাই খুব অল্প বয়সেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি শহীদ হরিকিষেণের নাম শুনেছেন নিশ্চয়। সেই যে উনিশ শ' তিরিশ সালের তেইশে ডিসেম্বর লাহোরে পাঞ্জাবের ছোটলাট স্যার জিওফ্রে ত্ব মণ্টমোরেন্সিকে গুলি করে ধরা পড়েছিলেন, এবং একত্রিশ সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর যাঁর ফাঁসির হুকুম হয় ও নয়ই জুন ফাঁসি হয়ে যায়—আমি সেই হরিকিষেণ তলওয়ারেরই ছোট ভাই।'

'তাই নাকি!'

সুভাষচন্দ্রের গলার স্বরে বিস্ময়ের সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ', ভগৎরাম বলে চলেন, 'গত বছর জুন মাসে আচ্ছর সিং চিনার আপনার সঙ্গে আপনার অন্তর্ধান সম্পর্কিত যে পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সে পরিকল্পনাটার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলাম আমি-ই, এবং সে সময় আমার পার্টির নেতারা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সেই পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়নের দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত করা হবে।'

ভগৎরাম এত কথা এক নাগাড়ে বলে গেলেন শুধু মাত্র এই কারনে যে, তিনি সুভাষচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে সুভাষবাবু তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার সম্পর্কে তিনি আগে থাকতে সবকিছু জেনে নিতে চান।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের যাত্রার পরিকল্পনায় কিছুটা অদল-বদল

ঘটে গিয়েছিল। পূর্ব-নির্ধারিত পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পরিকল্পনাকারীর দল মনে মনে বেশ ঘাবড়ে যান। সে কারণে তারা একটা নতুন পথ ঠিক করেন—এ পথে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম। তাছাড়া এ পথে গেলে কাবুল নদী অতিক্রমের ঝামেলাটাও এড়ান যাবে।

নতুন পথের দূরত্ব অনেক কম; তবে পথটা দুর্গম। সে কারণে একজন অভিজ্ঞ গাইডের সন্ধান করা হচ্ছিল, যে এই পথ খুব ভাল করে চেনে।

গাইড খুঁজে বের করতে তিন দিন লেগে গেল। এদিকে সুভাষচন্দ্র মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিলেন এই ভেবে যে, কলকাতা থেকে তাঁর অন্তর্ধানের সংবাদ একবার যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে গোয়েন্দা পুলিশের দল সারা ভারত তছনছ করে ফেলবে তাঁর খোঁজে। সীমান্ত প্রহরীরা সতর্ক হয়ে যাবে। তখন তাদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রম করাই হয়ে উঠবে মুস্কিল।

অবশেষে গাইড এসে পৌঁছল পঁচিশে জানুয়ারী বিকেলে।

পরদিন ছাব্বিশে জানুয়ারী ভোর ছ'টা নাগাদ শুরু হল যাত্রা।

একটা মোটর এসে দাঁড়াল বাজুরী গেটের সামনে; মিয়াঁ ফিরোজ শাহ-র বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে।

মোটরে গিয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র, ভগৎরাম, আবাদ খাঁ, আর গাইড।

তখনও নিশিথের তন্দ্রাজড়ানো চোখের পাতায়, চতুর্দিকের প্রচণ্ড কুয়াশার ওড়না ভেদ করে প্রভাত সূর্য্যের বিচ্ছুরিত কিরণমালার সাতরঙের প্রলেপ পড়েনি। তখনো একটি কাক-পক্ষীরও ঘুম ভাঙেনি; একটি মোরগও ডেকে ওঠেনি আর্তস্বরে

তাই বলে তো অপেক্ষা করলে চলবে না প্রভাত সূর্য্যের প্রতিক্ষায়; ঠাণ্ডায় পথে পা রাখা যাচ্ছে না বলে তো আর থেমে পড়লে হবে না। ওদিকে যে সময় হয়ে এসেছে নিরুদ্দেশ যাত্রার; মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে ঘর-ছাড়ার।

গাড়ী এগিয়ে চলে ধীরে—অতি ধীরে। পাহাড়ী পথ; তার উপর বরফে পিচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে আসে গাড়ীর উইণ্ড স্ক্রিন। দেখা যায় না দশ হাত দূরের বিরাট পাথরের ঢিবিটাকেও। যে কোন সময় তুর্ঘটনা ঘটতে পারে; যে কোন মুহূর্তে ছোট মোটরটা ছিটকে গিয়ে পডতে পারে খাদে—পাঁচ হাজার ফিট নিচে।

তবু এগোতে হয়—তবু চলতে হয় পথ। এ বড় কঠিন খেলা—বড় কঠিন দায়িত্ব; জাবন নিয়ে বড় মারাত্মক জুয়া।

এই মারাত্মক জুয়া খেলাই খেলে চলেছেন পাঁচটি লোক। পাঁচজন নিশিজাগা মানুষ। এদের কেউই জানেনা এ জুয়ার শেষ ফলাফল কি, কি এর ভবিষ্যত?

এক সময় এসে গেল খাজুরি ময়দান। পেশোয়ার থেকে এগার মাইল উত্তর পশ্চিমের সরাই-বাগ।

এখানেই পথ শেষ; প্রথম যাত্রার বিরতি। এবার এগোতে হবে হাঁটা পথে। পার হতে হবে তুর্গম গিরি-কন্দর, মরু-পর্বত, নদী-নালা। সে পথে কোন মৃত্যুদূত অপেক্ষা করছে মহাকালের খড়্গ হাতে; কোন রক্তশোষক প্রহর গুনছে শিকারের প্রতিক্ষায়—সে উত্তর কে দেবে এই মুহূর্তে? কে শোনাবে সতর্কবাণী?

আবার বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। দৃষ্টির আড়াল থেকে বিচ্ছেদের বজ্রশূল উল্লাস-চাপা অস্থিরতায় অপেক্ষা করছে পাঁচ পাঁচটা নরম হৃদপিণ্ডকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবার মহানন্দে। তবু বিদায় নিতে হয়, তবু ছেড়ে যেতে হয়।

সেলাম জানিয়ে ড্রাইভার ও আবাদ খাঁ উঠে বসলেন গাড়ীতে। গাড়ী চলতে শুরু কবল—ধীরে, অতি ধীরে। আবার সেই পথ—সেই পিচ্ছিল যাত্রা। তফাৎ শুধু এই, এখন আর গাড়ীতে যাত্রী সংখ্যা পাঁচ নয়, মাত্র দুই। আবাদ আর ড্রাইভার।

ওদিকে উল্টোপথে যাত্রা শুরু কবেছেন তিন দুঃসাহসী। সুভাষচন্দ্র, ভগৎরাম আর গাইড।

সামনে সামনে চলেছেন গাইড। হাতে তাব এক বিবাট লাঠি। লাঠিব ডগাটা ঠুকছেন মাটিতে। ঠক, ঠক আওয়াজ হয়; ওতে পথচলার উৎসাহ বাড়ে; পরিশ্রমেব ক্লান্তি অনেকটা ভুলে থাকা যায়।

গাইডের পিছু পিছু চলেছেন সুভাষচন্দ্র। ছ' ফুট লম্বা এক পাঠান। বুকে তাঁব ঝড়, মনেতে লক্ষ প্রশ্ন; তবু দেহটা একটুও বাঁকেনি, শিব ঝুকে পড়েনি এক ইঞ্চিও।

সবশেষে ভগৎবাম তলওয়াব। চোখের তারায় তার তলওয়ারের শানিত দৃষ্টি। প্রতি পলকে সে লক্ষ্য করে চলেছে কোথাও কোন বিপদ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে কিনা; কেউ আড়াল থেকে তাঁদের অনুসরণ করছে কিনা।

না, তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না; তেমন সন্দেহজনক তো কাউকে মনে হচ্ছে না। কথাটা ভাবতেই বেশ ভাল লাগল ভগৎরামের—না, আমাদের কেউ লক্ষ্য করছে না।

মাত্র দু'ঘণ্টা। মহাকালের বিরাট ঘড়িটার হিসেবে এ সময়টুকু কিছু নয়। তবু এই দু'ঘণ্টার পথ চলাতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। পা যেন তাঁর আর চলতেই চায় না। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসে সারাটা দেহ। মনে হয়, কোথাও না বসতে পারলে হয়তো দম বন্ধ হয়েই মারা যাবেন তিনি।

ভগৎরামকে জিজ্ঞাসা করেন সুভাষ, 'কতটা পথ এলাম আমরা?'

'প্রায় দু' মাইল।'

জবাব দেন ভগৎরাম।

'মাত্র দু'মাইল!' বিস্মিত হয়ে যান সুভাষচন্দ্র, 'এতক্ষণে মাত্র দু'মাইল পথ এলাম! তা হলে বর্ডার পার হব কখন?'

'বর্ডার!' আশ্চর্য হন ভগৎরাম, 'সেতো অনেকক্ষণ আগে পার হয়ে এসেছি আমরা।'

'পার হয়ে এসেছি!' বিস্ময়-আনন্দ উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্রের মুখমণ্ডল। জড়িয়ে ধরেন ভগৎরামের হাত দু'টো। বলেন, 'এতক্ষণ সে কথা আমাকে বলেননি কেন তবে?'

সত্যিই তো, ভুল হয়ে গেছে। মনে মনে লজ্জিত হন ভগৎরাম। হয়তো সুভাষবাবুকে কথাটা আগে বললে তিনি আরো বেশী খুশী হতেন—আরো বেশী আনন্দ পেতেন।

পাহাড়ের কোলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আবার হাঁটতে শুরু করলেন তিন মুসাফির। এবড়ো-খেবড়ো পথ—কোথাও ঢালু; কোথাও খাড়া—তবু এ পথ ধরেই এগোতে হয় ওদের।

ভগৎরাম আর গাইড—দু'জনেই পাহাড়ী এলাকার মানুষ। তাদের পক্ষে এ পথে চলাটা খুব একটা কষ্টকর কিছু নয়। কিন্তু মুসকিল হল সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে। তিনি সমতল এলাকার মানুষ; চিরকাল থেকেছেনও সমতলে। এমন দুর্গম পথে চলতে হয়নি তাঁকে কোনদিন; প্রয়োজন পড়েনি কখনো চলার।

এমন মানুষের পক্ষে এই কঠিন পাথরভাঙ্গা পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে চলা যে কি কষ্টকর তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবুও এত কষ্ট, এত ক্লান্তি সত্ত্বেও তাঁকে এগোতে হয়। কারণ এ কষ্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে মুক্তির সিংহদুয়ারের প্রান্তে তিনি পেঁছতে পারবেন না কখনোই। শুধু সেই আশায়, সেই চরম লক্ষ্যে পেঁছবার জন্যই এত পরিশ্রম—এত কষ্ট সহ্য করা।

রাত তখন বারটা।

যদিও আকাশ জুড়ে রয়েছে চতুর্দশীর চাঁদ ; আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে পাহাড়ের চুড়োগুলো ; তবু পথ ভরে আছে অন্ধকারে। ঝোপঝাড়ের আস্তরণ ভেদ করে চাঁদের আলো এসে পেঁছিতে পারেনি ধরিত্রীর বুকে।

সেই অন্ধকারের দুর্ভেদ্য পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক সময় পিশকান মইনা গ্রামে এসে পেঁছিলেন তিন পথিক। পথশ্রমে তিনজনের অবস্থাই তখন অর্ধমৃতপ্রায়। এখন যদি একটু আশ্রয়ের যোগাড় না করা যায় তবে মৃত্যু অবধারিত।

এই ঠাণ্ডায় আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। যখন তখন কোল্ড-ব্রাইট হতে পারে ; যখন তখন রক্ত জমে হিম হয়ে যেতে পারে।

সামনেই একটা মসজিদ দেখা যাচ্ছে না ?

এগিয়ে গেলেন ভগৎরাম। মসজিদের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। কি যেন ভাবলেন মনে মনে। তারপর মৃদু করাঘাত করলেন দরজায়—খট্ খট্ খট্।

ভিতর থেকে খুলে গেল দরজা। সারাগায়ে চটের বস্তা জড়ানো এক বৃদ্ধ মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই ?'

'আমরা আজকের রাতটা এখানে থাকতে চাই।' ভগৎরাম জবাব দিলেন, 'অনেক দূর থেকে পায়ে হেটে আসছি, এই ঠাণ্ডায় আর পথ চলতে পারছি না।'

'ভিতরে আসুন।'

ধরা গলায় আহ্বান জানালেন বৃদ্ধ।

ভগৎরাম, গাইড এবং সুভাষচন্দ্র বৃদ্ধের পিছে পিছে ঘরে ঢুকলেন।

ঘরটায় একটা দরজা ; কোন জানালা নেই। ঘরের ভিতরে জনা পঁচিশ মানুষ সারা দেহে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের এক কোনে একটা কাঠের চুল্লি জ্বলছে। চুল্লির ধোয়ায় দম নেওয়া কষ্টকর।

ভগৎরাম বললেন, 'আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের কিছু খাবারের ব্যবস্থা না করে দিলে চলবে না।'

'ঠিক আছে, আপনারা অপেক্ষা করুন,' বৃদ্ধ বললেন, 'আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

একজন অল্পবয়সী ছেলে তিনটে শতরঞ্চি এনে দিল ভগৎরামকে। ওরা সেগুলো বিছিয়ে নিল ঘরের এক কোণে। তার ওপর বসে পড়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছ'টো চায়ের পট নিয়ে হাজির হলেন বৃদ্ধ ; সঙ্গে একজন যুবক। তার হাতে গোটা আষ্টেক ভুট্টার রুটি।

শুকনো রুটি আর চা দিয়েই সমাধা করতে হল রাত্রের আহার। এখন যা পাওয়া গেছে তা-ই যথেষ্ট। এ সময় যদি কিছু না-ও পাওয়া যেত তবু কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কিছু ছিল না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মাটিতে বিছান শতরঞ্চির উপর, হাতের ঝোলাটাকে মাথার বালিশ বানিয়ে, তাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন পথশ্রমে ক্লান্ত তিন মুসাফির।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন ভগৎরাম আর গাইড। কিন্তু মুসকিল হল সুভাষচন্দ্রের। এই প্রচণ্ড দম বন্ধ করা গুমোটে তাঁর চোখের পাতা কিছুতেই আর এক হতে চায়না। বিছানায় শুয়ে তিনি বারবার ছটফট করেন এপাশ-ওপাশ।

ঘণ্টা খানেক বাদে ডেকে তুললেন ভগৎরামকে। বললেন, 'একটু বাইরে চলুন।'

ভগৎরাম ভাবলেন হয়তো কোন জরুরী কথা আছে, তাই তাঁকে, বাইরে আসতে বলছেন সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র এবং ভগৎরাম—দু'জনেই বাইরে এলেন ! সুভাষচন্দ্র বললেন, 'এই প্রচণ্ড গুমোটে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারছি না। তাই ভাবছি রাতটা বাইরেই কাটাব।'

ভগৎরাম বললেন, 'সেটা সম্ভব নয়। আপনি যদি বাইরে থাকেন, তা হলে এখানকার লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। কারণ এদিককার লোক এধরণের ঘবে থাকতেই অভ্যস্ত।'

'তা-ও বটে !' সুভাষচন্দ্র বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন ঘরের ভিতর। চেষ্টা করা যাক ঘুমোবার।'

দু'জনে ফিরে এলেন ঘরে। তারপর শুয়ে পড়লেন বস্তামুড়ি দিয়ে।

এরপরও সুভাষচন্দ্র দুবার উঠে বাইরে বের হলেন। এমন ঘরে তিনি জীবনে থাকেননি ; তারপক্ষে এ ঘরে থাকা সত্যই কষ্টকর। তবু কি করবেন, তাঁকে যে ঘরের ভিতর থাকতেই হবে। তা না হলে এখানকার লোকেরা তাঁকে সন্দেহ করবে। অতএব আবার ফিরে আসতে হল ঘরে।

পরদিন সকালে চা-পরটা নিয়ে এলেন সেই বৃদ্ধ। বললেন, 'এটা খেয়ে নিন আপনারা ; আমরা গরীব লোক, আমাদের এখানে এর থেকে ভাল খানা হয় না।'

'আমরাই বা কি এমন রাজা-বাদশা !' বললেন ভগৎরাম, 'আমাদেরও তো খেতে হয় দিনমজুরী করে।'

'কি কাজ করেন আপনারা ?'

জানতে চাইলেন বৃদ্ধ।

'সামান্য রাজমিস্ত্রির কাজ করে আমাদের দিনগুজরান করতে হয় আব্বাজান।'

জবাব দিলেন ভগৎরাম।

'তা, এখন যাচ্ছেন কোথায় ?'

জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধ।

'যাচ্ছি পাশের গাঁয়ে,' গলাটা একটু কেঁপে উঠল ভগৎরামের,

'কোহিতে। ওখানকার লতিফ মিয়া বাড়ী তৈরী করছে জানেন তো। আমাদের ডাক পড়েছে ওখানে।'

'তাই নাকি?'

কথাটা শুনে বৃদ্ধ খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল।

'হ্যাঁ,' ভগৎরাম উঠে দাঁড়ালেন, 'এবার চলি আব্বাজান, নটায় কাজে যেতে হবে। এখানেই তো নটা বেজে গেল। লতিফ মিয়া আজ আর গালাগালি করে বাখবেন না।'

'আল্লা আপনাদের মঙ্গল করুন।'

হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন বৃদ্ধ।

শুরু হ'ল আবার পথ চলা।

আজ সাতাশে জানুয়ারী।

আজই সুভাষের কোর্টে হাজির হওয়ার কথা। আজ তাঁর বিচারের দিন।

এতক্ষণে নিশ্চয় হৈ চৈ পড়ে গেছে চারদিকে! সুভাষ ভাবেন কথাটা, এতক্ষণে নিশ্চয় পুলিশ জেনে গেছে তাঁর অন্তর্ধানের সংবাদ। তাঁরা হয়তো ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার শুরু করে দিয়েছে যাকে তাকে; তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে শহর-গ্রাম-বন্দর।

সত্যি তাই।

সুভাষ ঘর ছাড়ার পরই শরৎচন্দ্র চলে যান রিষড়ায়। সেখানে একটা বাগানবাড়ী কিনেছিলেন তিনি। ঠিক করেছিলেন, গঙ্গায় স্নান এবং বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করবেন বাড়ীটা। কিন্তু এবার তাঁকে ঐ বাড়ীতে যেতে হল বিশ্রাম করার জন্য নয়, শুধু মাত্র নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য। কারণ, এতবড় একটা আঘাতকে সামলে ওঠার জন্য এছাড়া তাঁর সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

কলকাতায় ফিরে এলেন ছাব্বিশ তারিখ। বিকেল বেলা হঠাৎ

টেলিফোন এল এলগিন রোডের বাড়ী থেকে—সুভাষ নেই! সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর ঘরে।

খোঁজ খোঁজ—চারিদিকে খোঁজ পড়ে গেল সুভাষের। একটার পর একটা টেলিফোন করা হতে লাগল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, চেনা-পরিচিতের বাড়ীতে। কোথায় সুভাষ? কি হল তাঁর?

খবর পেয়ে ছুটে এল পুলিশ; ছুটে এল সরকারী আমলার দল। কি হল? কোথায় গেল সুভাষ?

তার গেল পণ্ডিচেরীতে, হৃষিকেষে, বৃন্দাবনে। জানতে চাওয়া হল, সুভাষের কোন খবর পেয়েছেন কিনা তারা? পেয়ে থাকলে এখনি জানান।

তার এল গান্ধীজীর কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, 'গভীর দুঃখের সঙ্গে সুভাষের নিরুদ্দেশের সংবাদ শুনলাম। সঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। যথাশীঘ্র বিস্তৃত জানাও।'

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, 'সমস্ত ঘটনা অনুধাবন করলে একমাত্র এইটাই মনে হয় যে সুভাষ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।'

রবীন্দ্রনাথও পাঠালেন তারবার্তা। তিনি লিখলেন, 'সুভাষের অন্তর্ধান সংবাদে ভয়ানক বিচলিত হয়েছি। মা জননীকে আমার সমবেদনা জানাবে। কোন সংবাদ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করতে ভুলবে না।'

কিন্তু কে দেবে সংবাদ? কার জানা আছে সঠিক খবর?

পাঞ্জাব থেকে বিবৃতি দিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা সর্দার শার্দুল সিং কবি শের। বললেন, 'আমার স্থির বিশ্বাস, সুভাষবাবু কোন উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। কিছুদিন আগে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি আমাকে এ ধরণেরই একটা আভাষ দিয়েছিলেন।'

কিন্তু অত সহজে ছাড়তে রাজী নয় ইংরেজ সরকার। তারা সুভাষ বসুকে ভাল করেই চেনে। এমন লোককে এই যুদ্ধের

বাজারে বাইরে ছেড়ে রাখলে বিপদ যখন তখন এসে হাজির হতে পারে দোরগোড়ায়। তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখাই হবে মুসকিল।

অতএব খবর পাঠাও চারদিকে। কলকাতা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ—প্রতিটি বিমান ঘাঁটিকে সতর্ক থাকতে বল। প্রতিটি বন্দরকে বল, প্রতিটি যাত্রীকে বারবার চেক করে তবেই যেন জাহাজে উঠতে দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতিটি সীমান্ত ঘাঁটি যেন দিবারাত্র সতর্ক থাকে। একজন মুসাফিরও যেন বিনা তল্লাসীতে অতিক্রম করতে না পারে সীমান্ত ঘাঁটি।

পুলিশ এসে জেরা করল শরৎচন্দ্রকে। কখন তিনি প্রথম খবর পেলেন সুভাষের অন্তর্ধানের, কখন ঘরের দরজা খোলা হল, কেন খোলা হল—সবকিছু বিস্তারিত জানতে চাইল তারা।

একটুও উত্তেজিত না হয়ে, বেশ গুছিয়ে, অত্যন্ত সংযত স্বরে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি। পুলিশ দল হাজাব রকম ঘোরাল প্রশ্নেও তাঁর মুখ থেকে এমন কোন উত্তর বের করতে পারল না, যা দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব যে, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা আগে থাকতে কারো জানা ছিল।

একদল পুলিশ অফিসার গেল প্রভাবতী দেবীর কাছে। প্রশ্ন করল, 'সুভাষবাবু যে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন এমন কোন আভাষ কি তিনি আপনাকে কখনো দিয়েছিলেন?'

'না।'

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রভাবতী দেবী।

'তিনি যে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, সেটা আপনি জানলেন কি করে?' জানতে চাইল এক জাদরেল অফিসার।

'আমি রোজ সংসারের কাজ-কর্ম সারা হলে একবার যেতাম ওর ঘরে—ও ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করেছে কিনা, ঠিক মত বিশ্রাম নিচ্ছে কিনা—তা দেখতে। আজও অভ্যাস মত ওর ঘরে যাই।

কিন্তু গিয়ে দেখি ও ঘরে নেই। তখন সবাইকে ডাকা ডাকি শুরু করি। বলি, আমার সুবিকে পাচ্ছি না।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই দু'চোখ জলে ভরে ওঠে প্রভাবতী দেবীর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। তারপর পুলিশ অফিসারটিকে প্রশ্ন করেন, 'বলুন, আপনারা কোথায় নিয়ে গেছেন আমার ছেলেকে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন তাঁকে?'

প্রভাবতী দেবীর প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান অফিসারের দল। একজন বলেন, 'আমরা কেন তাঁকে লুকিয়ে রাখতে যাব?'

'কেন যাবেন, সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? ভেবেছেন আমি কিছু বুঝি না?' ক্রোধে ফেটে পড়েন প্রভাবতী দেবী, 'আপনারা আমার ছেলেকে সব সময়েই আপনাদের সব থেকে বড় শত্রু বলে মনে করেন। সব সময় চেষ্টা করেন তাঁর ক্ষতি করতে; তাঁর সর্বনাশ করতে।'

অবস্থা বেগতিক দেখে সরে পড়ে পুলিশ দল। কি জানি, ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে কখন কি করে বসবেন তার কি কোন ঠিক আছে। অতএব ভালয় ভালয় সরে পড়াটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

ঠিক এই সময় আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কলকাতা বন্দর থেকে হঠাৎ একটা জাপানী জাহাজ চলে গেল তার নির্ধারিত যাত্রা-সময়ের আগেই। তাতে পুলিশের মনের সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হল। তারা তাদের গোয়েন্দা দপ্তরের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করল এই ব্যাপারটার রহস্য উদঘাটনের পিছনে। ফলে প্রায় দশ-বার দিন পূর্ব সীমান্তেই সবরকম পুলিশী তৎপরতা দেখা গেল।

এদিকে তখন সুভাষচন্দ্র এগিয়ে চলেছেন খাইবারের পথে-মুক্তির নিশানায়।

হোক না এ পথ বন্ধুর; হোক না ভয়ঙ্কর। তবু এ পথ ধরেই এগোতে হবে—এ পথেই পেঁছিতে হবে সূর্য্যতোরণের দ্বারপ্রান্তে।

চারপাশে স্তুপিকৃত হয়ে রয়েছে বরফের চাই। বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে পাহাড়ের চুড়োগুলো। পথ বলতে কিছু নেই ; সমস্ত এলাকাটাকেই মনে হচ্ছে একটা বরফের মাঠ। এই মাঠের মাঝখান থেকেই লাঠি ঠুকে ঠুকে খুঁজে নিতে হবে পথ ; যে পথ এই তিন ঘরছাড়া মুসাফিরকে পেঁাছে দেবে মুক্তির স্বর্ণদ্বারে।

হাটতে হাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুভাষচন্দ্র। ঠাণ্ডায় তাঁর পায়ের রক্ত জমে যাবার উপক্রম। এমন ভয়ঙ্কর পথে কোনদিন তাঁকে চলতে হবে একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি কখনো।

আর পারছেন না। এদিকে ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারটার ঘরে। এই তিন ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটে চলা স্বত্বেও তাঁরা মাত্র একমাইল পথও অতিক্রম করতে পারেন নি। প্রতি পদক্ষেপে পা ডেবে যাচ্ছে বরফের কাদায় ; অবশ হয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা।

'এখান থেকে কি একটা খচ্চরের ব্যবস্থা করা যায় না ?'

সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন ভগৎরামকে।

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে', ভগৎরাম বললেন, 'হয়তো পেলেও পাওয়া যেতে পারে।'

'তাই দেখুন চেষ্টা করে ; আর যে পথ চলা যাচ্ছে না।'

সুভাষচন্দ্র নিজের অক্ষমতাটুকু আর ঢেকে রাখতে পারলেন না।

'ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না,' ভগৎরাম সুভাষচন্দ্রকে আশ্বাস দিলেন, 'আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমি একটু এগিয়ে চেষ্টা করে দেখি—হয়তো একটা মিলেও যেতে পারে।'

সুভাষচন্দ্র বসে পড়লেন সোবনেই। ভগৎরাম এবং গাইড, কাছেই একটা শিখ আফ্রিদির দোকান ছিল, সেখানে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বললেন দোকানদারকে। দোকানদার সব শুনে রাজী হলেন একটা খচ্চর ভাড়া দিতে। ঠিক হল, এই খচ্চর আফগান সীমান্তের প্রথম গ্রাম পর্যন্ত তাঁদের পেঁাছে দেবে। ভাড়া লাগবে আট টাকা।

রাজী হয়ে গেলেন ভগৎরাম—আট টাকাই ভাড়া দেবেন তিনি। তবু সুভাষবাবুর কষ্ট তো একটু কমুক। বেচারা সেই' কোথায় বাংলা দেশ থেকে এসেছেন; এ দেশের জল-আবহাওয়া, পথ-ঘাট সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না। এখন এই বিদেশ বিভূঁয়ে এসে যদি বেঘোরে জানটা যায়, তা হলে আর দুঃখের সীমা থাকবে না ওদের। তাছাড়া, সমগ্র দেশবাসীই বা বলবে কি?

কিছুক্ষণের মধ্যে খচ্চরসহ খচ্চরওয়ালা এসে হাজির। শুকনো ঘাস ভর্তি দু'টো বস্তা চাপান হল খচ্চবটাব পিঠে। এতটা পথ যেতে হবে তো! পিঠে ঘাসের বস্তা থাকলে তাব উপব বসে যাওয়াতে সুবিধে অনেক। যেমন খুশী পা ছড়িয়ে, পা মুড়ে বসা যায়।

সুভাষচন্দ্র চড়ে বসলেন বস্তার ওপব। হঠাৎ পিঠে চাপ পড়ায় খচ্চরটা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। তাবপর খচ্চবওয়ালার হাতের দড়ির টান পড়তেই চলতে শুরু করে দিল সে।

সামনে সামনে চলেছে গাইড। মাঝে খচ্চরের পিঠে সুভাষচন্দ্র। বরফ জমা দুর্গম পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলেছেন চারজন মানুষ। প্রতি পদক্ষেপে বিপদ; প্রতি পদক্ষেপে পদচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা।

হঠাৎ একটা বরফঢাকা পাথরের চাঁইতে পা বেজে হোচট খেয়ে পড়ে গেলেন ভগৎরাম। হাতের লাঠিটা ছিটকে পড়ে গেলে দশ হাত দূরে।

ছুটে এলেন গাইড। কোনরকমে টেনে হিচড়ে তুললেন ভগৎরামকে। কুড়িয়ে এনে দিলেন হাতের লাঠিটাকে। লাঠিতে ভর করে আবার উঠে দাঁড়ালেন দুঃসাহসী মানুষটি।

খচ্চর এগিয়ে চলেছে—ঢিমেতালে; হেলে দুলে। পাহাড়ী রাস্তায় এর থেকে জোরে হাটা সম্ভব নয়; হাটা উচিতও নয়।

হঠাৎ কি হল খচ্চরটার, একটা বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

তাগাদা দিল খচ্চরওয়ালা। হট্ হট্।

কে শোনে কার তাগাদা। খচ্চরটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গাতেই।

এবার হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে পিঠে আস্তে একটা বাড়ি মারল খচ্চরওয়ালা। বাড়ি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের পা দুটো তুলে একটা মোক্ষম লাফ দিল খচ্চরটা।

এমন আকস্মিক ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি টাল সামলাতে পারলেন না—ছিটকে গিয়ে পড়লেন মাটিতে। ঘর্ষণে তাঁর ডান হাতের চামড়া ছড়ে গেল কিছুটা।

ছুটে এল তিনজনই। ধরাধরি করে তোলা হল সুভাষকে। একরকম পাঁজাকোলা করেই আবার তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল খচ্চরটাব পিঠে। খচ্চরটা আবার চলতে শুরু করল।

রাত তখন একটা। চার মুসাফির এসে পেঁাছলেন আফগান সীমান্তের প্রথম গ্রামে।

জায়গাটা খচ্চরওয়ালার পূর্ব-পরিচিত। এর আগেও সে অনেকবার এসেছে এখানে। এ গাঁয়ের বেশ কিছু লোকের সঙ্গেই তার বেশ বন্ধুত্ব—বেশ দহরম-মহরম।

একজন পরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল খচ্চরওয়ালা। বেশ জোরে জোরে হাঁক ডাক শুরু করে দিল বাইরে থেকে।

শীতের রাত। সবাই তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। তার উপর বাইরে বরফ পরে চলেছে ঝির ঝির করে। সে শব্দে কি আর অন্য কিছু শোনার জো আছে! ?

বেশ কিছুক্ষণ হাঁকা-হাঁকি, ডাকা-ডাকির পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন গৃহস্বামী। এই গভীর রাতে খোলা আকাশের নীচে এমন-ভাবে চারজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক। খচ্চর-ওয়ালাকে বললেন, 'ক্যায়া বাত দোস্ত ; ইতনি রাত মে কাঁহা সে আয়ে হো ?'

'আয়া হু আপনা গাঁওসে,' জবাব দিলেন খচ্চরওয়ালা, 'যানা হায় গার্দি। আজ রাত ভর ইধার রহনেকা কুছ ইন্তেজাম হো সকতা ক্যায়া ?'

'আরে, রহনেকা ফিকর মাত করো তুম ইয়ার। তুমহারা দোস্ত যবকত জিন্দা হায়, তবতক রহনেকা ক্যায়া পরোয়া ?'

গৃহস্বামী আহ্বান জানালেন অতিথিদের।

গৃহস্বামীর পিছনে পিছনে ঢুকলেন খচ্চরওয়ালা, সুভাষচন্দ্র, ভগৎরাম এবং গাইড। দেখা গেল, গাইডও গৃহস্বামীর পরিচিত। এর আগে এ গাঁয়েই ওদের মোলাকাত হয়েছে অনেকবার।

এ এলাকার প্রতিটি মানুষই শিনওয়ারী উপজাতিভুক্ত। অতিথিবৎসল হিসেবে এদের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে চারদিকে।

অতিথিদের বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে বলে গৃহস্বামী চলে গেলেন অন্দর মহলে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এলেন চা-জলখাবার নিয়ে। হাতজোড় করে অতিথিদের বললেন, 'আমরা গরীব মানুষ। যা সাধ্যে কুলিয়েছে তাই আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। মেহেরবাণী করে যদি এই গরীবের খানা গ্রহণ করেন তা হলে খুব খুশী হব।'

গৃহস্বামীর প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হলেন অতিথির দল। এতো পরম সৌভাগ্য। এত রাতে যে তবু কিছু খাবার পাওয়া গেছে তাই-তো যথেষ্ট। এ খাবার না পেলে আজ সারাটা রাত সকলকে উপোষ করেই কাটাতে হতো। সত্যি, ভগবান যা করেন মঙ্গলের

খাওয়া-দাওয়া শেষে গৃহস্বামী অতিথিদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটা বড় বড় শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হল মেঝেতে। তার উপর পাতা হল তাকিয়া, পায়ে ঢাকা দেবার জন্য এল র-উলের মোটা কম্বল।

পথ চলার ক্লান্তিতে প্রত্যেকের দেহই ক্লান্ত—অবসন্ন। তবু এরই মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অবস্থা যেন একটু বেশী কাহিল। তিনি আর এক মিনিটও বসতে পারবেন না—এখনি তাঁকে শুয়ে পরতে হবে। না হলে তারপক্ষে আর এক ইঞ্চি পথও এগোন সম্ভব হবে না।

কিন্তু মুসকিল বাঁধল খচ্চরওয়ালাব এক নতুন প্রস্তাবে। সে বলল, যদি তাঁকে আরো তের টাকা দেওয়া হয় তবে সে সুভাষচন্দ্রকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে পেশোয়ার-কাবুল রোডের পাশে গার্দি গ্রাম পর্যন্ত পেঁাছে দেবে। তবে এক শর্ত, এখনি রওয়ানা দিতে হবে; সকাল হলে সে আর যাবে না।

প্রস্তাবটা মারাত্মক রকমের লোভনীয়। এই দূব গ্রামে খচ্চরওয়ালাকে এখন ছেড়ে দিলে এরপরে আর নতুন কোন খচ্চব-ওয়ালা পাওয়া যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বাকি রাস্তাটুকু পায়ে হেঁটেই যেতে হবে তাঁদের। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সে হবে আরো বেশী কষ্টসাধ্য; আরো বেশী কঠিন।

অতএব খচ্চরওয়ালার প্রস্তাবকেই মেনে নিতে হল। ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়া সত্বেও সুভাষচন্দ্র গিয়ে বসলেন খচ্চরের পিঠে; পিছনে পিছনে রইলেন ভগৎরাম।

গাইড ফিরে গেল পেশোয়ারে। যাবার সময় তার হাতে একটা চিঠি দিলেন ভগৎরাম—আবাদ খাঁ-র নামে। বললেন, 'পেশোয়ারে পেঁাছেই আবাদ খাঁর হাতে দিয়ে দেবে এই চিঠি। এতে অনেক জরুরী কথা লেখা আছে। এ চিঠি পেঁাছতে দেরী হলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, মনে রেখ।'

সুভাষচন্দ্র এবং ভগৎরামকে সেলাম জানিয়ে ফিরে গেল গাইড। সারাটা পথ এবার তাকে যেতে হবে একা। আজ এ পথে তার কোন সাথী নেই, নেই কোন বন্ধু।

এদিকে গার্দির পথে এগিয়ে চলেন সুভাষচন্দ্র আব ভগৎরাম। সেই পিচ্ছিল পথ, তেমনি বিপদ সঙ্কুল; পদে পদে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা। তবু সবকিছু উপেক্ষা করে তাঁদের এগোতে হয়; না এগোলে তাঁরা যে স্বাধীনতার সূর্য্যটাকে খুঁজে পাবেন না।

প্রায় সাত ঘণ্টা একনাগাড়ে পথ চলার পর এগার মাইল পথ অতিক্রম করে ওরা তিনজন এসে পৌঁছলেন গার্দি গ্রামে; পেশোয়ার-কাবুল রোডের একেবারে সামনে।

খচ্চরওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন ভগৎরাম। মোট একুশ টাকা; একবার আট আর একবার তের।

ভাড়া পেয়ে ভাবে গদ গদ হয়ে দু'বার সেলাম ঠুকল খচ্চরওয়ালা। বলল, 'আব হাম ঘর লোওটেঙ্গে। ফির কভি মুঝে জরুরত হোগা তো বুলানা। ম্যায় আপকী খিদমতমে জরুর আউঙ্গা।'

'বহুত সুকরিয়া।'

হাত তুলে বিদায় জানালেন ভগৎরাম।

দেখতে দেখতে দূরে—বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল খচ্চরওয়ালা।

এবার শুরু হল এক নতুন পথ পরিক্রমা—এক নয়া এ্যাডভেঞ্চার।

ঠিক হল, এখন থেকে দু'জনেরই নাম যাবে পাল্টে। ভগৎরাম হবেন রহমত খাঁ আর সুভাষচন্দ্র হবেন জিয়াউদ্দিন—রহমত খাঁর চাচাজী। অর্থাৎ কাকা।

শুধু তাই নয়, জিয়াউদ্দিনকে এখন থেকে বোবা এবং কালা দুই-ই সাজতে হবে। কারণ, এদেশের ভাষা তাঁর মোটেই জানা

নেই। ফলে তিনি যদি কথা বলেন, তা হলে সাধারণ লোকের মনে তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তার থেকে এই ভাল, বোবা-কালার কোন শত্রু নেই।

কাবুল রোড ধরে এগিয়ে চলেছেন দুই মুসাফির। বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন পেছনে। উদ্দেশ্য, যদি কোন ট্রাক এসে যায়, তবে তাকে থামিয়ে অনুরোধ করবেন তাঁদের জালালাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ সুভাষচন্দ্র বলে উঠলেন, 'সত্যি, কি সুন্দর দেশ!'

কথা শুনে ভগৎরাম অবাক! বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন সুভাষচন্দ্রের দিকে। ভেবেই পেলেন না এই পাহাড়ী পাথরের চাঁইগুলোর মধ্যে সুন্দরের কি আছে!

বললেন, 'এই কঠিন পাথরের খাঁজগুলোর মধ্যে আপনি সুন্দরের কি পেলেন?'

প্রশ্ন শুনে হাসলেন সুভাষ। বললেন, 'আমি পাথরকে দেখছি না, দেখছি এই পবিত্র মাটিকে। দেখছি মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত এই স্বাধীন দেশকে। কি সুন্দর এর বাতাস; কি সুখী এখানকার মানুষ।'

এরপর আর কিছু বলার নেই; বলার থাকতে পারে না। তাই ভগৎরাম চুপ করে গেলেন। মনে মনে বললেন, এমন মানুষ যদি ভারতবর্ষে আর কয়েকজন জন্মাতেন তা হলে এই দু' শ' বছর ধরে এদেশের মানুষ এমন চরম লাঞ্ছনা সয়েও চুপ করে থাকত না—তারা গর্জে উঠত; ছিন্ন ভিন্ন করে দিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দু'জনে এসে পৌঁছলেন আর্জানাও গ্রামে। বসলেন এসে একটা উঁচু টিবির ওপর।

হঠাৎ কোথা থেকে এক ছ' ফুট লম্বা পাঠান এসে হাজির। কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে সোজা এসে বসল তাঁদের পাশে। তীব্র চোখে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিল দু'জনের। তারপর বেমক্কা এক প্রশ্ন করে বসল, 'কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?'

'আমরা ?' একটু যেন ঢোক গিললেন ভগৎরাম, 'আমরা আসছি লালপুরা থেকে।'

'লালপুরা থেকে !'

বিস্মিত ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন পাঠান যুবকটি।

'হ্যাঁ, লালপুরা থেকে।'

এবার যেন কথাটায় একটু বেশী রকমের-ই জোর দিলেন ভগৎরাম।

'অসম্ভব, আমি নিজে লালপুরার লোক, সেখানকার সবাইকে চিনি।' বলল যুবকটি, 'আপনাদের তো এর আগে কখনো দেখিনি সেখানে।'

'আপনি দেখেননি বলেই যে আমরা সেখানকার বাসিন্দা নই, এটা তো আর হতে পারে না।'

বললেন ভগৎরাম।

'ওঃ,' যুবকটি একটু চিন্তা করে নিল মনে মনে। তারপর বলল 'তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখন ?'

'আড্ডা-শরিফে।' ভগৎরাম বললেন, 'ইনি হচ্ছেন আমার কাকা। খুব অসুস্থ। তাই এনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে আল্লার দোয়া মাঙতে।'

'কি অসুখ ?'

জানতে চাইল যুবকটি।

'উনি বোবা ও কালা।' ভগৎরামের গলার স্বর বেশ করুণ হয়ে উঠল, 'অনেকদিনের পুরানা বিমারী। অনেক পির-দরগায় নিয়ে গেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। তাই এবার যাচ্ছি আড্ডা-শরিফে। লোকে বলে, ওখানে দোয়া মাঙ্গলে নাকি সব বিমারী ভাল হয়ে যায়।'

কথাটা শুনে এবার যেন একটু মন গলল পাঠান যুবকটির। বলল, 'বহুত-আফশোষ কা বাত। আল্লহ্ কা মন মে ক্যায়া হায় কৌন জানে! ঠিক হায়, আপ ফিকর মাত্ কিজিয়ে, ম্যায় ভি ইস বিমার কা কুঁছ দাওয়া জানতা হু।'

অর্থাৎ উনিও একজন ডাক্তার।

যুবকটি জিব দেখাতে বলল সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র শুধু বোবাই নন, কালাও। তাই পাঠান যুবকটির কোন কথাই তিনি শুনতে পেলেন না—শুধু তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে হাঁ করে—ঠিক আগের মতই।

যুবকটি এবার ভগৎরামকে বলল কথাটা, 'উনকো মু খোলনে কহিয়ে।'

যুবকটির আব্দার মানতেই হবে—তা না হলে তাঁর কাছ থেকে যখন তখন বিপদ উপস্থিত হতে পারে। অতএব চাচাজীকে হাত-পা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন ভগৎরাম, জিব বের করুন। জিভ বের করে দেখান এই পাঠান উল্লুকটাকে। তা নাহলে বিপদ ঘটতে পারে।

ভাইপোর কথা বুঝতে পারলেন চাচাজী। তিনি হাঁ করে জিভটা মেলে ধরলেন পাঠান যুবকটির সামনে।

পাঠান যুবকটি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

তার ময়লা হাতটা দিয়ে সুভাষচন্দ্রের জিভটাকে চেপে ধরল সে। বেশ কয়েকবার এদিক ওদিক নাড়া চাড়া করে দেখল। শেষে রায় দিল, 'না, জিভটা সত্যিই খুব শক্ত। এবং সেইজন্যই যতকিছু

গোলমাল।' শুধু তাই নয় একটা ঔষধও সে বাতলে দিল: গরম জলে ফিটকিরি মিশিয়ে সেটাকে সর্বদা মুখের মধ্যে রাখতে হবে। এভাবে কিছুদিন চললে এই বিমারীটা ভাল হতে পারে।

ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লেন ভগৎরাম। সুভাষচন্দ্রও তাব সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আবার শুরু হল পথ চলা।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পথ চলার পর দুই পথিক এসে পৌঁছলেন বাসোল গ্রামের কাছে।

কাবুল রোডের ধার ঘেঁষে এই বাসোল গ্রাম। গ্রামের জনসংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। তবে গ্রামটা বেশ বর্ধিষ্ণু। চারপাশের ক্ষেত-খামার দেখলে বাইরের লোকের সে ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম অপেক্ষা করতে লাগলেন একটা গাছের তলায়। উদ্দেশ্য, যদি কোন ট্রাক পাওয়া যায়, তবে তাতে করে জালালাবাদ যাওয়া।

অপেক্ষা করতে করতে কেটে গেল আধঘণ্টা। কিন্তু কোথায় ট্রাক? একটা মোটরেরও যে পাত্তা নেই!

হঠাৎ চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভগৎরামের। কি একটা দেখা যাচ্ছে না উঁচু মত? একটা মাল বোঝাই ট্রাক না?

হ্যাঁ, তাইতো; ট্রাকই তো এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে।

'রোখকে, রোখকে, রোখকে...'

দু'হাত তুলে চিৎকার করতে লাগলেন ভগৎরাম।

ধীরে ধীরে ট্রাকটা এসে থেমে গেল ভগৎরামের সামনে। ট্রাক ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যায়া বাত?'

'হাম দোনো জালালাবাদ জায়েঙ্গে; বহুত দূর সে পায়দল আ

রহা হু। আপ আগর মেহেরবাণী করকে হাম দোনোকো লে জাইয়েগা তো আল্লাহ আপকা ভালা করেগা।'

মিনতির সুরে কথাগুলো বললেন ভগৎরাম।

ভগৎরামের কথা শুনে ট্রাক-ড্রাইভার বললেন, 'ম্যায় তো নেহি লে জা সকেঙ্গে। ফির ভি আপ ফিকর মাত কিজিয়ে। মেরা পিছু মে অওর এক ট্রাক আ রহী হ্যায়; উও জরুর আপকো লে জায়েঙ্গে।'

ট্রাক ছেড়ে দিল। ভগৎরাম এবং সুভাষচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইলেন পরবর্তী ট্রাকের অপেক্ষায়।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও কাটল না, এরই মধ্যে হু হু করে ছুটে এল একটা চায়েয় পেটি বোঝাই বেডফোর্ড লরি।

লরিটাকে দেখে ভগৎরাম হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগলেন, 'রুখ্ যাও, রুখ্ যাও, রুখ্ যাও…'

একজন মানুষকে এমনভাবে রাস্তাব মাঝে লাফালাফি করতে দেখে ড্রাইভারের মনে বেশ কৌতুহল হল। ব্রেক চেপে ধবল সে ট্রাকের। ক্যাক্ ক্যাক্ আওয়াজ করতে করতে থেমে গেল ট্রাকটা। ড্রাইভার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, অমন ভাবে লাফালাফি করছ কেন রাস্তার মাঝে?'

'কি করব ভাই, অনেক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কোন গাড়ীকেই থামাতে পারছি না।

ভগৎরাম তার লাফালাফির কারণ বিশদ ব্যাখা করে বলল ড্রাইভারকে।

'কেন?'

জানতে চাইল ড্রাইভার।

'আমরা জালালাবাদ যাব। অনেকদূর থেকে হেঁটে আসছি। পা ব্যাথা হয়ে গেছে; আর চলতে পারছি না।', ভগৎরাম মিনতির সুরে বললেন, 'আপনি যদি একটু দয়া করে আমাদের

নিয়ে যান তাহলে এই বুড়োর জানটা বাঁচে। বুড়ো বোবা ও কালা। পথ চলতে চলতে আধমরা হয়ে গেছে। অথচ বোবা বলে কিছু বলতেও পারছে না।'

এ কথায় সম্ভবতঃ ড্রাইভারের মনে একটু করুণার উদ্রেক হল। সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা চায়ের পেটির ওপর উঠে বস। আমি তোমাদের জালালাবাদ পৌঁছে দেব।'

'বহত মেহেরবাণী ; বহত মেহেরবাণী আপকা' বলতে বলতে ভগৎরাম উঠে বসলেন ট্রাকের উপর ; হাত বাড়িয়ে টেনে হিঁচরে তুলে নিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

ট্রাক চলতে শুরু করল।

আনন্দে—স্ফূর্তিতে বুকটা নেচে উঠল দু'জনেরই। আর যাই হোক, অন্ততঃ জালালাবাদ পর্যন্ত পৌঁছবার তো একটা ব্যবস্থা হল।

হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ; বরফের কুঁচি এসে বিঁধছে মুখে। মাঝে মাঝে মাথাটাকে নামিয়ে ফেলতে হচ্ছে একেবারে পায়ের কাছে। তা না হলে যখন তখন গাছের ডালের ধাক্কায় ছিঁটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে মাটিতে।

এভাবেই কাটল ছ'ঘণ্টা। এই ছ'ঘণ্টা সময় নড়বড়ে চায়ের পেটিগুলোর ওপর ঠায় বসে থাকতে হল দু'জনকে। প্রতি মুহূর্তে ভয়, কখন গাছের ডালে ধাক্কা লাগে! কখন ছিটকে পড়তে হয় মাটিতে।

মাঝ পথে তো দু' ঘণ্টা থেমেই রইল গাড়ীটা। জেলা অফিসার যাবেন জালালাবাদ ; তাকে না নিয়ে তো আর যাওয়া যায় না তা হলে যে ওর লাইসেন্সই বাতিল হয়ে যাবে।

বাদশাহী-চালে হেলতে দুলতে এসে হাজির হলেন জেলা

অফিসার। সঙ্গে তার তিনজন পিয়ন। সবাই উঠলেন গাড়ীর সামনের দিকে ; ড্রাইভারের পাশে। নতুন আরোহী নিয়ে গাড়ী আবার চলতে শুরু করল।

রাত তখন দশটা। গাড়ী এসে পৌঁছল জালালাবাদে ; চায়ের পেটির খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে নামলেন প্রথমে ভগৎরাম, পরে তার চাচাজী—সুভাষচন্দ্র।

লরি ষ্ট্যাণ্ডের সামনেই একটা হোটেল ছিল। একেবারে দেশোয়ালী হোটেল—অনেকটা সরাইখানার-ই মত। সুভাষচন্দ্রকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে গেলেন ভগৎরাম। দেখা করলেন ম্যানেজারের সঙ্গে। জানতে চাইলেন, সে রাতের মত দু'টো লোকের থাকার ব্যবস্থা হবে কি না ?

একটা ঘর পাওয়া গেল। তাতে দু'টো আলাদা বিছানা এবং আগুনের চুল্লিরও ব্যবস্থা রয়েছে। ভাড়া এক রাতের জন্য দু'টাকা।

ভগৎরাম তাতেই রাজী হলেন। বাইরে এসে চাচাজীকে হাত-পা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। তারপর দু'জনেই হোটেলের ভিতর ঢুকলেন। রেজিষ্টারে টিপ সই দিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে চলে গেলেন নির্ধারিত কামরায়।

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশ সেরে শুরু হল যাত্রা। এবার আড্ডা-শরিফ যেতে হবে। সেখানকার মসজিদে আল্লার দোয়া মাঙ্গলে হয়তো চাচাজীর এই পুরানা বিমারীটা সেরেও যেতে পারে যদিও বাইরের লোককে বলা হল তাই ; কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা হল অন্য।

হাজি মহম্মদ আমিন নামে একজন অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির লোক থাকেন সেখানে। ভদ্রলোক ভগৎরামের পূর্ব পরিচিত। আগে থাকতেন পেশোয়ারে। আজ থেকে দশ বছর আগে, পেশোয়ারের কিসাখানি বাজারে যখন গুলি চলেছিল, এবং যার ফলে বহু নিরীহ লোক নিহত হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং সেই অনুযায়ী এক বাহিনীও পরিচালনা করেছিলেন।

প্রথম দিকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মহম্মদ আমিন ও তাঁর দল-বল পেশোয়ারের কাছে রেলওয়ে লাইন এবং বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেছিলেন। কিন্তু ক'দিন পরই ব্রিটিশের চাপের কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করে পিছু হঠে আসতে হয়। এরপর তিনি গ্রেপ্তার হন।

গ্রেপ্তার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পেশোয়ার জেলে। সে সময় ভগৎরামও সেখানেই ছিলেন।

আমিনের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার দরুন, পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কিছুতেই মামলা সাজিয়ে উঠতে পারছিল না। ফলে সীমান্ত উপজাতি আইন অনুযায়ী তাঁকে তিন বছরের জন্য জামিন দিতে তারা বাধ্য হয়। এই জামিনে থাকাকালীন, তিনি পুলিশের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে আসেন আফগান এলাকায়। সেখানে এসে আশ্রয় নেন আড্ডা-শরিফে।

এই আমিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যই ভগৎরাম এবং সুভাষচন্দ্র চলেছেন আড্ডা-শরিফে। ভদ্রলোক অত্যন্ত পরোপকারী, অপরের উপকার করতে পারলে তিনি যেন আর কিছুই চান না। তাই, আশা আছে, হয়তো তাঁকে বললে সুভাষচন্দ্রের রাশিয়া যাত্রা সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে।

দুপুর বারটা নাগাদ দু'জনে এসে পেঁছলেন আড্ডা-শরিফে। পায়ের জুতো বাইরে খুলে রেখে ভগৎরাম ঢুকলেন মসজিদে; তার পিছে পিছে এলেন সুভাষচন্দ্র। দু'জনে হাটু গেরে বসলেন কবরের সামনে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে মুখে বির বির করে চললেন ভগৎরাম। সবাই বুঝল চাচাজীর জন্য আল্লাব কাছে মিনতি জানাচ্ছেন ভাতিজা।

নিয়ম মাফিক কাজকর্ম শেষ হলে ভগৎবাম একজন ফকিরের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন মহম্মদ আমিনের খবর। তার কাছ থেকে জানলেন যে, আমিন সাহেব এখন লালমায় থাকেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পাবে।

লালমা এখান থেকে বেশী দূরে নয়; হাঁটা পথে বড়জোর এক মাইলটাক হবে। গাঁয়ের পথ ধরে গেলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সেখানে পেঁছনো যায়।

বিকেল তিনটে নাগাদ দুই মুসাফিব এসে পেঁছলেন লালমা গায়ে। সেখানে পেঁছে কোন রকম খোঁজ খবর করতে হলনা হাজি সাহেবের; একেবারে সামনেই তাঁব বাড়ী। একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে দেখিয়ে দিল বাড়ীটা।

ভগৎরাম এবং সুভাষচন্দ্র সেলাম জানিয়ে হাজির হলেন আমিনের সামনে। তখন তাঁর ঘরে অনেক লোক; অনেক বিষয় নিয়ে চলেছে আলোচনা। এরমধ্যে দু'জন নতুন মেহমানের আগমনটা তেমন বিশেষ কিছু সাড়া জাগাতে পারল না। শুধু আমিন সাহেব একবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'বাজাউর থেকে।'

উত্তর দিলেন ভগৎরাম।

বাজাউর! জায়গাটার নাম কানে যেতেই হাজিসাহেব বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উপস্থিত লোকজনদের বললেন, 'আপনারা একটু বাইরে যান ; আমি এদের সঙ্গে কিছু জরুরী বিষয়ে আলোচনা করব।'

হাজি সাহেবেব অনুরোধে ঘরের লোকজন বাইরে বের হয়ে গেলেন। যাবাব সময় তারা ঘরের দরজা টেনে দিয়ে যেতে ভুললেন না।

এবার হাজি সাহেব বললেন, 'আপনাদের কিন্তু আমি ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না।'

'আমার নাম ভগৎরাম।'

নিজের পরিচয় দিলেন ভগৎরাম।

'ভগৎরাম !'

নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পুরান কমরেডকে। বললেন, 'অনেকদিন পর দেখা, কেমন আছেন আপনি ?

'খুব ভাল।'

জবাব দিলেন ভগৎরাম।

'তা এতদিন পরে এখানে কি মনে করে ?'

এঁদের আসার কাবণ জানতে চাইলেন হাজি সাহেব।

'সমস্ত ব্যাপাবটা আপনাকে খুলেই বলি,' বললেন ভগৎরাম, 'এই ভদ্রলোক আমাদের পার্টির একজন অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন কমরেড। কিছুদিন ধরে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এখানে সেখানে। এখন মনস্থ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার। সে কারণেই আপনার কাছে আসা। যে করেই হোক আপনাকে একটা পথ বাতলে দিতেই হবে।'

প্রস্তাবটা শুনে খুব খুশী হলেন আমিন। বললেন, 'এমন দুঃসাহসী লোকেরই আজ প্রয়োজন দেশের। ভীরু কাপুরুষদের দিয়ে

কখনো কোথাও স্বাধীনতা আসে না।' তারপর পথে কোথায় কি বিপদ ঘটতে পারে, কিভাবে, কোথা থেকে কোথায় গেলে যাত্রা সহজ হবে সব কিছু বুঝিয়ে বললেন তিনি। হুঁশিয়ার করে দিলেন বাদখাক চেকপোষ্টে সতর্ক থাকার জন্য। ওখানে কাষ্টমসের কড়াকড়িটা সত্যিই একটু বেশী।

আমিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভগৎরাম এবং সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন জালালাবাদে। সেখানে হোটেলে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা একটা টাঙ্গা ভাড়া করে দু'জনে রওয়ানা দিলেন সুলতানপুরের পথে।

সুলতানপুর পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন দুই ঘরছাড়া পথিক। পথের ধারে এক চায়ের দোকানে বসে দু' কাপ চা খেলেন। চা খেতে খেতে ভগৎরাম বললেন, 'আমি ভাবছি, এখানে এভাবে ট্রাকের অপেক্ষায় বসে না থেকে বরং একটা টাঙ্গা নিয়ে এগোলে কেমন হয়।'

'আমার মনে হয় সেটাই ভাল হবে,' বললেন সুভাষচন্দ্র, 'কখন ট্রাক আসবে তার ভরসায় এখন থেকে হা পিত্যেশ করে বসে থাকাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওতে লোক আমাদের সন্দেহ করতে পারে। তার থেকে টাঙ্গা-ই ভাড়া করুন। যতটা এগোন যায় ততটাই লাভ।'

একটা টাঙ্গা ঠিক হল। তাতে চেপে বসলেন সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম।

বিকেল তিনটে নাগাদ টাঙ্গা গিয়ে পৌঁছল সুলতানপুর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে এক দেহাতি বাজারের সামনে। এখানেই টাঙ্গা ছেড়ে দিতে হবে; টাঙ্গাওয়ালা আর সামনে এগোতে রাজী নয়। তাকে ফিরে যেতে হবে আবার সেই সুলতানপুর। বেশী রাত হলে

বরফ ঢাকা পথে টাঙ্গা চালানই হবে মুসকিল। হয়তো মাঝ-রাস্তাতেই কাটাতে হবে রাতটা। সুতরাং, বেলা থাকতেই সে ফিরে যেতে চায়।

টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে শুরু হল হাঁটা। আবার সেই ক্লান্তিকর একঘেয়ে পদযাত্রা। শুধু হাঁটা, হাঁটা আর হাঁটা।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ দুই নিরুদ্দেশের যাত্রী এসে পেঁছলেন মিমলায়। পথ চলতে চলতে দু'জনেরই খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। এখন যা হোক কিছু একটা পেটে না পড়লে আর চলছে না।

কাছেই ছিল একটা হোটেল; নাম—মুসাফির-ই-দোস্ত।

দোস্ত-ই বটে। এই পাহাড়ী এলাকায় এমন বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে যে প্রতিমুহূর্তে প্রতিক্ষা করছে মুসাফিরের, তাকে দোস্ত ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়?

'দোস্ত'-এর কাছে গিয়ে খাবারের অর্ডার দিলেন ভগৎরাম। দু' প্লেট সুখা কাবাব আর চারটে তন্দুরী।

তখনো খাবার এসে পেঁছয়নি টেবিলে, এমন সময় ভগৎরাম দেখলেন, দূর থেকে একটা মালবোঝাই ট্রাক ছুটে আসছে প্রচণ্ড গতিতে।

আর দেরী করা যায় না; ঝোলাঝুলি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দু'জনেই—ভগৎরাম আর সুভাষচন্দ্র। খাবার না খেয়েই বেরিয়ে এলেন হোটেলের বাইরে। থাক পড়ে খাবার, আরো কিছুক্ষণ না হয় খিদের যন্ত্রনা সহ্যই করা গেল; একবার একটা ট্রাক চলে গেলে আবার কখন একটা আসবে সে আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়।

রাস্তার দু'দিক থেকে দু'জন হাত নেড়ে ট্রাকটাকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দু'জন পাঠানের এমন

উদ্‌ভ্রান্ত হাত নাড়া দেখে সম্ভবতঃ ড্রাইভারের মনে করুণার উদ্রেক হল। সে আস্তে আস্তে গাড়ীর গতি কমিয়ে হোটেলের সামনে এসে থামল। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সুভাষচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যায়া বাত ?'

সুভাষচন্দ্র বোবাই শুধু নন, কালাও বটে। ড্রাইভার যে কি বলছে তার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। সুতরাং ছুটে আসতে হল ভগৎরামকে।

ভগৎরাম এসে ড্রাইভারকে মিনতির সুরে বললেন, 'উনি আমার চাচাজী ; কানে শোনেন না—কালা। তাই আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছেন না। তা ছাড়া উনি বোবা। ফলে জবাবও দিতে পারছেন না।'

'ও।'

ড্রাইভারের মুখ থেকে তার নিজের অজান্তেই সমবেদনা বেরিয়ে এল।

'আমরা কাবুল যাব।' ভগৎরাম বললেন, 'দয়া করে আপনি যদি ট্রাকে আমাদের নিয়ে যান তবে এই গরীব বান্দার বড় উপকার হয়।'

'ঠিক হ্যায়, বৈঠিয়ে।'

গাড়ীতে ওঠবার আহ্বান জানাল ড্রাইভার। সত্যি তো, বেচারা বোবা-কালা লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে কতদূর আর এগোবে তা ছাড়া এটা শীতের সময় ; এমন দুর্দান্ত শীতে হাঁটা-পথে কি আর কাবুল পেঁাছান সম্ভব !

ট্রাক ছুটে চলেছে হু হু বেগে। বাইরে থেকে হুড় হুড় করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ভিতরে। মনে হচ্ছে, যেন মাংস ভেদ করে হাড়ে গিয়ে লাগছে বাতাস। এখনি হয়তো অবশ হয়ে যাবে মাংস-পেশীগুলো ; বন্ধ হয়ে যাবে শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল।

তবু ভাল, ভগৎরাম ভাবলেন, পায়ে হেটে এগোতে গেলে হয়তো

মাঝরাস্তায়-ই পড়ে থাকতে হতো মরে। শেষ পর্যন্ত হয়তো লাসটাও পৌঁছত না কাবুলে।

রাত ন'টা নাগাদ ট্রাক এসে থামল গাণ্ডামাক-এ। সামনেই একটা পাঠান হোটেল। সেখানে ঢুকে সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। ঘণ্টা দেড়েক পড়ে আবার শুরু হল পথ চলা; ট্রাক ছুটে চলল কাবুল অভিমুখে।

সারারাত ধরে ট্রাক চলেছে তো চলেছে-ই; লাজুক আকাশের চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেছে গাঢ় কুয়াশার আস্তরণে। দশ হাত দূরের এলাকা দেখা যায় না স্পষ্ট করে। তবু এরই মাঝে তীব্র সার্চ-লাইটের আলো ফেলে, রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে ছুটে চলেছে ট্রাক। যেভাবেই হোক, কাবুলে যে তাকে পেঁছিতেই হবে।

তখনো পূবের আকাশে প্রভাত সূর্যোদয় সাতরঙের প্রলেপ পড়েনি; তখনো বরফের আস্তরণে অবগুণ্ঠিতা গিরিশৃঙ্গের ঘুম ভাঙেনি—এমন সময় ট্রাক এসে পেঁছিল বাদখাক-এ।

ড্রাইভার ভগৎরামকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, এখানে কি করতে হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ভগৎরাম ট্রাক থেকে নেমে সোজা এগিয়ে গেল্লেন কাষ্টমস অফিসের দিকে। আর সেই সুযোগে সুভাষচন্দ্র পা বাড়ালেন হোটেলের পথে—ড্রাইভারের পিছে পিছে।

অফিসে গিয়ে ভগৎরাম অবাক! একি ব্যাপার! একটা লোকও যে জেগে নেই এখানে—সবাই ঘুমুচ্ছে নাক ডেকে! শুধু কি তাই? সারটা চত্বরে একটা পাহারাদারকেও যে দেখা যাচ্ছে না!

বেশ ভালই হল। মনে মনে খুব খুশী হয়ে ফিরে এলেন ভগৎরাম! সোল্লাসে খবরটা জানালেন অন্যান্য যাত্রীদের। সবাই খবরটা শুনে হাঁটা দিল হোটেলের দিকে। ভগৎরামও মিশে গেলেন তাদের দলে।

হোটেলের গেটের কাছে আসতে দেখা হল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। সব কথা বললেন তাঁকে ; অবশ্য মুখে নয়—হাতের আঙ্গুলগুলোকে বিভিন্ন কায়দায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। খবরটা শুনে সুভাষচন্দ্র যে মনে মনে খুব খুশী হলেন সেটা তাঁব মুখের ঔজ্জ্বল্যতার আকস্মিক বৃদ্ধি দেখেই বোঝা গেল।

খাওয়া দাওয়া সেরে হোটেলের বিশ্রাম-ঘরে প্রায় ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে নিলেন দুই ছন্নছাড়া পথিক। এ দেহ দু'টোর উপর থেকে অনেক ঝড় বয়ে গেছে ; অনেক ঝড় বযে যাবে—তবু তাব-ই মাঝে একে যতটা বিশ্রাম দেওয়া যায় ততটাই লাভ। না হলে একসময় এটা একেবারেই অকেজো হয়ে পড়বে।

সকাল ন'টা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে সামনের টাঙ্গা-স্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হলেন সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম। অনেক দর-দামের পর একটা টাঙ্গা ভাড়া করা হল। ঠিক হল, টাঙ্গাওয়ালা ওদের পৌঁছে দেবে কাবুলে।

বাদখাক থেকে কাবুলের দূরত্ব পুরো তের মাইল। এ পথটুকু পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে যত সময়ই লাগুক না কেন—টাঙ্গায় মাত্র চার ঘণ্টায় পেঁাছে যাওয়া যায়।

টাঙ্গা ছুটে চলেছে খট্ খট্, খটা খট্ শব্দ করে। সূর্য্যের আলো ঠিকরে পড়েছে পথের উপর, গাছের পাতায়, পাহাড়ের চূড়োয়। মনে হচ্ছে, যেন নবযৌবনের ছোঁয়া লেগেছে চারিদিকে। উচ্ছ্বাসে-আনন্দে-উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি সুন্দরী ; এক আশ্চর্য স্বর্গীয় ঐক্যতান-ব্যাঞ্জনে শুরু হয়ে গেছে মহা-মিলনের প্রণয়-গীতি।

ছুটে চলেছে টাঙ্গা—দ্রুত, আরো দ্রুতগতিতে। কিন্তু তাতে কি বাঁধ মানে উচ্ছ্বসিত হৃদয়! সে কি তাল মিলিয়ে চলতে পারে ঘোড়ার খুড়ের তালে তালে! এ অসম্ভব। এ অবাস্তব।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে-খুশীতে ক্ষণে ক্ষণে ঝড় ওঠে দুটি প্রশস্ত বুকে। মনে হয়, এ আনন্দ আর ধরে রাখা যাবে না দেহের সীমাবদ্ধ খাঁচাটায়; একে আর বেঁধে রাখা যাবে না ইচ্ছার দড়ি দিয়ে। এই মুহূর্তে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মত গল গল করে সে বেরিয়ে পড়বে দেহের মনিকোঠা ছেড়ে; চারপাশের সব কিছুকে ঢেকে দেবে চরম প্রাপ্তির আস্তরনে।

ছুটে চলে টাঙ্গা; ছুটে চলে মন। কাবুল! কাবুল! কাবুল! এক চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে দুটি ঘরছাড়া উদাস পথিককে; এক ভাবনা ছন্দে ছন্দে পা ফেলে পা ফেলে এগিয়ে চলে সূর্য্যতোরণের নিশানায়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন ভগৎরাম, 'কাবুল, কাবুল, কাবুল।'

হ্যাঁ, কাবুল। ঐতো দেখা যায় কাবুল। মুক্ত দেশের মুক্ত রাজধানী কাবুল। ওখানে কারো মুখে পরাধীনতার কালো ছায়া নেই; কারো চোখের পাতায় মুক্তি-কামনার ক্লান্ত ইচ্ছা হা-হুতাশ করে ফিরছে না; কারো নিশ্বাসে স্বাধীনতার আকাঙ্খা গর্জনে বিঘোষিত হচ্ছে না।

সেই কাবুল এসে গেছে। সেই কাবুলে পেঁাছে গেছেন দুই জন্ম-বিপ্লবী—সুভাষচন্দ্র আর ভগৎরাম। এবার শুরু হবে এক নতুন যাত্রা—নতুন সূর্য্যের পথ-পরিক্রমা।

হঠাৎ যেন আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম শশীর ডাকে। ও বলল, 'ইতনা ক্যা শোচ রহে হো তবসে! ইউনিভার্সিটি সে নিকলনে কা বাদ তুমহারা মু সে এক লবজ্ ভি নেহি নিকলা।'

সত্যিই তো। আমি কি ভাবছিলাম এতক্ষণ! কার কথা?

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে গেল এক চক্কর। মনে হল, সবাই যেন আমার সামনে থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে—শশী, রাকেশ, মিসেস ভাণ্ডারী।

সুভাষচন্দ্র ! সুভাষচন্দ্র ! সুভাষচন্দ্র ! ঐ একটা নামই বারবার কে যেন চিৎকাব করে বলে চলেছে আমার কানের কাছে ; হাতুড়ী পিটিয়ে ঢুকিযে দিচ্ছে মাথায মধ্যে। কিন্তু কে? কে সে?

শশী? বাকেশ? মিসেস ভাণ্ডাবী? ডঃ ভাবমা?

কে? কে?

'কি ভাবছ?'

জিজ্ঞাসা কবলেন মিসেস ভাণ্ডাবী।

'এ্যা,' নিজেকে সামলে নিলাম আমি। সত্যিই তো, ওবা আমাকে কি ভাবছে! ছিঃ! এটা তো একবকম পাগলামী ছাড়া আব কিছুই নয। এ সব ব্যাপাবে এমন সেন্টিমেণ্টাল হলে চলে! যত সব ছেলেমানুষী।

হেসে বললাম, 'কৈ, কিছুইতো ভাবছিলাম না।'

'কিছু না?'

আইব্রো পেন্সিলে আঁকা ধনুকের মত ভ্রূ দুটোকে কুঁচকে আমাব চোখেব দিকে তাকালেন মিসেস ভাণ্ডাবী।

ওব কোঁচকানো ভ্রূ জোড়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সত্যি, কিছুই ভাবছিলাম না।'

'বুঝেছি।'

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন রত্না ভাণ্ডাবী।

'কি বুঝেছেন?'

জানতে চাইলাম আমি।

'তার কথা ভাবছিলে।'

বললেন মিসেস ভাণ্ডারী।

'কার কথা?'

জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'যাকে প্রতীক্ষিতা রেখে এসেছ কলকাতায়।'

বাঁ চোখের পাতাটাকে অনাবশ্যক রকম কুঁচকে, টোল্‌ পড়া গালের কোলে এক ঝিলিক মাপা হাসির রেখা টেনে বেশ উদাস রোমান্টিক সুরে কথাটা বললেন কয়েক ডজন বসন্ত অতিক্রান্তা রত্না ভাণ্ডারী।

'আপনার অনুমানটা মোটেই সত্য নয়,' আমি হেসে বললাম 'আসলে আমি সুভাষ বোসের কথা চিন্তা করছিলাম।'

'সুভাষ বোসের কথা! হঠাৎ?'

বিস্ময়ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস ভাণ্ডারী।

'আজ সারাটা দুপুর এটাই ছিল আমাদের সাবজেক্ট ম্যাটার। আমি বললাম, 'আমরা ডক্টর ভারমার ওখানে গিয়েছিলাম সেখানে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে অনেক কথা হয়েছে অবশ্য, তার সবটাই বলেছে শশী, আমরা ছিলাম কেবলমাত্র শ্রোতা।'

'তাই নাকি?' মিসেস ভাণ্ডারীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল উনি শশীর দিকে ফিরে বললেন, 'আর ইউ রিয়েলি ইনটারেষ্টেড ইন নেতাজী মিষ্ট্রি?'

'অব কোর্স।'

বলল শশী।

'আমি তোমাকে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।' রত্না ভাণ্ডারী বেশ উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বললেন, 'সে ভদ্রলোক এ ব্যাপারে অনেক পড়াশুনো করেছেন। তাছাড়া ভদ্রলোকের কাছে এমন বহু ডক্যুমেণ্টস আছে, যা দিয়ে অনায়াসে একটা রিসার্চ ওয়ার্ক করা যায়।'

'তাই নাকি?'

শশী খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

মিসেস ভাণ্ডারী বললেন, 'তুমি যদি রাজী থাক তা হলে কাল দুপুরে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি তার কাছে।'

'ঠিক আছে, আমি যাব।'

শশী যাবার জন্য এক পায়ে খাড়া।

'অলরাইট। কাম টু মাই প্লেস টুমরো, এ্যাট টু।'

মিসেস ভাণ্ডারী আগামীকাল তার বাড়ীতে যেতে আহ্বান জানালেন শশীকে।

আমি বললাম, 'আমরাও কিন্তু যাব রত্নাদি।'

'ঠিক আছে, এসো।'

সম্মতি জানালেন রত্না ভাণ্ডারী।

কফি হাউস থেকে আমাদের অফিস খুব বেশি দূরে নয়। হাটা পথে মিনিট পনেরর রাস্তা। এখন অফিস ছুটির সময়, বাসে যত না ভীড়, তার থেকে বেশি ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। তাই হেঁটেই রওয়ানা হলাম অফিসমুখো।

শশী বলল, 'আমরা ডক্টর ভারমার কাছে গিয়েছিলাম কি জন্য তা মনে আছে?'

আমি বললাম, 'মেকং নদীর জট ছাড়াবার জন্য।'

'কিন্তু ফিরে এলাম কি নিয়ে?'

শশী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চাইল আমার মুখের দিকে।

'আর একটা নতুন জট মাথায় নিয়ে।'

জবাব দিলাম আমি।

'কিন্তু তাতে তো আর অথরিটি ভুলবে না।' শশী বলল, 'এখন কুলকার্ণিকে গিয়ে কি জবাব দেব?'

'তাও তো বটে!' রাকেশ বলল, 'আলোচনার মধ্যে এতক্ষণ এ কথাটা তো মাথায়-ই আসেনি।'

কথা বলতে বলতে আমরা ষ্টেটসম্যান অফিসের সামনে পৌঁছে গেছি। অফিস বাউণ্ডারীর বাইরের দেওয়ালে টাঙ্গান স্পট

নিউজের শো-কেসটায় দেখি বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'রাশিয়া ওয়ার্ণস ইউ. এস. এ।'

সাবজেক্ট ম্যাটাব তৈবী হয়ে গেল মাথায়। শো-কার্ডটা দেখে শশী আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমার দিকে ফিবে বলল, 'ফিকর মাত করো বাসু, ম্যায় পয়েণ্ট পাকাড় লিয়া।'

পযেণ্ট পাকাড় লিয়া! বিষয়টা আমার কাছে মোটেই বোধগম্য হল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্যায়া পয়েণ্ট পাকাড় লিয়া?'

'ওহি, রাশিয়া ওয়ার্ণস ইউ. এস. এ।'

শশীর গলায় আত্মতৃপ্তির সুর।

'উসমে ক্যায়া হ্যায়?'

জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'উসমেহি তো সব কুছ হায় ভাইজান।' শশী বলল, 'উসমেহি সব কাম বন জায়েগা।'

'মগর কাম ক্যায়া, ইয়ে তো বাতাও।'

আমি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'কাম একদম সিধা, সাফ-সুথরা। হাম লোগ নিকলে থে পাবলিক ওপিনিয়ন জাননে কে লিয়ে। ইস ইস্যু পর জনতাকা ক্যায়া রায় হায় সারা শহের ঘুম ঘুমকে উসকা থোড়া বহুত যাচ কিয়া। আজ উস পরহি রাপট লিখেঙ্গে।'

তাজ্জব ব্যাপার! কোথাও কারো কাছে গোলাম না; এ বিষয়ের উপর কাউকে একটা প্রশ্নও করলাম না—অথচ কি আশ্চর্য, পাবলিক ওপিনিয়নের যাচাই হয়ে গেল! এবং তার উপর রিপোর্টও লেখা হয়ে যাবে? সত্যি, কি বিচিত্র দেশ!

'ঔর ক্যায়া করোগে?' শশী আমাকেই জিজ্ঞাসা করল, কুলকার্ণিজী যব পুছেঙ্গে কি দিনভর ক্যায়া কিয়ে হো, তব ক্যায়া জবাব দেওগে?

সত্যি তো, কি জবাব দেব? কি জবাব দেবার আছে আমাদের?

সুভাষচন্দ্রের কথা ভাবছিলাম? ননসেন্স। সুভাষচন্দ্রের কথা ভাবার জন্য কি আমাদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে? নেতাজীব অন্তর্ধান রহস্য অনুসন্ধান করার জন্য কি আমাদের চাকরীতে রাখা হয়েছে? মোটেই না।

তবে? তবে কি বলব কুলকার্ণিকে? কি জবাব দেব তার প্রশ্নের?

অবশেষে ঠিক হল, মিথ্যেটাই বলব। এবং আশ্চর্য, আমরা অফিসে ফিরে মিথ্যেটাই বললাম। বেশ চমৎকার ভাবে হেসে, বিস্মিত হয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে বললাম একটা সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী। এবং আরো আশ্চর্য, সবাই সে কথা শুনল মন দিয়ে, বিশ্বাস করল অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

পরদিন ঐ মিথ্যাই যখন কাগজে রিপোর্ট হয়ে বের হল তখন কত লোক সে কাহিনী পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; মিলিয়ে দেখল নিজের মনের সঙ্গে। কারো মিলল, কারো মিলল না। তবে মজার কথা সবাই কিন্তু বিশ্বাস করল ব্যাপারটা। এমনকি গভর্ণমেণ্টও ধরে নিল যে এটাই জনতার মতামত; এটাই রিয়াল পাবলিক ওপিনিয়ন। অর্থাৎ ডেমক্রাটিক এক্সপ্রেশন।

অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এসে যৎসামান্য খেয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। আজ আর শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। তাছাড়া কাল মর্নিং শিফটে ডিউটি রয়েছে। তাই এখন একটু ঘুমিয়ে না নিলে আর চলছে না।

বালিশে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চোখ বুজে চেষ্টা করলাম ঘুমোবার। কিন্তু কৈ, ঘুম যে আসছে না চোখের পাতায়। তার বদলে দূর থেকে বারবার যেন ভেসে আসছে শশীর কণ্ঠস্বর: উসসে সব কাম বন জায়েগা।

সত্যি, এভাবেই চলছে সবকিছু এদেশে, এভাবেই তৈরী হচ্ছে ইতিহাস। এভাবেই সত্যটাকে মিথ্যে করে দেওয়া হচ্ছে; মিথ্যেটাকে করা হচ্ছে সত্য।

কথাটা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল এক পরিচিত মুখ মনে হল, তিনি আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। আমাকে যেন ঐ ঘৃণা মিশ্রিত চোখের চাহুনী দিয়ে বলতে চাইছেন—তোমরা মিথ্যেবাদী, তোমরা ভীরু, তোমরা বেইমান। তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে ইতিহাস তৈরী কর; নিজেদের প্রয়োজনে ভাঙ্গ। তোমরা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে দিন কে রাত বল, রাতকে দিন। তোমরা জীবিতকে বল মৃত, আর মৃতকে বল……।

ক্রমে ক্রমে আবছা মুখটা আমার দৃষ্টির সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে মুখের প্রতিটি রেখা। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ঐ ভুবনভোলান রূপের দিকে—এক আকাশচুম্বি ব্যক্তিত্বের পানে। মনে হয়, এ যেন আমাব কত আপনার জন, কত কাছের মানুষ, কত পরমাত্মীয়।

আস্তে আস্তে দূর থেকে ভেষে আসে এক হারিয়ে যাওয়া পরিচিতের কণ্ঠস্বর: আই উইল গো টু ইণ্ডিয়া অন দ্যা ক্রেষ্ট অব এ থার্ড ওয়ালর্ড ওয়র, এ্যাণ্ড সিট ইন জাজমেণ্ট আপন দোজ হু আর ট্রাইয়িং মাই অফিসার এ্যাণ্ড মাই মেন……।'

কিন্তু কেন, কেন তিনি এলেন না? কেন তিনি বিচার করলেন না সেই মানুষগুলোর, যারা তাঁর দেশবাসীর দেহের সবটুকু রক্ত চুষে ঝাঝরা করে দিয়েছে? শুষে নিয়েছে অবশিষ্ট জীবনীশক্তিটুকুও? কেন?

এ কেনর জবাব দেবে কে? ব্রিটিশ, জহরলাল না সুভাষ বসু নিজে?

আমার চোখের পাতায় ঘুম নেই; ঘুম আসছে না নয়নে। যতবার চেষ্টা করি ঘুমোবার—ততবারই কে যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে

দেয় আমায়। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, কি বোকা তুমি! এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না! কেন ওঁকে ফিরতে দেওয়া হয়নি, তার কারণটুকুও অনুমান করতে পারছ না? আশ্চর্য, তোমরাই আবার নিজেকে চালাক বলে মনে কর; নিজেকে বুদ্ধিমান হিসেবে জাহির করার চেষ্টা কর! কেন, কিংসলে মার্টিনের কথাটা কি ভুলে গেলে? সেই যে তিনি বলেছিলেন, 'হি উড হ্যাড বীন এ ডেঞ্জারাস কমপিটিটর হু দে হ্যাড লার্ণড টু ফীয়ার ইন দ্যা ইয়ারস বিফোর দ্যা ওয়র।' কথাটি কি মিথ্যে?

মোটেই নয়। এর বহু প্রমান জ্বল জ্বল করে আজো বিরাজ করছে ইতিহাসের যক্ষা ধরা বুকে।

সেটা উনিশ শ' আটাশ সাল। কলকাতায় শুরু হয়েছে কংগ্রেস অধিবেশন। এমন বিরাট আয়োজন, এতবেশী লোক সমাগম এর আগে আর কোন কংগ্রেস অধিবেশনেই হয়নি।

অধিবেশন বসেছে পার্ক-সার্কাসে। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

সে কি বিরাট আয়োজন! কি প্রচণ্ড সমারোহ! তোপধ্বনি, ঘোড়-সওয়ারের কুচ কাওয়াজে কে বলবে যে এটা একটা রাজ-নৈতিক দলের সম্মেলন! যারা জানে না তারা নির্দ্ধিধায় বলবে, বোধহয় বড়লাটের দরবার বসেছে; রাজ-অভিষেক হচ্ছে। তা না হলে এত তোরণ, এত বাদ্যবৃন্দের প্রদর্শন কেন?

সব কিছু দেখে গান্ধীজী ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছিলেন, 'পার্ক সার্কাসের সার্কাস।'

সেদিন এই সার্কাসের মূল হোতা ছিল কে? সুভাষচন্দ্র। হ্যাঁ, সুভাষচন্দ্রই ছিলেন সেদিন এই বিরাট কর্মযজ্ঞের জি. ও. সি. অর্থাৎ জেনারেল কমাণ্ডিং-ইন-চার্জ।

এই অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁর বহু আলোচিত স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটিতে বলা হল, 'উনিশ শ' উনত্রিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কিংবা তার আগে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হলে কংগ্রেস সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে নেহেরু কমিটি কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রকে পুরো-পুরিভাবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে এটাকে গ্রহণ করা না হয় কিংবা তার আগেই এটা প্রত্যাখ্যাত হয় তা হলে করদান থেকে বিরত থাকবার জন্য এবং এই ধরণের আর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেইভাবে দেশকে নির্দে'শ দিয়ে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলবে।'

প্রস্তাব শুনে সুভাষচন্দ্র গর্জে উঠলেন, 'না, আমরা এ প্রস্তাব মানছি না। আমরা এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী আনছি।'

স্থির দৃষ্টিতে সুভাষের দিকে তাকিয়ে রইলেন গান্ধীজী। আশ্চর্য, তাহলে এমন মানুষও এ দেশে আছে, যে কিনা তাঁর মুখের উপর বলতে পারে, 'আমি আপনার কথা মানছি না। আমি প্রতিবাদ করছি!'

হ্যাঁ, আছে। গান্ধীজী উপলব্ধি করলেন, এখনো বাঙলার বুকে আগুন জ্বলছে—এখনো সে সূর্য্যের আলোর মত উদ্ভাশিত, বিস্ফেরিত, বিচ্ছুরিত।

সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংশোধনী আনলেন গান্ধীজীর প্রস্তাবের ওপর। বললেন, 'আজ এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হোক যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। এবং এর দ্বারা ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ বোঝাবে।'

গান্ধীজীর অন্ধ ভক্তের দল প্রথমে বিভিন্নভাবে অনুরোধ জানালেন সুভাষচন্দ্রকে এই সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য। কিন্তু যখন তাঁরা বুঝলেন যে, সুভাষ সে ধাতুতে গড়া নয়, যে ধাতু একটু উত্তাপেই গলে যায়, তখন তাঁরা ব্যাপারটাকে গান্ধীজীর

সম্মান-অসম্মানের প্রশ্নে রূপান্তরীত করলেন। বলা হল, যদি গান্ধীজীর এই প্রস্তাব ভোটাভুটিতে পরাজিত হয় তা হলে তিনি কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবেন।

এতে কাজ হল মোক্ষম। বহু সদস্যই, যারা সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন, তাঁরাও গান্ধীজীর কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ানর গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাবেই সায় দিলেন। তবু, এত চেষ্টা স্বত্বেও, গান্ধীজীর প্রস্তাবের পক্ষে তের শ' পঞ্চাশ এবং বিপক্ষে নয় শ' তিয়াত্তরটি ভোট পড়ল। গান্ধীর বিরাট ব্যাক্তিত্ব মাত্র পৌনে চার শ' ভোটের জোরে এ যাত্রা রক্ষা পেল।

পরের বছর বিরোধ আরো বাড়ল লাহোর কংগ্রেসে।

কংগ্রেসীদের মধ্যে জহরলাল নেহরু তখন একজন বিশিষ্ট বাম-পন্থী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ঊনিশ শ' আঠাশ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষ বসু উথাপিত গান্ধীজীর প্রস্তাবের সংশোধনীর পক্ষে জহরলাল ভোট দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তাতে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাইরে তা মোটেই প্রকাশ করেননি।

কলকাতা কংগ্রেসের পরই গান্ধীজী জহরলাল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তিনি জানতেন, সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই তাঁর পথ থেকে সরিয়ে আনা যাবে না, কারণ, সে কোন প্রলোভনের কাছেই মাথা নত করার মত মানুষ নয়। তবে জহরলালের কথা স্বতন্ত্র। তিনি শুধু যে ভাববিলাসী-ই তা নয়, তাঁর মধ্যে সর্বদাই এক স্ব-বিরোধী চরিত্র কাজ করে চলেছে। কখনো তিনি সোস্যালিষ্ট, কখনো কমিউনিষ্ট, কখনো আবার রিফর্মিষ্ট। এমন লোককে সাময়িক কিছু সুযোগ সুবিধে দিয়ে দলে টানার চেষ্টা করলে সফলতা আসতে বাধ্য।

গান্ধীজী সেই চেষ্টাই করলেন।

আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে কে সভাপতি হবেন এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আগষ্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু গান্ধীজী সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নিজেই জহরলাল নেহরুর নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করলেন।

এতে ফল হল মারাত্মক। কংগ্রেসের মধ্যে যারা বামপন্থী বলে পরিচিত তাঁরা গান্ধীজীর এই চালের শিকার হলেন। অনেকেই জহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়াটা বাম-পন্থীদের জয় বলে মনে করল। কিন্তু আসলে এতে লাভ হল গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীদের। কারণ, তাঁরা এই কৌশলের দ্বারা একদল বামপন্থী নেতাকে নিজেদের পক্ষে পেয়ে গেলেন।

সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝলেন; কিন্তু তখন আর তাঁর কিছুই করার নেই। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় জহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সভাপতি হওয়া মানেই গান্ধীজীর আপোষমূলক নীতির শক্তিবৃদ্ধি করা। তাছাড়া, বর্তমানে কংগ্রেস সংগঠনের উপর গান্ধীজীর যা প্রভাব তাতে জহরলাল নেহরুর পক্ষে তাঁর উপর নির্ভর না করে স্বাধীন ভাবে সভাপতির কাজ চালানটা মোটেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সোজা কথায়, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জহরলাল নেহরুকে গান্ধীজীর রাবার ষ্ট্যাম্প হয়েই বসে থাকতে হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে হলও তাই। বীঠলভাই প্যাটেলের মধ্যস্থতায় ডিসেম্বর মাসে গান্ধী ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে বড়লাট লর্ড আরউনের এক বৈঠকের ব্যবস্থা হল। এই বৈঠকের আগে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে সব দলের নেতাদের এক বৈঠক বসল। ঐ বৈঠকে বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে যে আন্তরিকতা রয়েছে তার প্রশংসা করে এবং ভারতের জন্য

ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টায় সরকাবের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করে এক বিবৃতি প্রচার করা হবে।

যথা সময়ে বিবৃতি প্রচারিত হল। দেখা গেল, এই বিবৃতিতে মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, এনী বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, তেজবাহাদুর সপ্রু, বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে জহরলাল নেহরুও সাক্ষব করেছেন।

ব্যাপারটা প্রথমে সুভাষচন্দ্রের মোটেই বোধগম্য হল না। কারণ, জহরলাল নেহরু ইতিপুর্বেই তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি গান্ধীজীর বিবৃতিতে সই তো করবেনই না, বরং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র, ডাঃ কিচলু, আবদুল বারি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যে বিবৃতি দিচ্ছেন তাতেই তিনি তাঁর সাক্ষর দেবেন। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে হল তার ঠিক উল্টোটাই।

সুভাষচন্দ্র জহরলালের কাছে তাঁর এই হঠাৎ ডিগবাজী খাওয়ার কাবণ জানতে চাইলেন। জবাবে জহরলাল আমতা-আমতা করে বললেন, বাপুজী নাকি তাঁকে বলেছেন যে, আগামী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে এই বিবৃতিতে যদি তাঁর সাক্ষব না থাকে তবে বিবৃতিটাই হয়ে পড়বে মুল্যহীন।

বাপুজী যেই বললেন, অমনি রাজী হয়ে গেলেন খোকা জহরলাল। তখন আর তাঁর সামনে সমাজবাদের রঙীন ফুলঝুরি রইল না; দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল কমিউনিজমেব লাল গোলাপটা! চোখের পলকে বিদ্রোহী জহরলাল আপোষপন্থী জহরলালে পর্যবসিত হয়ে গেলেন; তাঁর এতদিনকার সব বাগাড়ম্বর, সব তর্জন-গর্জন মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

জহরলালের এমন সুযোগসন্ধানী মনোভাবে মনে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন সুভাষচন্দ্র; কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি বুঝলেন, তিনি যা অনুমান করেছিলেন, তাই হয়েছে। গান্ধীজীর

ছত্রছায়ে জহরলাল নেহরু এখন একটা বৃন্তচ্যুত ফুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এখনো এ ফুলে সৌরভ আছে ঠিক-ই ; তবে সে সৌরভ আর কখনো বর্ধিত হবে না—যত দিন যাবে, ততই সে কমে যেতে থাকবে। শেষে একদিন শুকিয়ে পড়ে থাকবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

সুভাষচন্দ্র কিন্তু বসে রইলেন না। তিনি বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'প্রকৃত গোলটেবিল বৈঠকে কেবলমাত্র সংগ্রামবত ,দলগুলিরই প্রতিনিধি থাকা উচিত এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের বৃটিশ সরকাব যেভাবে নির্বাচিত করতে চাইছেন তা না করে ভারতবাসীদের দ্বারাই তা করতে হবে।'

বিবৃতিটা দেখলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস অধিবেশন বসল লাহোরে ; সভাপতি হরলাল। সকলকে অবাক করে দিয়ে গান্ধীজী এই অধিবেশনে এক অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনি দাবি জানালেন, 'ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।'

গান্ধীজীর মুখে এমন বিচিত্র প্রস্তাব শুনে নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সবার চোখে মুখে এক প্রশ্ন, কি হল হঠাৎ ? যে গত বছরের অধিবেশনে সুভাষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে নিজের প্রেষ্টিজ ইস্যু করে তুলেছিলেন সেই গান্ধীজীই কিনা আজ নিজেই পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব তুললেন ! সত্যি, রাজনীতিতে সবকিছুই সম্ভব।

সুভাষ এগিয়ে এলেন গান্ধীজীকে সমর্থন জানাতে। এই তো চাই ; এতদিন তো তিনি এ-ই চেয়েছিলেন। আজ বাপুজী নিজেই এগিয়ে এসেছেন এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে ; এর থেকে আনন্দ, এর থেকে গর্বের কথা আর কি হতে পারে ?

কিন্তু গোলমাল বাঁধল গান্ধীজীর উথাপিত একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে। এটা ছিল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর গঠনতন্ত্র সম্বন্ধীয়। গান্ধীজী এক্ষেত্রে কিছুটা নরম নীতি অবলম্বনেব পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বাদ-সাধলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি একটা পাল্টা প্রস্তাব উথাপন কবে বললেন, 'দেশে সমরূপ একটি সবকাব প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওযা উচিত, এবং ঐ উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত কবাব কাজ কংগ্রেসকে গ্রহণ কবতে হবে।'

গান্ধীজী সুভাষেব কাছ থেকে এতটা আশা কবতে পাবেন নি। সুভাষ যে সর্বক্ষেত্রেই তাঁব বিবোধীতা করবে এটা তার কল্পনায়ও ছিল না। তবু তিনি চুপ কবে বইলেন, সুভাষের বিরুদ্ধে একটা কথাও বললেন না।

আসল কাজ এগিযে চলল অন্তবালে। পববর্তী বছরের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পনেবজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হল ক'দিন পবেই। দেখা গেল, সে তালিকায় সুভাষচন্দ্রের নাম নেই। হাজার হাজার সাধারণ কর্মীব দাবী সত্বেও শেষ পর্যন্ত তার নাম তালিকার বাইবেই রয়ে গেল।

সমালোচকদের সমালোচনার উত্তরে মহাত্মাজী বললেন, 'আমি চাই এমন একটি ওয়ার্কিং কমিটি যে কমিটির সব সদস্যই একমত হয়ে কাজ করবে।'

সবাই বুঝল, এটা আর কিছুই নয়—এটা গান্ধীজীর এতদিন চুপ করে থাকার ফল। যথাসময়েই তিনি মোক্ষম ধাক্কাটা দিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

জানিনা, এতসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। ঘুম ভাঙ্গল টেবল ঘড়িটার কর্কশ ডাকে। ধরফর করে উঠে বসলাম মাটের উপর। আজ মর্ণিং ডিউটি।

অফিসে পেঁাছতে দেরী করলে রাগ করবেন কুলকার্ণি। কি জানি, ওদিকে ভিয়েৎনাম থেকে কি খবর এসে জমে আছে টেবিলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সামনেই পাওয়া গেল একটা ট্যাক্সি। উঠে বসলাম তাতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পৌছলাম অফিসে।

দেড়টা নাগাদ ফোন এল মিসেস ভাণ্ডারীর। বললেন, 'কখন আসছ আমার এখানে।'

বললাম, 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই পেঁাছে যাব আশা করছি। এখনো রাকেশ এসে পৌছয়নি। শশী গেছে ক্যান্টিনে! ওরা এলেই রওয়ানা দেব।'

'অলরাইট আই এ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ।'

রত্না ভাণ্ডারী ফোন ছেড়ে দিলেন।

ছটো নাগাদ আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স রত্নাদির বাড়ীর উদ্দেশ্যে বের হলাম অফিস থেকে। একটা ট্যাক্সি ধরলাম তিলক ব্রিজের কাছে। বললাম, 'গ্রীন পার্ক।'

ট্যাক্সি চলেছে ঋষি অরবিন্দ মার্গ ধরে। সফদরজঙ্গ এনক্লেভ ছাড়িয়ে, মসজিদকে অনেক পিছে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি হু হু বেগে। জানিনা রত্নাদি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন, কার কাছে নিয়ে যাবেন; তবে এটুকু ভেবে বুকটা বারবার নেচে উঠছে আশায়—হয়তো আজ সুভাষের অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানতে পারব, আরো অনেক নতুন তথ্য পাব—হয়তো সেই শেষ উত্তরটাও পেয়ে যেতে পারি—কেন সুভাষ মরে নাই!